ছবি : সমীর সরকার

উপন্যাস

ঐতিহাসিক

অভিজিৎ তরফদার

পুকুর কাটলে যেমন মাটি জড়ো হয় তেমনি উঁচু ঢিবি; কিন্তু ভাল করে দেখলে বোঝা যায়, টাঁকা নয় পুরনো, কয়েক শ' বছর বা বেশিও হতে পারে। মাটির খাঁজে খাঁজে পোড়ামাটির ইঁট, একপাশে ধাপ নেমে গেছে সত্যিকারের কোনও গহ্বরে; পুরো জায়গাটা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। কাঁটাতার ছাড়াও নীল রংয়ের ওপর সাদা দিয়ে—বাংলা ও ইংরিজিতে সাবধানবাণী, সংরক্ষিত স্থান, একটা ইঁটও এধার-ওধার করা আইনত দণ্ডনীয়।

সমস্যা হল যে বাড়ির ভেতরে আইনের অবস্থান, সেখান থেকে কয়েকশ' গজ হাঁটলেই আইন ফুরিয়ে যায়। আর তার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় দেশ, যার প্রাচীন নাম ভারতবর্ষ। সেই গল্পই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করছিলেন মাখন গিরি।

—বাড়ির ভিত খুঁড়তে শাবলের মাথা গিয়ে ঠুকে গেল পাথরে। পাথর নয়, শান বাঁধানো পুকুর, ছোটখাটো নয়, পুষ্করিণী। শুদ্ধ ভাষায় পুকুরের আভিজাত্য দুগুণ বাড়িয়ে দেয় গিরি। সেই পুকুরের ধারে মিলল পোড়ামাটির পুতুল, গয়না, মূর্তি আরও কত কী! এখনও যেখানেই মাটি খুঁড়ুন, পুরনো ইঁট উঠে আসে। মানুষ সেই ইঁট খুলে নিয়ে দেওয়াল বানিয়েছে, ঘর সাজিয়েছে পোড়ামাটির পুতুল দিয়ে, যার এক একখানা পৃথিবীর বাজারে অমূল্য সম্পদ।

তিথির অত ধৈর্য নেই।

—কী মাটির ঢিবি দেখাতে নিয়ে এলেন মাখনবাবু? সকাল থেকে তাল তাল মাটিই দেখছি। এদিকে বলছেন ইতিহাস। ইতিহাস যে কোথায় মাথায় ঢুকছে না আমার।

—কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন জানেন?

জুতোর হিল দুবার মাটিতে ঠুকে তিথি বলল, এইটা?

—হ্যাঁ, ওইটা। গিরি গলাটা গম্ভীর করেন, ওই মাটির ঢিবিটার নাম খনা-মিহিরের ঢিবি।

—খনা-মিহির? নামটা শুনেছি মনে হচ্ছে?

—খনার বচন শুনেছেন মা-মাসির কাছে, যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজা পুন্যি দেশ। অসাধারণ জ্যোতিষী। তার স্বামী মিহির, সেও জ্যোতিষী। আর মিহিরের বাবা বরাহ, জ্যোতিষ সম্রাট। বরাহ-মিহির পিতা-পুত্র একত্রে ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন।

—আপনার খালি কথায় কথায় গল্প।

—এ গল্পটা আপনার ভাল লাগবে। খনার কথা শুনে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাকে একবার সভায় ডেকে পাঠান। রাজার আদেশ, কী করে, খনাকে যেতেই হল। সেখানে স্বামী মিহির ও শ্বশুর বরাহের সামনে তার জ্যোতিষজ্ঞানের পরীক্ষা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই বুঝে গেল ওই বরাহ-মিহির টিহির ওরা খনার কাছে নস্যি। রাজা তো অনেক পুরস্কার দিয়ে খনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, তারপর বরাহকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, বরাহদের মতো বুড়োহাবড়াদের এবার অবসর নেবার সময় এসেছে। বরাহের মুখ গম্ভীর, অপমানে কানটান লাল হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরেই অন্তঃপুরে খবর পাঠালেন, খনাকে নিয়ে এসো। খনা কিন্তু ততক্ষণে সব জেনে গেছে।

—হাত শুনে নিশ্চয়?

—হতে পারে। অবশ্য খবর দেবার লোকের তো অভাব ছিল না। মিহিরও খবর নিয়ে এসেছিল। যাই হোক, 'আসছি' বলে খনা গেল রান্নাঘরে। বেরোয় না বেরোয় না; শেষ অবধি মিহিরই খোঁজ করতে রান্নাঘরে ঢুকে দেখে মস্ত এক জাঁতি দিয়ে নিজের জিভ কেটে ফেলেছে খনা।

—এত কিছু থাকতে জিভ কাটল কেন?

—এটাও বুঝলেন না? জিভ না থাকলে আর কথা বলতে পারবে না। আর কথা না বললে কিসের বচন, কিসের গণনা? এইভাবে শ্বশুর আর স্বামীর সম্মান রক্ষা করেছিল খনা।

—পারেন বটে আপনারা। যুগ যুগ ধরে মেয়েগুলোকে মুর্গা বানিয়ে তাদের পিঠে কাঠাল ভেঙে খেয়ে গেছেন। মেয়েগুলোও ছিল তেমনি গাধা, এ সব গল্প বিশ্বাস করেছে। স্বামী-শ্বশুরের জিভ কেটে নিয়েছে এমন বউয়ের গল্প আপনার স্টকে নেই?

এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল দীপ। এবারে জিজ্ঞেস করল, সেই খনা-মিহিরের ঢিবি এইখানে?

—শোনা যায় খনা-মিহির এইখানে বাস করতেন। হতে পারে শেষ জীবনে, নবরত্নপদের মেয়াদ শেষে মিহির এইদিকেই অবসর জীবন

কাটিয়েছিলেন। অথবা উল্টোটা। খনা ছিলেন এই বাংলার মেয়ে। এইখানেই মিহিরের সঙ্গে খনার সাক্ষাৎ। জ্যোতিষজ্ঞানের পরীক্ষা। মিহির মুগ্ধ হলেন। ফিরে গিয়ে বরাহকে জানালেন। বিয়ের ডুলি এসে থামল এই বাংলাদেশের এক অজ পাড়াগাঁয়ে।

ভদ্রলোকের এই একটা দোষ। পিসি নিজে থেকেই বলেছিল, খবর পাঠাচ্ছি মাখনকে। ভাল ছেলে। শহরে গিয়ে পাশটাশ দিয়ে এসেছে। ইস্কুলের মাস্টার। পড়ায় ভাল। নাম আছে। তার চেয়ে বড় কথা এই জায়গাটা ওর প্রাণ। ওই নিয়েই পড়ে আছে। সব ঘুরে ঘুরে দেখাবেখন।

তা দেখিয়েছেন গিরি। সাত-সকালে এসে ঘুম ভাঙিয়েছিলেন ওদের। এ দিকে শীত এখনও যায়নি। কলকাতা থেকে সামান্য উজিয়ে এলেই বোঝা যায় মাইক আর মিছিলের দাপটে কলকাতা ছাড়লেও, আরও কয়েকটা দিন শিশির- কুয়াশা-শিউলিতে ভর করে শীত এ দিকে থেকে যাবে।

রাত্তিরে পিসি তিথিকে নিজের কাছে নিয়ে শুয়েছিল। বাঁকা চোখে দীপকে দেখে তিথি চলে গিয়েছিল দোতলায়। নীচের ঘরে দীপ। দীপকেই আগে উঠতে হল।

লেপ জড়িয়ে বাইরে এসে দীপ দেখেছিল, অত পাখির ডাকাডাকি সত্ত্বেও সকালের রোদ তখনও কুয়াশা-টুয়াশা ছাড়িয়ে উঠোন অবধি এসে পৌঁছয়নি। এসে গেছেন মাখন গিরি, রাতেই পিসি বলে রেখেছিল, পাশে কালীধন আদক, হিসেবপত্তর যার ঘাড়ে রেখে পিসি এখনও অবধি নিশ্চিন্ত।

—সকাল সকাল ঘুম ভাঙালাম, ক্ষমা করবেন, কিন্তু শুনলাম আপনারা আজই চলে যাবেন, তাই ভাবলাম পুরোটা ঘুরে দেখতে তো সময় লাগবে, রোদ উঠবার আগেই...

দেখে অন্যরকমই লেগেছিল দীপের। চল্লিশের ওদিকেই বয়েস, কাঁচাপাকা চুল, সকালেই পরিপাটি ক্ষৌরী করে এসেছেন, গায়ে পাতলা তুষের চাদরটায় শীত আটকাচ্ছে কি না গিরিই জানেন। কথায় সামান্য স্থানীয় সুর, কিন্তু ভঙ্গিটি বিনীত, একেবারে আনপড় চাষাভুষো নয়, তিথি বিরক্ত হবে না।

কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে ভুল ভেঙে গেল।

তিথির তৈরি হয়ে নামতে মিনিট পনেরো লাগল। শাড়ির ওপর একটা পুলওভার, তার ওপর শাল জড়িয়েও হিহি করে কাঁপছিল তিথি। তিনবার বলল, ওহু, তোমরা চাটুকুও খেতে দিলে না। তারপর মাখন গিরির দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন কোথায় আপনাদের ফোর্ট না কী আছে দেখিয়ে দিন ঝটপট।

চন্দ্রকেতুগড়। ছোটবেলা থেকে গল্প শুনে আসছে। আবছা ধারণা ছিল। সেটাই সন্ধেবেলা ছোট করে বলেছিল তিথিকে। আসন সেলাই করতে করতে পিসিও ধরিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছিল। প্রাইম করে রাখাই ছিল। কাজেই এক্সপেক্টেশনও ছিল বিরাট।

প্রথমেই একটা গাছপালা ভরতি প্রায় জঙ্গলে নিয়ে ফেললেন মাখন। দু'পাশে ধানক্ষেত, মাঝখানে মাটির দেওয়াল, সারি সারি ইউক্যালিপটাস, দেবদারু, বাবলা গাছ এমনভাবে সাজানো, দূর থেকে দেখলে পাঁচিল বলে ভ্রম হয়।

—পাঁচিলই। আগে বলত প্রাকার। দুর্গপ্রাকার। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এটাই চন্দ্রকেতুগড়ের সীমানা।

—কী বললেন? এটাই দুর্গ? মানে ফোর্ট? ঠকে গিয়েছে এইরকম ভঙ্গিতে চোখ ছুঁচলো করে মাখনের দিকে তাকাল তিথি।

—ঠিক ধরেছেন দিদিমণি, বলে ডান হাতটা পতাকার মতো উড়িয়ে দিলেন গিরি, ওই যে দেখছেন ধানক্ষেত, ডানদিকে, আরও দূরে তাকালে দেখবেন দুটো মস্ত অশ্বত্থ গাছ ওদিকের বড় শেষ প্রান্তে দরজার মতো দাঁড়িয়ে। দুর্গপ্রাকারকে ঘিরে থাকত পরিখা, ওই গাছগুলোই পরিখার বাউন্ডারি। ওইখানে ছিল পিলখানা, হাতি বাঁধা থাকত। আর এই প্রাকারের ওপর বসানো ছিল কামান।

তিথি যেন অবিশ্বাস করতেও ভুলে গেল।

গিরি বলে চললেন, রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে পীর গোরাচাঁদের যুদ্ধ হয়েছিল, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন দু'খানা পায়রা। কালো পায়রাটা ছিল পরাজয়ের চিহ্ন। কারা যেন ষড়যন্ত্র করে সেই পায়রা দিল উড়িয়ে। রানির কাছে পায়রা ফিরে এল, তাই দেখে রানি ভাবলেন রাজা যুদ্ধে হেরে গেছেন। রানি ওই দহের জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন।

মন দিয়ে গল্প শুনছিল তিথি, হঠাৎই গিরি বলে উঠলেন, এখানে এমন সব যক্ষ মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলো গুপ্ত বংশের, আবার কিছু কিছু জিনিস তো হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার চেয়েও পুরনো।

মাখন গিরি থেকে মন সরিয়ে তিথি এবার মন দিয়ে ষাঁড়টাকে দেখছিল। কলকাতার রাস্তায় এমন শিং, কুঁজ ও গন্ধসমৃদ্ধ আস্ত একখানা ষাঁড় পোস্তার বাজার ছাড়া কোথাও দেখা যায় না। তা ছাড়া ষাঁড়টার এই মুহূর্তে তৃরীয় দশা। মুচকি হেসে গিরির দিকে তাকিয়ে তিথি বলল, এই গরুগুলোও প্রি হিস্টোরিক নাকি মাখনবাবু?

মাখন বিব্রত হয়ে দীপের দিকে তাকালেন।

দীপের কিন্তু খারাপ লাগছিল না। জায়গাটায় যে সত্যিই ইতিহাস আছে, এখানে ওখানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের ফলক আর খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়। দীপের বরং ভাবতে ভাল লাগছিল, যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে বহু বছর আগে মানুষ থাকত। দীপের মনে হচ্ছিল, রাস্তার ধুলো উড়িয়ে এখনি যদি এসে দাঁড়ায় একটা রথ, রথ থেকে নেমে আসেন এক রাজপুরুষ, ঘোড়াটা অস্থির হয়ে মাটিতে পা ঠুকে ধুলো ওড়াচ্ছে, সেই রাজপুরুষ কিন্তু দীপ নয়, তিথিও নয়, মাখন গিরির সামনে গিয়ে মাথা নুইয়ে বলবেন, সুপ্রভাত অমাত্য!

রোদ চড়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ হাতে চাপ দিচ্ছিল তিথি। দীপই শেষ অবধি এগিয়ে গেল,—খুব ভাল লাগল মাখনবাবু। এ যেন জীবন্ত ইতিহাস। আপনি না থাকলে এইভাবে কিছুই দেখা হত না। পরে আবার সময় নিয়ে আসব।

দীপ্তি ফুটে উঠল মাখনের মুখে চোখে, না না, কীই বা দেখাতে পারলাম। এখানকার সংগ্রহশালাটা তো,...আজ ছুটির দিন,...পরে না হয়...

—হ্যাঁ হ্যাঁ পরে কখনও,...এবারে ফিরতে হবে। তাড়াতাড়ি কথা কেড়ে নিয়ে তিথি বলল।

মাখন গিরি এগিয়ে দিতে চাইলেন। তিথি এমনভাবে হাঁহাঁ করে উঠল যে আর কথা না বাড়িয়ে গিরি রাস্তা থেকেই বিদায় নিলেন।

পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। ঠিক ততখানিই দূরত্ব রেখে যতখানি গ্রামীণ চোখগুলোয় সয়ে যাবে। ধুলো। দীপ জানে বর্ষাতে এই ধুলোই আঠালো কাদা হয়ে যায়। তিথির মতো কাউকে গ্রাম দেখাতে নিয়ে এলে শীতই ভাল। ধানক্ষেত বিধবার মতো পড়ে থাকে, নদী নালা বিলের জল শুকিয়ে গ্রামের ভরন্ত চেহারাটা হারিয়ে যায়। কিন্তু শহুরে মানুষ সাপ-কাদা-বৃষ্টি পার হয়ে আসল গ্রাম অবধি পৌঁছতে পারে না।

কাল সন্ধে মাথায় করে এসেছিল ওরা। ধুলোয় ভূত হয়ে। বারাসত অবধি রাস্তা ভাল, তারপর থেকেই চষা ক্ষেতের মতো। এদিকে মন্ত্রীটন্ত্রী আসে না বিশেষ? তিথি স্কুটারের পেছনে বসে এটুকু বলতেই তিনবার দম নেবার জন্য হাঁ করেছিল। পিচরাস্তা ছেড়ে বাঁক নিতে শুধুই ধুলো। ধুলোয় অ্যালার্জি তিথির, মনে পড়ে গিয়েছিল দীপের। বার তিরিশেক হেঁচে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির সামনে আন্দাজে যখন স্কুটারটা এনে দাঁড় করাল, তিথি তখন আর তিথিতে নেই। ঝাঁজ টাজ উধাও। কুঁই কুঁই করে বলেছিল, গরম জল পাওয়া যাবে তোমাদের বাড়ি?

বাড়িতে কিন্তু সব পাওয়া গিয়েছিল। অবাক হয়ে গিয়েছিল তিথি। হট ওয়াটার ব্যাগ অবধি। তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চিকেন স্টুটা চমৎকার বানিয়েছিল সদানন্দ, পিসির পুরনো ঠাকুর।

—ও এদিককার লোক নয়, মেদিনীপুর। অনেক মানুষই এখানে এসে আছে বহু বছর, কিন্তু আদি নিবাস ওই দিকে। হয়ত উড়িষ্যায় ছিল কোনও কালে। ওই মাখন, মাখন গিরি, ওরও তো দেশ তমলুক না কাঁথি কোথায় যেন।

রান্নায় ভাল হাত হলেই তার বাড়ি মেদিনীপুর বা উড়িষ্যা হতেই হবে, পিসিরা এখনও এইরকমই ভাবে। এখন এই মাথার ওপর সকালের রোদ্দুর নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দু'জনে, যেন কেউ কারওকে চেনে না। সামনে তিথি। পেছনে, একটু তফাতে দীপ। দীপ ঘাঁটাচ্ছে না। কালকের স্মৃতি তিথির মনে এখনও টাটকা। থাক্, থিতোক একটু। সময় পালিয়ে যাচ্ছে না।

কথা বলছে না বটে, কিন্তু যে টুকু দেখেছে তাতেই অবাক হয়েছে সন্দেহ নেই। বিস্ময়টা চেপে রেখেছে। কাল অন্ধকারেই দেখেছে, ভূতের মতো মস্ত বাড়ি! সকালে দেখেছে দেউড়িতে হাতি বাঁধা থাকত, বড় বড় খিলানে শিকলের চিহ্ন। বারবাড়ি আর ভিতরবাড়ির মাঝখানে মস্ত একখানা চাতাল. এখন ধান শুকোতে দেওয়া হয়, পিসি আঙুল তুলে তিথিকে দেখিয়েছিল,—ওইখানে প্রজারা বসত বুধ-শুক্রবার। কথাবার্তা যা বলার নায়েবই বলতেন। প্রজারাও তাদের আর্জি নায়েবমশাই-এর কাছে জমা করে চলে যেত। রাজামশাই দেখা দিতেন ন'মাসে ছ'মাসে, পালাপার্বনে। হ্যাঁ মা, জমিদার নয়, রাজাই বলত সকলে। আমরাও ছোটবেলায় রাজাই শুনেছি। প্রজারা ভালবেসে তাদের পুকুরের বড় মাছটা, গাছের প্রথম আমটা রাজার জন্যে নিয়ে আসত। রাজা কিন্তু, সিনেমা-থিয়েটারে যেমন দেখা যায়, অত্যাচারী, গলায় গামছা দিয়ে খাজনা আদায় করছে, সেরকম মোটেও ছিলেন না। রাজা ছিলেন প্রজাবৎসল। বন্যা-দুর্ভিক্ষ- মহামারী লেগেই থাকত। তিনিই তখন বল-ভরসা।

শুনছিল তিথি। জবাব দিচ্ছিল না। জবাব জমিয়ে রাখছিল, পরে সুযোগ বুঝে দীপকে ঝাড়বে। তবে এখন ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে একা পেয়েও যখন কিছু বলছে না, জবাব দেবার মতো কিছু পায়নি বলেই মনে হচ্ছে।

দিনের অনেকটাই খরচা হয়ে গেছে। দেউড়িতে ঢুকতে ঢুকতে তিথি আর একবার ঘাড় উঁচু করে খিলানগুলো দেখে নিল। ভেতরবাড়িতে এসে শুনল পিসি স্নানে গেছে। স্নানেরও অনেক তরিবত। ভেতর পুকুরে বাইরের কেউ স্নান করে না। কাপড়কাচা, বাসনমাজাও নিষেধ। পুকুর থেকে জল কপিকলে তোলা হয় চৌবাচ্চায়। রোদ পড়ে সেই জল গরম হয়। ঘেরা স্নানঘরের ওপরে ছাউনি। শীতকালে ছাউনি সরিয়ে রোদ আসতে দেওয়া হয়, যাতে জল গরম হয়। পিসি সেইখানে গরম জলে গা ডুবিয়ে স্নান করে।

স্নানের পর পুজো। কুলবিগ্রহ রাধামাধব। আজ স্নানের বেলা হয়েছে। পুজো পাঠ চুকিয়ে খেতে খেতে পিসির আজ দুপুর গড়িয়ে যাবে।

—আপনাদের জন্য জলখাবার দেওয়া হয়েছে বড় ঘরে। মা খেয়ে নিতে বলেছেন।

বড় ঘর, একতলায়। যেখানে রাতে ছিল দীপ। আগেকার দিনের গেস্টরুম বোধহয়। একসঙ্গে দশজন থাকতে পারে, বড়ঘর নাম সার্থক। উঁচু পালঙ্ক, কাঠের পাদানিতে পা রেখে উঠতে হয়। দু'মানুষ উঁচু ছাদে কড়ি-বরগা, মাঝবরাবর ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন। বরং ঝুলন্ত ফ্যানটাই বেমানান, একটা টানা পাখা থাকলে মানানসই হত। সাদা টিউবের আলো, সুইচ টিপলে জ্বলে উঠতে এত সময় লেগে যায় যে অনিচ্ছাটুকু বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

পাথরের টেবিলের ওপর মস্ত কাঁসার থালায় অনেকগুলো করে লুচি, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, মাখা সন্দেশ। পাশে গ্লাশে ঢাকা দেওয়া জল। ঠোঁটে ছোঁয়াল তিথি, তাকাল দীপের দিকে।

—কী হল? দীপ ভাবল টিউবওয়েলের জল, গন্ধ হবে হয়ত।

—ডাবের জল, শীতকালেও ডাব হয়?

—হয় নিশ্চয়। না হলেও পিসির গাছ, হুকুম দিলে অফ সিজনেও বানিয়ে ফেলবে।

দীপও চুমুক দিয়ে দেখল, মিষ্টি জল।

খিদে পেয়েছিল। থালা থেকে দু খানা লুচি দীপের দিকে ট্রান্সফার করল তিথি। চেটেপুটে খেল দীপ। তিথিও কিছু ফেলল না। খেয়ে রুমালে হাত মুখ মুছে তিথি বলল, চলো।

—কোথায়?

—ওপরে।

—ওপরে কোথায়?

—চলোই না।

উঁচু ধাপের কাঠের সিঁড়ি, সিঁড়ির নীচে মাকড়সার জাল। দোতলায় নয়, তিথি এসে থামল তারও ওপরে, ছাদে।

নেড়া ছাদ। এখান থেকে অনেকদূর অবধি নজর পড়ে। রোদ চড়েছে। তবু এসে চোখ জুড়িয়ে গেল।

—কাল এসেছিলে?

—কাল নয়, আজ সকালে। পিসি সাত সকালেই নিয়ে উঠেছিলেন। রাজত্ব দেখাতে।

সেইজন্যেই অত দেরি হচ্ছিল। ওরা যখন নীচে অপেক্ষা করছে, পিসি তখন তিথিকে নিয়ে ছাদে।

—দারুণ, না?

তিথিকে অবাক হতে দেখে খুশি হল দীপ। কিংবা বিস্ময়টা চেপে রেখেছিল, এতক্ষণে বেরিয়ে পড়ল। ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে চোখটা বিছিয়ে দিল চারপাশে।

ওপর থেকে দেখার একটা সুবিধে, সব কিছু ছোট ছোট দেখায়। বারদরোজাটা অতবড় দেখাচ্ছে না, দেউড়ির খিলানগুলো ছোট ছোট, ধান শুকোতে দেওয়ার চাতালটা কাছ থেকে দেখলে অনেক ছড়ানো দেখায়, ধান রাখার মড়াইগুলোও শিবলিঙ্গের মতো বেঁটে বেঁটে লাগছে। পুকুরঘাটে জল নিতে এসেছে অনেকে, এই পুকুরের জল ফুটিয়ে খায় মানুষ, পুরোটাই বাঁধানো। দক্ষিণের রাধামাধব মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে, পিসি নিশ্চয়ই ঠাকুরকে বাছা বাছা ভোগ রেঁধে খাওয়াচ্ছে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে তিথি, কাজল-লিপস্টিক লাগায়নি, বরং চোখে আপাতত মেখে আছে মুগ্ধতা।

পশ্চিম থেকে উত্তরে সরে গেল দীপ। এ দিকেও একটা পুকুর, একটু দূরে, বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে, তাল-নারকোল গাছের বাউন্ডারি পার হয়ে। পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা একটা তালগাছের গুঁড়ি থেকে জলে ঝাঁপাচ্ছে কয়েকটা বাচ্চা, এই শীতেও তাদের শরীরে একখানা সুতোর আড়ালও নেই। পুকুরের পুব পাড়ে, তিনখানা কাটা তালগুঁড়ি আড়াআড়ি ফেলে তৈরি হয়েছে ঘাট, তার ওপরে ছড়িয়ে বসে গল্প করছে সতেরো থেকে সত্তরের কিশোরী-যুবতী-বৃদ্ধা। দূরের ছাদ থেকে কেউ দেখছে এমন সম্ভাবনা না থাকায়, আব্রুর ব্যাপারে তারা কিঞ্চিৎ অসাবধানী।

—তাই বলি, এতক্ষণ ধরে মন দিয়ে কী দেখা হচ্ছে! কখন কাছে এসেছে তিথি দীপ খেয়াল করেনি।

—মোটেও আমি ওইসব দেখিনি, দীপ তাড়াতাড়ি সরে যাবার চেষ্টা করল।

—চোরের মন বোঁচকার দিকে। আমি তো খারাপ কিছু বলিনি। ওইসব? কী সব দেখার কথা বলছ তুমি?

—তুমি কী বলছ আমি জানি। ওইসব স্নানটান করছে যে সব মেয়ে ওদের মিন করছ।

—তাই? ওইসব দেখছিলে মন দিয়ে? কী দেখছিলে বলো না গো?

দীপ আরও সরে যায়। সামনে এসে দাঁড়ায় তিথি। ওর চোখের তারা এখন আরও বড়, নাকের পাটা কাঁপছে, ঠোঁটের ওপর বসে আছে ঘাম।

—কী দেখা যায় গো মেয়েদের? কী দেখো তোমরা অত মন দিয়ে?

দীপের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়। ভীষণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তিথি, ওর শরীরের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। দীপের দুর্বল লাগছে। খোলা ছাদ, কেউ এসে না পড়ে!

তিথি হঠাৎই ঘোরে। ছাদের পুব দিকে একটা বন্ধ ঘর। সেই দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করে, ওই ঘরটা কিসের?

দীপ একটু নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। বলে, চিলেকোঠা।

—সেটা আবার কী?

—ছাদের ঘর বলতে পারো। সংসারের যত ঝড়তিপড়তি জিনিস ওই ঘরে জমা থাকে।

—খোলা যায়? বলে বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তিথি। পুরনো কাঠের দরজা, শিকল তোলা। শিকলে একটা দুর্বল তালা ঝুলছে।

তালাটা ধরে টানাটানি করছে তিথি, দীপ পাশে গিয়ে দাঁড়াল—ভেঙে যাবে যে!

—তা হলে খুলে দাও।

—খুলে কী করবে?

—ভেতরে যাব।

—ভেতরে গিয়ে?

—দেখব, কী আছে।

—তোমার মাথায় ভূত চেপেছে, চলো নীচে যাই।

—এই ঘরে না ঢুকে আমি যাবই না।

তিথির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল দীপ। বলেছে যখন, ভেতর না দেখে তিথি যাবে না।

—চুলের কাঁটা আছে?

—কাঁটা নেই, ক্লিপ আছে, হবে?

ক্লিপটা খুলে দীপের হাতে দিল তিথি। চুলগুলো এলো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাঁধে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল দীপ। তারপর কাঁটার মত দিকটা তালার মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিল। খুট করে খুলে গেল তালা।

তালাটা শিকলের ফাঁদ থেকে বের করে শিকল খুলে সটান ভেতরে ঢুকে গেল তিথি। পেছন পেছন দীপ। অন্ধকার। গন্ধ। কিছুক্ষণ চোখ সইয়ে দীপ বলল, দেখা হয়েছে? এবার চলো।

তিথি এগিয়ে গিয়ে সামনের জানলাটা খুলে দিল। রোদ উঠে এসেছে অনেকখানি। তবুও জানলা দিয়ে একটা তিনকোনা রোদ্দুর এসে ঘরের ভেতরে আলো ফেলল। একখানা তক্তাপোষ, তার ওপর শতরঞ্জি বিছানো। তক্তাপোষের ওপরে দেওয়াল ঘেঁষে একটা টিনের তোরঙ্গ। কুলুঙ্গিতে একটা কালীমূর্তি, দেওয়ালে এখনও প্রদীপের কালি জমে আছে। মেঝেতে পুরু ধুলো। খাটের নীচে কিছু ভাঙা আসবাব, চেরাই কাঠ, প্যাকিং বাক্স, ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ। তক্তাপোষের পায়ায় ঘুণ ধরেছে, সাদা গুঁড়ো জড়ো হয়ে আছে খাটের পায়ার চার ধারে।

—কী হল চলো?

—যাব। তার আগে বলো, যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম।

—কোনটা? দীপ ভুলে গিয়েছিল তিথি কিছু জিজ্ঞেস করেছিল।

—ওই যে ছেলেরা মেয়েদের মধ্যে কী দ্যাখে?

ঢোঁক গেলে দীপ—এই যেগুলো ভাল লাগে ছেলেদের, স্নেহ ভালবাসা কেয়ারিংঅ্যাটিচিউড...

—থামো। ওসব জিজ্ঞেস করেছি আমি? মেয়েদের শরীরে কী খোঁজে ছেলেরা? লুকিয়ে লুকিয়ে দ্যাখে...?

ঠাণ্ডাতেও ঘেমে ওঠে দীপ। তিথি সামনে সরে আসে। তারপর ধাক্কা

দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। কাঁধ থেকে একে একে নামাতে থাকে শাল, সোয়েটার। একসময় দীপকে টেনে সামনে এনে দাঁড় করায়,—এই সব?

দীপ দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ সরাতে পারে না। তিথি দীপের একখানা হাত ডান হাতে ধরে আস্তে আস্তে ওপরে তোলে, —এই সব?

তারপর দীপের হাত আর দীপের থাকে না। তিথিকে তার খোলশ ছাড়িয়ে বের করে আনে দীপ, নিজেকেও অবারিত করে। একটি ঘুণধরা খাটের চারটি পায়া আর্তনাদ করে ওঠে। অতঃপর লুপ্ত হয় স্থান ও সময়ের বোধ। এবং সেই চূড়ান্ত যন্ত্রণার তীব্র আশ্লেষে দীপের পা গিয়ে পড়ে খাটের এক কোণে রাখা টিনের তোরঙ্গটির গায়ে। জিনিসটা ছিটকে পড়ে মাটিতে। শব্দ হয়। দ্রুত গুছিয়ে উঠে দাঁড়ায় দীপ ও তিথি। ততক্ষণে তোরঙ্গ খুলে মাটিতে ছত্রাখান হয়ে গেছে ভেতরের জিনিস। অবাক হয়ে দীপ দেখে, দু'য়েকটা ভাঁজ করা শাড়ি, সিঁদুর আর আলতার কৌটো, একটা লক্ষ্মীর পটের সঙ্গে ছিটকে পড়েছে একখানা ডায়েরি। চামড়া দিয়ে মোড়া পুরু ডায়েরিটা মাটিতে পড়েছে আধখোলা উপুড় হয়ে। তিথি নয়, এইমাত্র ঘটে যাওয়া অতীত নয়, দীপের সমস্ত আগ্রহ যেন জড়ো হয়, ওই আশ্চর্য আবিষ্কারে।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ডায়েরিটা তুলে ধুলো ঝেড়ে প্রথম পাতা ওল্টায় দীপ।

মুখ-হাত ধুয়ে কলতলা থেকে বেরিয়ে বাবাকে দেখেই প্রমাদ গনল দীপ। হয়ে গেল। আজ আর কপালে খেয়ে অফিসে যাওয়া নেই।

এইসময়ে চা সহযোগে কাগজটা শেষ করে দীপ। ঠিক দশ মিনিট। শেষ অবশ্য বলা যায় না। খেলার পাতা দিয়ে শুরু, দশ মিনিটের যেটুকু পড়ে থাকে সেটায় প্রথম তৃতীয় আর পঞ্চম পাতা। ছুটির দিন হলে পুরনো অভ্যেস ঝালিয়ে নিতে চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোও ওল্টায়। ঠিক আটটা পঁচিশে বাথরুমে ঢোকে। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বেরোয়। মা ততক্ষণে আসন পেতে থালা- গেলাশ সাজিয়ে ফেলেছে। ভাতটা গরম না হলে গলায় ঢোকে না দীপের। আবার বেশি গরম হলেও জিভ পুড়ে যায়। ঠিক কতটা গরম হলে একটা দানা ভাতও পড়ে থাকবে না, মার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। একটা হাতপাখা নিয়ে পাশে বসে। সিলিংফ্যানটা উঁচুতে, ওটাতে আস্থা নেই মায়ের। তবু টেবিল- চেয়ারে হলেও কথা ছিল। কলকাতা শহরে যে হাতে গোনা বাড়িতে এখনও খাবার টেবিল ঢোকেনি, দীপদের বাড়ি তার একটা। এই নিয়ে রোজ রাত্তিরে ঝগড়া।

কিন্তু সেই ঝগড়ায় দীপ একদিকে, প্রতিপক্ষ বাবা-মা দু'জনে। অতএব ঝগড়াটা বেশিদূর এগোবার আগেই দীপ দাঁড়ি টেনে দেয়। এখন যেটা শুরু হবে, মানে হয়ে গেছেই বলা যায়, সেটার কোনও দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন নেই। এ কান থেকে ও কান অবধি হাসি। বেরিয়ে বাবার হাসি দেখেই দীপ বুঝেছিল, আজ হরিমটর।

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। গান না কবিতা! ভাল মনে পড়ছে না। আজ বাবার হাসি আর বাঁধ মানছেনা। মাসে অন্তত বার-দুই এই হাসি বাবার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে জায়গা নেয়। নিভে যায়, বেশিক্ষণ থাকে না, ঘণ্টা খানেক, তার মধ্যেই যা করার করে দেয়। হপ্তা দুই চলে। তারপর আবার।

ওই যে শুরু হল।

—চমৎকার মৌরলা পেয়ে গেলাম জানো? টাটকা। লাপাচ্ছে। চারশই নিয়ে নিলাম। ভেজে দিও দীপুকে। আর তেঁতুল এনেছি সঙ্গে। মাছের টক। আহ্, কতদিন যে মৌরলা মাছের টক খাই না।

বাজারের থলেটা রান্নাঘরের দরজায় কাত করে রেখে বারান্দার রোদে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল বাবা। তবে বেশিক্ষণ নয়। বাবার সাধের মৌরলা মাছ থলি থেকে বেরিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেট শুদ্ধ মিসাইলের মতো উড়ে এসে পড়ল বাবার কোলে।

—কটা বাজে খেয়াল আছে? কে বাছবে তোমার ওই মৌরলা? বাছোরে, ভাজোরে। আর ভাজা তো নয়, তেলের শ্রাদ্ধ! তারপর টক! থাকো তুমি ওই মৌরলার গুষ্টি নিয়ে। ইচ্ছে হয় নিজে রেঁধে খাও? আমার দ্বারা হবে না।

জুলজুল করে মৌরলা মাছগুলোর দিকে তাকাল বাবা। তারপর গলা তুলল, এ বাড়িতে আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও মূল্য নেই? বুড়ো বয়েসে একটু মৌরলা মাছের অম্বল খেতে চেয়েছি বলে অতগুলো কথা? পারতে তোমার ছেলে ওই মাছ বাজার থেকে নিয়ে এলে?

—আনতই না। আমার ছেলেকে আমি সে শিক্ষা দিইনি। জানে মার কোথায় কষ্ট, কোথায় যন্ত্রণা। শিক্ষা, বুঝেছ শিক্ষা। তোমার মা তো আর সত্যিকারের শিক্ষা দেননি। শিখিয়েছেন কী করে বৌয়ের হাড়মাস চিবিয়ে খেতে হয়।

—আবার? বাবা উঠে দাঁড়াল,—আবার তুমি আমার মা তুললে? তিনি সতীসাবিত্রী, স্বর্গে গেছেন। সেই মানুষের নাম তোমার মুখে আনও পাপ।

—সতীসাবিত্রী? হুঁঃ। হাজারবার তুলব। কী সব্বোনাশটাই করে গেছেন! ছোটবেলায় নোলাটা যদি অত বাড়তে না দিতেন, আমার অন্তত হাড়ে দুব্বোঘাস গজাত না।

এরপরে বাবা, মা বাবা এবং মা ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে বেরোতে যাবে পেছন থেকে ডাকে মা,—না খেয়েই চললি যে? দাঁড়া। ডালটা হয়ে গেছে, ডিমের মামলেট ভেজে দিই। দুটো মুখে দিয়ে যা। সারাটা দিন না খেয়ে থাকলে আমারই কি গলা দিয়ে ভাত নামবে?

ঘড়ি দেখতে দেখতে গিলতে থাকে দীপ। জল দিয়ে নামিয়ে দেয়। তারপর দশ মিনিট লেট-এ একরকম ছুটে অফিসে বেরিয়ে যায়।

বাবা! মানুষটাকে কোনওদিনই ইঞ্চি-ফুট-গজের হিসেবে মাপতে পারল না দীপ।

ছোটবেলার স্মৃতিটা এইরকম—হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয় একটা মানুষ। লম্বা ফর্সা রোগা। গলার সুরটা শরীরের তুলনায় ভারী। এসেই হইহই লাগিয়ে দেয়। তারপর দীপকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এদিক ওদিক। আজ দক্ষিণেশ্বর তো কাল চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানা-যাদুঘর-ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালগুলোয় দীপ আর বাবা। কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গী মাও। বেড়ানোর চেয়েও যেটা বেশি মনে আছে, যেখানেই যাও মিনিটে মিনিটে খাওয়া। ফুচকা থেকে ভেলপুরী থেকে অমৃতি থেকে আইসক্রিম। একবার আঙুল তুললেই হল। মা-ই বরং হাঁ হাঁ করে এসে পড়ত, ওইটুকু ছেলে, অত ধরে পেটে? পেট ছেড়ে দেবে যে! মার ওপরই রাগ হত দীপের। মা সঙ্গে না থাকলে বেড়ানোটা বেশি জমত।

শুধু বাইরেই নয়, ভেতরেও। মাও তখন অন্য মা ছিল।

—লাউটা একদম...কুচি।

ঘোমটার আড়ালে ঘাড় কাত করে মা রান্নাঘরে ঢুকে যেত। অবশ্য তখন নারকোল কুরিয়ে দেবার, চিংড়ি বেছে দেবার লোক ছিল বাড়িতে।

চিতলপেটি এনে হাঁক পাড়ত, চিতলের মুঠা। পার্শে-পোস্ত, ভাপের ইলিশ, পেঁয়াজকলি দিয়ে ট্যাংরা মাছ। খেয়ে খেয়ে মুখ মেরে গিয়েছিল দীপের। পরে জেনেছে, মা-দের দেশ ছিল ওই বাংলায়। বাবা দুটো দিকই আয়ত্ত করেছে। ফলে আলুপোস্ত আর কচু-শাক বাবা একইরকম মৌজ করে খেত। মারও রান্নায়, বলা উচিত রান্নার ইচ্ছায় বিরাম ছিল না।

হঠাৎ সব বদলে গেল। দীপের এখনও মনে আছে। সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেছে। বাবা এসেছে। এসেছে মানেই হইহই খাওয়া দাওয়া। পরীক্ষা শেষ, কাজেই সাতসকালে সাইকেল টিংটিং করতে করতে বেরিয়ে যায়, ভরদুপুরে ফিরে তেলহলিশ দিয়ে ভাত মাখে।

সন্দেহটা প্রথম হল মা-র।

—তোর বাবার ব্যাপার-স্যাপার আমার কেমন কেমন ঠেকছে। তোর কি কিছু সন্দেহ হচ্ছে?

ট্যাংরার পেট থেকে ডিম বের করতে করতে দীপ জিজ্ঞেস করেছিল, কী ব্যাপার মা।

—এই যে, তোর বাবার ব্যবহারটা। এল, অথচ যাবার নাম নেই। দু' সপ্তাহ পেরিয়ে তিন সপ্তাহ হতে চলল, ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে বসে আছে আর চর্বচোষ্য গিলছে, অফিসটফিস কি তুলে দিয়ে এল? জিজ্ঞেস করিস তো রাতে?

মার গলায় তখনও আজকের মা ভর করেনি। দীপ ছাড়া মার গলার স্বর কেউ শুনতে পেত কি না সন্দেহ। কাজেই খেতে বসে দীপই জিজ্ঞেস করেছিল কথাটা।

শুনে হা হা করে হেসেছিল বাবা।

—ব্লু ব্লাড বুঝলি, ব্লু ব্লাড। ব্লু ব্লাড কাকে বলে জানিস?

ব্লু ব্লাড জানে দীপ, নাও যদি জানত, জানিয়ে ছাড়ত বাবা। জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে আসছে,—হাতিশালে হাতি, এখনও তার শিকলের দাগ, দেখাবো তোকে। পুকুরের মাছ? এখনও একজোড়া বেঁচে আছে, এক একটা মন খানেক। কলমকাঠি চাল, ল্যাংড়া আম, এক একখানা পেয়ারা এই এত বড়—নারকোলের সাইজ।, আর নারকোল, সে যে কী মিষ্টি কী মিষ্টি।

শুনেছে, তখনও দ্যাখেনি। দেখেছে, পরে, যখন নিজে খোঁজ নিয়ে দেশের বাড়ি গিয়ে পিসির সঙ্গে দেখা করেছে। তার আগে অবধি শুধুই শোনা।

ব্লু ব্লাড-এর অর্থ বাবা আরও পরিষ্কার করে। —জমিদারের রক্ত, বুঝেছিস কিনা! ভেবেছে যা ফরমান করবে এই শর্মা ঘাড় নিচু করে তাই হাজির করবে। পাগল! চাকরি তোদের দরকার তোরা কর। সেদিনের ফোতো কাপ্তেন সব! দিয়েছি টাইট করে। চোখ কপালে উঠে গেছে সবকটার।

কিছুই বুঝতে পারে না দীপ, দু' চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন লিখে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাবাকে চিনত মা। মা-ই ঘোমটা খসিয়ে সামনে এল, সেই প্রথম বাবার মুখোমুখি, —তার মানেটা কী? চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?

একগাল হেসে বাবা বলেছিল, হ্যাঁ, আপদ চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। চাকরি মানে জানো তো, চাকর-ই। জমিদারের রক্ত যার গায়ে, চাকরগিরি তার পোষায়?

পরিবর্তনটা দ্রুত হল তারপর। মার হেলপিং হ্যান্ড যারা ছিল তাদের বিদায় দেওয়া হল। আগের বাড়িটা ছেড়ে উঠে আসা হল শহরতলির এই ঘুপচি বাক্সতে। চিরকালের মতো ঘোমটা খসে গেল মার, গলায় আমদানি হল অনুপাতমতো পালিশ ও ভোকাবুলারি।

ছ' বছর। দীপের চাকরি পেতে ছ'ছটা বছর লেগে গেল। এই ছ'বছর মাকে পাশ থেকে দেখেছে দীপ। শেষপর্যন্ত দীপ যে দাঁড়িয়েছে, তার ঠেকানোগুলো সবই মায়ের সাপ্লাই করা, দীপের চেয়ে বেশি কেউ জানে না সেটা।

সেইজন্যেই মা এত সতর্ক।

দীপ জানে, অল্প সময়ে মৌরলা মাছ বাছতে যতখানি কষ্ট, তার চেয়ে অনেক কষ্ট ছাঁকা তেলে মাছগুলো ভেজে তুলতে। ট্যাংরা-পাবদা নয়, তেলাপিয়া রান্না করেই মা বেশি আনন্দ পায় আজকাল।

স্কুটারটা কিনতে আপত্তি করেছিল। দীপই অঙ্ক কষে মাকে বুঝিয়েছিল, যাওয়া আসায় যতখানি খরচ হবে, তেলের খরচ মিটিয়েও তাতে শেষ অবধি সাশ্রয়ই হবে। মা মেনে নিয়েছিল।

টেলিফোনটা ঢোকানোতে খেপে গিয়েছিল। বাবা ফোনের পাশে দাঁড়িয়ে গোলাপি যন্ত্রটায় হাত বোলাচ্ছিল, মা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এটাকে ঢোকাবার আগে একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলি না?

যত বোঝায়,—তোমাদের বয়েস হচ্ছে, সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাই, কিছু হলে একটা খবরও তো পাবো, ছুটে আসতে পারব, মা-র এক কথা, জমিদারের রক্ত, বাবুয়ানি, যাবে কোথায়?

অবশ্য যন্ত্রটা ঢুকলেও এখনও কানেকশন দেয়নি। কে জানে আবার কাকে ধরতে হবে।

অফিসে ঢুকতেই কোণের টেবিল থেকে বটাদা বলল, এই যে, এতক্ষণে ভগবানের পুষ্যিপুত্তুরের আসার সময় হল।

—না বটাদা, ভুল হচ্ছে, বুদ্ধ-মহাবীর-যীশু টিশুর পর আজকাল ভগবান পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। ওটা ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে সুবিধার নয়, মানস গলা তুলল।

—ব্যাড ডেট বলো, বটাদা পকেট থেকে লবঙ্গ তুলে গালে ঢালল, এক নম্বর ধাক্কাটা বুকে লাগার পর থেকে বটাদার আঙুলের ফাঁক থেকে তিরিশ বছরের সঙ্গী উধাও, এখন কেবল লবঙ্গ,—ব্যাঙ্ক-এ কাজ করো, ব্যাঙ্ক-এর টারমিনোলজি ইউজ করো। শুধু আমাদের ব্যাঙ্ক-এর ব্যাড ডেট জানো? চার হাজার কোটি টাকা। তাও তার এইট্টি পার্সেন্ট হাতে গোনা কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের কাছে।

আলোচনাটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে দেখে ব্রত তাড়াতাড়ি ব্রেক কষল, না মানস, আমি বটাদার সঙ্গেই একমত। পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া ছেড়েছেন বটে, তবে তার বদলে অগুনতি দালাল ছেড়ে দিয়েছেন ভগবান। আমাদের পাড়ায়, রাস্তার মোড় থেকে তিনটে বাড়ি পরে, কী যে হচ্ছে এক সপ্তাহ ধরে। ঘুমটুম সব বরবাদ।

—ভগবানের চাষ? বটাদা মুণ্ডু ঘোরাল।

—চাষ বলে চাষ? প্রথমে তিনদিন মাইক বাজিয়ে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন হল। কোনও শালা পলিউশন কন্ট্রোল দেখলাম না মাথা গলাতে এল।

—গলাবে কোত্থেকে? পলিউশন কন্ট্রোল, পরিবেশ-টরিবেশ সব দ্যাখ গিয়ে মাথা কামিয়ে টিকি দুলিয়ে ভজন গাইছে।

—হতে পারে। যে রেটে ছটার লাগানো গাড়ি আসতে দেখলাম তাতেই মালুম হল, ভগবানের ব্যবসায় কী সাংঘাতিক প্রফিট।...তবে আসল জিনিস লুকনো ছিল, মার্কেটে ল্যান্ড করল হরিনামের পালা খতম হবার পর।

ঘড়ি দেখল মানস, দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাউন্টারে লাইন পড়তে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি ফিনিশ কর।

—হ্যাঁ, ব্রত শেষটুকু বলল, তিন তিনটে সাধু। এক একজনের জটার লেংথ না হোক ফুট তিনেক, তারা এসে জাঁকিয়ে বসল। সকাল-সন্ধে একবার করে মুখ দেখায়, আর এসি গাড়িতে জটা লুকিয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায়।

বটাদা বলল, ওদের মধ্যে আই এস আইও থাকতে পারে।

—বিচিত্র নয়। কাজের মেয়ে দীপালি বলছিল, সন্ধের পর থেকেই নাকি বোতলের ছিপি খোলা হয়। ধোঁয়াটোঁয়াও ভালই চলে।

বটাদা আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, আর বেশি রাতে, না, সোনাগাছিতে এদের মন উঠবে বলে মনে হয় না, পার্ক স্ট্রিটে ঘুরে দেখতে পারিস, একসঙ্গে না হোক, আলাদা আলাদা পেয়ে যাবি।

বটাদা পেছনে নিজের টেবিলে চলে গেল, মানসের আজ টেলার। ব্রত আগেই উঠে গেছে। দীপও সান্যাল সাহেবকে একবার মুখ দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

সকালটায় তাড়াতাড়ি আসে দীপ। তার অবশ্য কারণও আছে। র‍্যাপিড ক্লিয়ারেন্স আর ট্রানজ্যাকশন এনশিওর করার জন্যে ওদের কম্পিউটারটায় ই-মেল কানেকশন এসেছে মাসখানেক। কী কুক্ষণে যে ই-মেল নাম্বারটা বলে ফেলেছিল তিথিকে। এখন দীপের কাজই হচ্ছে সাত সকালে তাড়াতাড়ি অফলোড করে দেখে নেওয়া। আর তা থেকে তিথিরটা বের করে সকলের অলক্ষ্যে পকেটজাত করা।

অন্যদিন তাড়াতাড়ি আসে বলে পড়বার সময় পায়। আজ আর পড়ার রিস্ক নিল না। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে তিথির মেসেজটা পকেটে ঢুকিয়ে অন্য ম্যাটারগুলোয় মন দিল। আজ তেমন কোনও মেসেজ নেই। কালকের কয়েকটা পেন্ডিং ক্যালকুলেশন ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। সেগুলো নিয়েই পড়ল তারপর।

বটাদারা শুধু শুধু ভগবানের পুষ্যিপুত্তুর বলে না দীপকে। কম্পিউটারে থাকায় দীপের লাভের সংখ্যা একটা নয়। এক তো টেনশন নেই। এই যে দেরি হল, আরও দেরি হলেও, তেমন যায় আসে না। কাউন্টারে বসবে যারা তাদের দেরি মানেই কাস্টমারের চেঁচামেচি, খুব তাড়াতাড়ি অনুপস্থিতিটা নজরে আসে। দীপ ধীরে সুস্থে কাজ করে। অনেক সময় কাজ পেন্ডিং থাকলে সন্ধে অবধি থেকে কাজ তুলে দিতে হয়। বিশেষ করে ইয়ার এন্ডিং-এর সময়টায়। তাতে অবশ্য কিছু মনে করে না দীপ। দ্বিতীয় অ্যাডভান্টেজটা এই ঘর, এসি। শীতে তফাৎ হয় না। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মে বাইরে থেকে তেতে পুড়ে এসে ঘরে ঢুকলেই শান্তি। তখন বাইরে ঘামতে ঘামতে ভিড় সামলানো বটাদা-মানস-ব্রতরা দীপকে হিংসে করতেই পারে। তৃতীয় সুবিধাটা, লিখিত পড়িত নেই বটে, কিন্তু ওরা সকলেই জানে, দীপকে কখনও গ্রামের ছোট ব্যাঙ্কগুলোয় ট্রান্সফার করতে পারবে না। কম্পিউটার আছে মানেই ব্রাঞ্চটা বড়, এবং অজ পাড়াগাঁয়ে নয়।

চতুর্থটা ওরা জানে না। সেটা দীপের একান্ত নিজস্ব। তিথি। তিথির সঙ্গে আলাপটাও কম্পিউটার শিখতে গিয়ে। আর এখন তো যখন তখন...

বারোটা নাগাদ বাইরে এল একবার। ভিড়। পরপর দুটো দিন ছুটি গেছে, সব মানুষ হামলে পড়েছে আজ। ফ্যান চালিয়ে দিয়েছে ওরা। তাও ওরা ঘামছে। লাইন গেট পেরিয়েও বাইরে অবধি।

সান্যাল সাহেবের কাছে গেল দীপ। একটু আগেই স্লিপ পাঠিয়েছিলেন। কাজ করছিলেন, চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। বসতে না বসতেই চিঠিটা এগিয়ে দিলেন সান্যাল। এক্সপেক্ট করছিল। তবু পড়ে দেখল। দুটো নতুন ব্রাঞ্চ কম্পিউটারাইজড হয়েছে। ওদের ছেলে আছে। তবু এক্সপিরিয়েন্সড কাউকে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আসতে হবে। ইনিশিয়াল বট্‌ল্-নেকগুলো ছাড়িয়ে দিলে আর অসুবিধে হবে না।

—কিন্তু এখন যা রাশ, ইয়ার এন্ড আসছে, দু'-দুটো জায়গায় অতদিন মানে এদিককার কাজ...

—সেটাও আমি ডিসকাস করেছি, চেইন স্মোকার সান্যাল সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি নেবালেন, ফার্স্টলি আপনি একসঙ্গে দুটো ব্রাঞ্চ-এ যাবেন না। একটাতে নেক্সট উইক, গোড়ার দিকে নয়, ফ্রাইডে-স্যাটারডে দুটো দিন নিন। পরের মাসে অন্যটা।

—দু'দিনে হবে?

—ওদের তো ট্রেইন্ড লোক রয়েছে। শুধু অপারেশনগুলো একবার দেখিয়ে আসা। আমি বলেছি। দু'দিনের বেশি আপনাকে স্পেয়ার করা যাবে না।

সুবিধাগুলো ভাবছিল একটু আগেই। এই একটা অসুবিধা। যখন তখন

দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। কাঁধ থেকে একে একে নামাতে থাকে শাল, সোয়েটার। একসময় দীপকে টেনে সামনে এনে দাঁড় করায়,—এই সব?

দীপ দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ সরাতে পারে না। তিথি দীপের একখানা হাত ডান হাতে ধরে আস্তে আস্তে ওপরে তোলে, —এই সব?

তারপর দীপের হাত আর দীপের থাকে না। তিথিকে তার খোলশ ছাড়িয়ে বের করে আনে দীপ, নিজেকেও অবারিত করে। একটি ঘুণধরা খাটের চারটি পায়া আর্তনাদ করে ওঠে। অতঃপর লুপ্ত হয় স্থান ও সময়ের বোধ। এবং সেই চূড়ান্ত যন্ত্রণার তীব্র আশ্লেষে দীপের পা গিয়ে পড়ে খাটের এক কোণে রাখা টিনের তোরঙ্গটির গায়ে। জিনিসটা ছিটকে পড়ে মাটিতে। শব্দ হয়। দ্রুত গুছিয়ে উঠে দাঁড়ায় দীপ ও তিথি। ততক্ষণে তোরঙ্গ খুলে মাটিতে ছত্রাখান হয়ে গেছে ভেতরের জিনিস। অবাক হয়ে দীপ দেখে, দু'য়েকটা ভাঁজ করা শাড়ি, সিঁদুর আর আলতার কৌটো, একটা লক্ষ্মীর পটের সঙ্গে ছিটকে পড়েছে একখানা ডায়েরি। চামড়া দিয়ে মোড়া পুরু ডায়েরিটা মাটিতে পড়েছে আধখোলা উপুড় হয়ে। তিথি নয়, এইমাত্র ঘটে যাওয়া অতীত নয়, দীপের সমস্ত আগ্রহ যেন জড়ো হয়, ওই আশ্চর্য আবিষ্কারে।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ডায়েরিটা তুলে ধুলো ঝেড়ে প্রথম পাতা ওল্টায় দীপ।

মুখ-হাত ধুয়ে কলতলা থেকে বেরিয়ে বাবাকে দেখেই প্রমাদ গনল দীপ। হয়ে গেল। আজ আর কপালে খেয়ে অফিসে যাওয়া নেই।

এইসময়ে চা সহযোগে কাগজটা শেষ করে দীপ। ঠিক দশ মিনিট। শেষ অবশ্য বলা যায় না। খেলার পাতা দিয়ে শুরু, দশ মিনিটের যেটুকু পড়ে থাকে সেটায় প্রথম তৃতীয় আর পঞ্চম পাতা। ছুটির দিন হলে পুরনো অভ্যেস ঝালিয়ে নিতে চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোও ওল্টায়। ঠিক আটটা পঁচিশে বাথরুমে ঢোকে। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বেরোয়। মা ততক্ষণে আসন পেতে থালা- গেলাশ সাজিয়ে ফেলেছে। ভাতটা গরম না হলে গলায় ঢোকে না দীপের। আবার বেশি গরম হলেও জিভ পুড়ে যায়। ঠিক কতটা গরম হলে একটা দানা ভাতও পড়ে থাকবে না, মার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। একটা হাতপাখা নিয়ে পাশে বসে। সিলিংফ্যানটা উঁচুতে, ওটাতে আস্থা নেই মায়ের। তবু টেবিল- চেয়ারে হলেও কথা ছিল। কলকাতা শহরে যে হাতে গোনা বাড়িতে এখনও খাবার টেবিল ঢোকেনি, দীপদের বাড়ি তার একটা। এই নিয়ে রোজ রাত্তিরে ঝগড়া।

কিন্তু সেই ঝগড়ায় দীপ একদিকে, প্রতিপক্ষ বাবা-মা দু'জনে। অতএব ঝগড়াটা বেশিদূর এগোবার আগেই দীপ দাঁড়ি টেনে দেয়। এখন যেটা শুরু হবে, মানে হয়ে গেছেই বলা যায়, সেটার কোনও দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন নেই। এ কান থেকে ও কান অবধি হাসি। বেরিয়ে বাবার হাসি দেখেই দীপ বুঝেছিল, আজ হরিমটর।

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। গান না কবিতা! ভাল মনে পড়ছে না। আজ বাবার হাসি আর বাঁধ মানছেনা। মাসে অন্তত বার-দুই এই হাসি বাবার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে জায়গা নেয়। নিভে যায়, বেশিক্ষণ থাকে না, ঘণ্টা খানেক, তার মধ্যেই যা করার করে দেয়। হপ্তা দুই চলে। তারপর আবার।

ওই যে শুরু হল।

—চমৎকার মৌরলা পেয়ে গেলাম জানো? টাটকা। লাপাচ্ছে। চারশই নিয়ে নিলাম। ভেজে দিও দীপুকে। আর তেঁতুল এনেছি সঙ্গে। মাছের টক। আহ্, কতদিন যে মৌরলা মাছের টক খাই না।

বাজারের থলেটা রান্নাঘরের দরজায় কাত করে রেখে বারান্দার রোদে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল বাবা। তবে বেশিক্ষণ নয়। বাবার সাধের মৌরলা মাছ থলি থেকে বেরিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেট শুদ্ধ মিসাইলের মতো উড়ে এসে পড়ল বাবার কোলে।

—কটা বাজে খেয়াল আছে? কে বাছবে তোমার ওই মৌরলা? বাছোরে, ভাজোরে। আর ভাজা তো নয়, তেলের শ্রাদ্ধ! তারপর টক! থাকো তুমি ওই মৌরলার গুষ্টি নিয়ে। ইচ্ছে হয় নিজে রেঁধে খাও। আমার দ্বারা হবে না।

জুলজুল করে মৌরলা মাছগুলোর দিকে তাকাল বাবা। তারপর গলা তুলল, এ বাড়িতে আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও মূল্য নেই? বুড়ো বয়েসে একটু মৌরলা মাছের অম্বল খেতে চেয়েছি বলে অতগুলো কথা? পারতে তোমার ছেলে ওই মাছ বাজার থেকে নিয়ে এলে?

—আনতই না। আমার ছেলেকে আমি সে শিক্ষা দিইনি। জানে মার কোথায় কষ্ট, কোথায় যন্ত্রণা। শিক্ষা, বুঝেছ শিক্ষা। তোমার মা তো আর সত্যিকারের শিক্ষা দেননি। শিখিয়েছেন কী করে বৌয়ের হাড়মাস চিবিয়ে খেতে হয়।

—আবার? বাবা উঠে দাঁড়াল,—আবার তুমি আমার মা তুললে? তিনি সতীসাবিত্রী, স্বর্গে গেছেন। সেই মানুষের নাম তোমার মুখে আনাও পাপ।

—সতীসাবিত্রী? হুঁঃ। হাজারবার তুলব। কী সব্বোনাশটাই করে গেছেন! ছোটবেলায় নোলাটা যদি অত বাড়তে না দিতেন, আমার অন্তত হাড়ে দুব্বোঘাস গজাত না।

এরপরে বাবা, মা বাবা এবং মা ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে বেরোতে যাবে পেছন থেকে ডাকে মা,—না খেয়েই চললি যে? দাঁড়া। ডালটা হয়ে গেছে, ডিমের মামলেট ভেজে দিই। দুটো মুখে দিয়ে যা। সারাটা দিন না খেয়ে থাকলে আমারই কি গলা দিয়ে ভাত নামবে?

ঘড়ি দেখতে দেখতে গিলতে থাকে দীপ। জল দিয়ে নামিয়ে দেয়। তারপর দশ মিনিট লেট-এ একরকম ছুটে অফিসে বেরিয়ে যায়।

বাবা! মানুষটাকে কোনওদিনই ইঞ্চি-ফুট-গজের হিসেবে মাপতে পারল না দীপ।

ছোটবেলার স্মৃতিটা এইরকম—হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয় একটা মানুষ। লম্বা ফর্সা রোগা। গলার সুরটা শরীরের তুলনায় ভারী। এসেই হইহই লাগিয়ে দেয়। তারপর দীপকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এদিক ওদিক। আজ দক্ষিণেশ্বর তো কাল চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানা-যাদুঘর-ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালগুলোয় দীপ আর বাবা। কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গী মাও। বেড়ানোর চেয়েও যেটা বেশি মনে আছে, যেখানেই যাও মিনিটে মিনিটে খাওয়া। ফুচকা থেকে ভেলপুরী থেকে অমৃতি থেকে আইসক্রিম। একবার আঙুল তুললেই হল। মা-ই বরং হাঁ হাঁ করে এসে পড়ত, ওইটুকু ছেলে, অত ধরে পেটে? পেট ছেড়ে দেবে যে! মার ওপরই রাগ হত দীপের। মা সঙ্গে না থাকলে বেড়ানোটা বেশি জমত।

শুধু বাইরেই নয়, ভেতরেও। মাও তখন অন্য মা ছিল।

—লাউটা একদম...কুচি।

ঘোমটার আড়ালে ঘাড় কাত করে মা রান্নাঘরে ঢুকে যেত। অবশ্য তখন নারকোল কুরিয়ে দেবার, চিংড়ি বেছে দেবার লোক ছিল বাড়িতে।

চিতলপেটি এনে হাঁক পাড়ত, চিতলের মুঠা। পার্শে-পোস্ত, ভাপের ইলিশ, পেঁয়াজকলি দিয়ে ট্যাংরা মাছ। খেয়ে খেয়ে মুখ মেরে গিয়েছিল দীপের। পরে জেনেছে, মা-দের দেশ ছিল ওই বাংলায়। বাবা দুটো দিকই আয়ত্ত করেছে। ফলে আলুপোস্ত আর কচু-শাক বাবা একইরকম মৌজ করে খেত। মারও রান্নায়, বলা উচিত রান্নার ইচ্ছায় বিরাম ছিল না।

হঠাৎ সব বদলে গেল। দীপের এখনও মনে আছে। সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেছে। বাবা এসেছে। এসেছে মানেই হইহই খাওয়া দাওয়া। পরীক্ষা শেষ, কাজেই সাতসকালে সাইকেল টিংটিং করতে করতে বেরিয়ে যায়, ভরদুপুরে ফিরে তেলইলিশ দিয়ে ভাত মাখে।

সন্দেহটা প্রথম হল মা-র।

—তোর বাবার ব্যাপার-স্যাপার আমার কেমন কেমন ঠেকছে। তোর কি কিছু সন্দেহ হচ্ছে?

ট্যাংরার পেট থেকে ডিম বের করতে করতে দীপ জিজ্ঞেস করেছিল, কী ব্যাপার মা।

—এই যে, তোর বাবার ব্যবহারটা। এল, অথচ যাবার নাম নেই। দু' সপ্তাহ পেরিয়ে তিন সপ্তাহ হতে চলল, ট্যাং-এর ওপর ট্যাং তুলে বসে আছে আর চর্বচোষ্য গিলছে, অফিসটফিস কি তুলে দিয়ে এল? জিজ্ঞেস করিস তো রাতে?

মার গলায় তখনও আজকের মা ভর করেনি। দীপ ছাড়া মার গলার স্বর কেউ শুনতে পেত কি না সন্দেহ। কাজেই খেতে বসে দীপই জিজ্ঞেস করেছিল কথাটা।

শুনে হা হা করে হেসেছিল বাবা।

—ব্লু ব্লাড বুঝলি, ব্লু ব্লাড। ব্লু ব্লাড কাকে বলে জানিস?

ব্লু ব্লাড জানে দীপ, নাও যদি জানত, জানিয়ে ছাড়ত বাবা। জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে আসছে,—হাতিশালে হাতি, এখনও তার শিকলের দাগ, দেখাবো তোকে। পুকুরের মাছ? এখনও একজোড়া বেঁচে আছে, এক একটা মন খানেক। কলমকাঠি চাল, ল্যাংড়া আম, এক একখানা পেয়ারা এই এত বড়—নারকোলের সাইজ!, আর নারকোল, সে যে কী মিষ্টি কী মিষ্টি।

শুনেছে, তখনও দ্যাখেনি। দেখেছে, পরে, যখন নিজে খোঁজ নিয়ে দেশের বাড়ি গিয়ে পিসির সঙ্গে দেখা করেছে। তার আগে অবধি শুধুই শোনা।

ব্লু ব্লাড-এর অর্থ বাবা আরও পরিষ্কার করে। —জমিদারের রক্ত, বুঝেছিস কিনা! ভেবেছে যা ফরমান করবে এই শর্মা ঘাড় নিচু করে তাই হাজির করবে। পাগল! চাকরি তোদের দরকার তোরা কর। সেদিনের ফোতো কাপ্তেন সব! দিয়েছি টাইট করে। চোখ কপালে উঠে গেছে সবকটার।

কিছুই বুঝতে পারে না দীপ, দু' চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন লিখে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাবাকে চিনত মা। মা-ই ঘোমটা খসিয়ে সামনে এল, সেই প্রথম বাবার মুখোমুখি, —তার মানেটা কী? চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?

একগাল হেসে বাবা বলেছিল, হ্যাঁ, আপদ চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। চাকরি মানে জানো তো, চাকর-ই। জমিদারের রক্ত যার গায়ে, চাকরগিরি তার পোষায়?

পরিবর্তনটা দ্রুত হল তারপর। মার হেলপিং হ্যান্ড যারা ছিল তাদের বিদায় দেওয়া হল। আগের বাড়িটা ছেড়ে উঠে আসা হল শহরতলির এই ঘুপচি বাক্সতে। চিরকালের মতো ঘোমটা খসে গেল মার, গলায় আমদানি হল অনুপাতমতো পালিশ ও ভোকাবুলারি।

ছ' বছর। দীপের চাকরি পেতে ছ'ছটা বছর লেগে গেল। এই ছ'বছর মাকে পাশ থেকে দেখেছে দীপ। শেষপর্যন্ত দীপ যে দাঁড়িয়েছে, তার ঠেকনোগুলো সবই মায়ের সাপ্লাই করা, দীপের চেয়ে বেশি কেউ জানে না সেটা।

সেইজন্যেই মা এত সতর্ক।

দীপ জানে, অল্প সময়ে মৌরলা মাছ বাছতে যতখানি কষ্ট, তার চেয়ে অনেক কষ্ট ছাঁকা তেলে মাছগুলো ভেজে তুলতে। ট্যাংরা-পাবদা নয়, তেলাপিয়া রান্না করেই মা বেশি আনন্দ পায় আজকাল।

স্কুটারটা কিনতে আপত্তি করেছিল। দীপই অঙ্ক কষে মাকে বুঝিয়েছিল, যাওয়া আসায় যতখানি খরচ হবে, তেলের খরচ মিটিয়েও তাতে শেষ অবধি সাশ্রয়ই হবে। মা মেনে নিয়েছিল।

টেলিফোনটা ঢোকানোতে খেপে গিয়েছিল। বাবা ফোনের পাশে দাঁড়িয়ে গোলাপি যন্ত্রটায় হাত বোলাচ্ছিল, মা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এটাকে ঢোকাবার আগে একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলি না?

যত বোঝায়,—তোমাদের বয়েস হচ্ছে, সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাই, কিছু হলে একটা খবরও তো পাবো, ছুটে আসতে পারব, মা-র এক কথা, জমিদারের রক্ত, বাবুয়ানি, যাবে কোথায়?

অবশ্য যন্ত্রটা ঢুকলেও এখনও কানেকশন দেয়নি। কে জানে আবার কাকে ধরতে হবে!

অফিসে ঢুকতেই কোণের টেবিল থেকে বটাদা বলল, এই যে, এতক্ষণে ভগবানের পুষ্যিপুত্তুরের আসার সময় হল।

—না বটাদা, ভুল হচ্ছে, বুদ্ধ-মহাবীর-যীশু টিণ্ডের পর আজকাল ভগবান পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। ওটা ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে সুবিধার নয়, মানস গলা তুলল।

—ব্যাড ডেট বলো, বটাদা পকেট থেকে লবঙ্গ তুলে গালে ঢালল, এক নম্বর ধাক্কাটা বুকে লাগার পর থেকে বটাদার আঙুলের ফাঁক থেকে তিরিশ বছরের সঙ্গী উধাও, এখন কেবল লবঙ্গ,—ব্যাঙ্ক-এ কাজ করো, ব্যাঙ্ক-এর টারমিনোলজি ইউজ করো। শুধু আমাদের ব্যাঙ্ক-এর ব্যাড ডেট জানো? চার হাজার কোটি টাকা। তাও তার এইট্টি পার্সেন্ট হাতে গোনা কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের কাছে।

আলোচনাটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে দেখে ব্রত তাড়াতাড়ি ব্রেক কষল, না মানস, আমি বটাদার সঙ্গেই একমত। পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া ছেড়েছেন বটে, তবে তার বদলে অগুনতি দালাল ছেড়ে দিয়েছেন ভগবান। আমাদের পাড়ায়, রাস্তার মোড় থেকে তিনটে বাড়ি পরে, কী যে হচ্ছে এক সপ্তাহ ধরে। ঘুমটুম সব বরবাদ।

—ভগবানের চাষ? বটাদা মুণ্ডু ঘোরাল।

—চাষ বলে চাষ? প্রথমে তিনদিন মাইক বাজিয়ে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন হল। কোনও শালা পলিউশন কন্ট্রোল দেখলাম না মাথা গলাতে এল।

—গলাবে কোথ্ থেকে? পলিউশন কন্ট্রোল, পরিবেশ-টরিবেশ সব দ্যাখ গিয়ে মাথা কামিয়ে টিকি দুলিয়ে ভজন গাইছে।

—হতে পারে। যে রেটে হুটার লাগানো গাড়ি আসতে দেখলাম তাতেই মালুম হল, ভগবানের ব্যবসায় কী সাংঘাতিক প্রফিট!...তবে আসল জিনিস লুকনো ছিল, মার্কেটে ল্যান্ড করল হরিনামের পালা খতম হবার পর।

ঘড়ি দেখল মানস, দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাউন্টারে লাইন পড়তে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি ফিনিশ কর।

—হ্যাঁ, ব্রত শেষটুকু বলল, তিন তিনটে সাধু। এক একজনের জটার লেংথ না হোক ফুট তিনেক, তারা এসে জাঁকিয়ে বসল। সকাল-সন্ধে একবার করে মুখ দেখায়, আর এসি গাড়িতে জটা লুকিয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায়।

বটাদা বলল, ওদের মধ্যে আই এস আইও থাকতে পারে।

—বিচিত্র নয়। কাজের মেয়ে দীপালি বলছিল, সন্ধের পর থেকেই নাকি বোতলের ছিপি খোলা হয়। ধোঁয়াটোঁয়াও ভালই চলে।

বটাদা আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, আর বেশি রাতে, না, সোনাগাছিতে এদের মন উঠবে বলে মনে হয় না, পার্ক স্ট্রিটে ঘুরে দেখতে পারিস, একসঙ্গে না হোক, আলাদা আলাদা পেয়ে যাবি।

বটাদা পেছনে নিজের টেবিলে চলে গেল, মানসের আজ টেলার। ব্রত আগেই উঠে গেছে। দীপও সান্যাল সাহেবকে একবার মুখ দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

সকালটায় তাড়াতাড়ি আসে দীপ। তার অবশ্য কারণও আছে। র‍্যাপিড ক্লিয়ারেন্স আর ট্রানজ্যাকশন এনশিওর করার জন্যে ওদের কম্পিউটারটায় ই-মেল কানেকশন এসেছে মাসখানেক। কী কুক্ষণে যে ই-মেল নাম্বারটা বলে ফেলেছিল তিথিকে। এখন দীপের কাজই হচ্ছে সাত সকালে তাড়াতাড়ি অফলোড করে দেখে নেওয়া। আর তা থেকে তিথিরটা বের করে সকলের অলক্ষ্যে পকেটজাত করা।

অন্যদিন তাড়াতাড়ি আসে বলে পড়বার সময় পায়। আজ আর পড়ার রিস্ক নিল না। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে তিথির মেসেজটা পকেটে ঢুকিয়ে অন্য ম্যাটারগুলোয় মন দিল। আজ তেমন কোনও মেসেজ নেই। কালকের কয়েকটা পেন্ডিং ক্যালকুলেশন ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। সেগুলো নিয়েই পড়ল তারপর।

বটাদারা শুধু শুধু ভগবানের পুষ্যিপুত্তুর বলে না দীপকে। কম্পিউটারে থাকায় দীপের লাভের সংখ্যা একটা নয়। এক তো টেনশন নেই। এই যে দেরি হল, আরও দেরি হলেও, তেমন যায় আসে না। কাউন্টারে বসবে যারা তাদের দেরি মানেই কাস্টমারের চেঁচামেচি, খুব তাড়াতাড়ি অনুপস্থিতিটা নজরে আসে। দীপ ধীরে সুস্থে কাজ করে। অনেক সময় কাজ পেন্ডিং থাকলে সন্ধে অবধি থেকে কাজ তুলে দিতে হয়। বিশেষ করে ইয়ার এন্ডিং-এর সময়টায়। তাতে অবশ্য কিছু মনে করে না দীপ। দ্বিতীয় অ্যাডভান্টেজটা এই ঘর, এসি। শীতে তফাৎ হয় না। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মে বাইরে থেকে তেতে পুড়ে এসে ঘরে ঢুকলেই শান্তি। তখন বাইরে ঘামতে ঘামতে ভিড় সামলানো বটাদা-মানস-ব্রতরা দীপকে হিংসে করতেই পারে। তৃতীয় সুবিধাটা, লিখিত পড়িত নেই বটে, কিন্তু ওরা সকলেই জানে, দীপকে কখনও গ্রামের ছোট ব্যাঙ্কগুলোয় ট্রান্সফার করতে পারবে না। কম্পিউটার আছে মানেই ব্রাঞ্চটা বড়, এবং অজ পাড়াগাঁয়ে নয়।

চতুর্থটা ওরা জানে না। সেটা দীপের একান্ত নিজস্ব। তিথি। তিথির সঙ্গে আলাপটাও কম্পিউটার শিখতে গিয়ে। আর এখন তো যখন তখন...

বারোটা নাগাদ বাইরে এল একবার। ভিড়। পরপর দুটো দিন ছুটি গেছে, সব মানুষ হামলে পড়েছে আজ। ফ্যান চালিয়ে দিয়েছে ওরা। তাও ওরা ঘামছে। লাইন গেট পেরিয়েও বাইরে অবধি।

সান্যাল সাহেবের কাছে গেল দীপ। একটু আগেই স্লিপ পাঠিয়েছিলেন। কাজ করছিলেন, চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। বসতে না বসতেই চিঠিটা এগিয়ে দিলেন সান্যাল। এক্সপেক্ট করছিল। তবু পড়ে দেখল। দুটো নতুন ব্রাঞ্চ কম্পিউটারাইজড হয়েছে। ওদের ছেলে আছে। তবু এক্সপিরিয়েন্সড কাউকে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আসতে হবে। ইনিশিয়াল বট্‌ল্-নেকগুলো ছাড়িয়ে দিলে আর অসুবিধে হবে না।

—কিন্তু এখন যা রাশ, ইয়ার এন্ড আসছে, দু'-দুটো জায়গায় অতদিন মানে এদিককার কাজ...

—সেটাও আমি ডিসকাস করেছি, চেইন স্মোকার সান্যাল সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি নেবালেন, ফার্স্টলি আপনি একসঙ্গে দুটো ব্রাঞ্চ-এ যাবেন না। একটাতে নেক্সট উইক, গোড়ার দিকে নয়, ফ্রাইডে-স্যাটারডে দুটো দিন নিন। পরের মাসে অন্যটা।

—দু'দিনে হবে?

—ওদের তো ট্রেইন্ড লোক রয়েছে। শুধু অপারেশনগুলো একবার দেখিয়ে আসা। আমি বলেছি। দু'দিনের বেশি আপনাকে স্পেয়ার করা যাবে না।

সুবিধাগুলো ভাবছিল একটু আগেই। এই একটা অসুবিধা। যখন তখন

হয় ট্রেনিং নিতে না হলে ট্রেনিং দিতে অল্প নোটিশে ছুট লাগাতে হয়। চিঠিটায় চোখ বুলোতে বুলোতে দীপ জিজ্ঞেস করল, ব্রাঞ্চ দু'টো কোথায় কোথায়?

—একটা দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনা, সোনারপুর, অন্যটা বারাসত। আপনাদের দেশের বাড়ি না কি আছে না কাছাকাছি—একবার বলছিলেন?

বারাসত? ভাবতেই বুকের রক্ত মুখ অবধি উঠে এল দীপের। চিঠি দু'টো নিয়ে কম্পিউটার রুমে এসে তিথির ই-মেলটা খুলল।

—কাল কত রাত অবধি জেগে ছিলাম জানো? ঘুম যদি বা এল একটু পরে পরেই উঠে পড়েছি, আর জল খেয়েছি, আর তোমার কথা ভেবেছি। সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি। উঠে দেখলাম একটা ড্রিম দেখেছি। ওয়েট ড্রিম। ওয়েট ড্রিম বোঝ? তুমি কিচ্ছু বোঝ না। হাঁদারাম। আজ আসছ তো?

দুপুর অবধি ঠিক ছিল, তিনটের পর থেকেই চঞ্চলতাটা অনুভব করতে শুরু করল দীপ। এটা আগে ছিল না। ক'দিনই টের পাচ্ছে; ওই ব্যাপারটা হয়ে যাবার পর থেকেই। একটা টান। যেন যেতেই হবে। না গেলেই নয়।

মেয়ের স্কুলের স্পোর্টস, সান্যাল তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। বটাদাকে ম্যানেজ করা কোনও ব্যাপারই নয়। তবু বটাদা ঠোঁট মুচড়ে হাসল। ওটার অনেক মানে হয়। দীপ বুঝল, ধরে ফেলেছি ব্রাদার! কতদূর গুটিয়ে আনলে? দীপও হাসিটা ফেরত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এই একটা বিরাট সুবিধা দীপের। বাড়ি, অফিস আর তিথিদের বাড়ি কোনওটাই খুব দূরে নয়। চল্লিশ মিনিট দূরত্বের এক একটা বাহু, এমনি একটা ত্রিভুজের তিনটে শীর্ষবিন্দু। ঘড়ি দেখল। চারটে বাজতে দশ। তার মানে সাড়ে চারটেতেই পৌঁছে যাবে।

তিথিদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে বুকের ভেতরটায় আর একবার হোঁচট খেল। তিথির মা নেই। বাবা যে থাকবেন না সেটা তো জানা কথা। টালিগঞ্জ, স্যাটারডে, ক্যালকাটা আরও কী সব ক্লাবের জলে ডোবাডুবি করে তথাগত রায়ের বাড়ি পৌঁছবার আগেই ভিক্টোরিয়ার পরী আকাশে উড়ে যায়। কিন্তু শ্রীমতী সুপর্ণা রায়েরও না থাকাটা দীপের এক্সপ্কটেশনের ধারেকাছেও ছিল না।

—ফ্ল্যাট? সেটা কী জিনিস রে?

মা ফ্ল্যাট দ্যাখেনি তা নয়। বুলুমাসিদের ফ্ল্যাট-প্রবেশের নেমন্তন্নে দস্তুরমত সারাটা দিন কাটিয়ে এসেছে। পাড়াতেও প্রোমোটাররা রাতারাতি ফ্ল্যাটের বাগান বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। আসলে মায়ের 'ফ্ল্যাট', তারপর জিজ্ঞাসা-চিহ্নটায় অনেকখানি আদেখলেপনা ছিল। কেমন ফ্ল্যাট, কত বড় ফ্ল্যাট, সেই ফ্ল্যাটে কী কী আছে ইত্যাদি।

বাবা বরং অনেক সহজ করে দিয়েছিল,—ফ্ল্যাট মানে জানো না? সমতল। টেউটেউ নেই। আমাদের বেড়াচাঁপার মতো ঘোরানো সিঁড়ি নেই, দেউড়ি নেই, বারান্দা-উঠোন নেই, চিলেকোঠা নেই, ছাতও নেই। ফ্ল্যাটে শুধু পাশাপাশি কয়েকটা ঘর, আর দরজা। ঘরগুলো দরজা দিয়ে ভাগ ভাগ করা। এঘরের মানুষ ওঘরের মানুষকে চেনে না।

—থামো ত'! এক ধাক্কায় বাবার গলা বন্ধ করে দিয়েছে মা। পাশে টেনে নিয়ে গেছে,—হ্যাঁরে, কেমন ফ্ল্যাট ওদের?

সত্যি বলতে কী, দীপ সেইভাবে উদাহরণ-সহযোগে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এটুকু দেখেছে,—নীচে বেসমেন্ট-এ দাগ কাটা কাটা, সেখানে প্রত্যেকের গাড়ির জন্য জায়গা বরাদ্দ। তিথিদের জন্য দু'টো ঘর, একটা মিস্টার একটা মিসেস রায়ের। —আমার জন্যেও একটা বলা আছে, দাঁড়াও না, ড্রাইভিংটা শিখে নিই, তিথি বলেছে।

ফ্ল্যাট, মানে সমতল বলছিল বাবা।

তিথিদের ফ্ল্যাটটা কিন্তু সমতল নয়, এ'রকম ফ্ল্যাট আগে দ্যাখেনি দীপ। বড় সেগুনকাঠের দরজা, ওপরে পেতলের ফলকে 'রয়'; খুললেই একটা ল্যান্ডিং। সেখানেই সোফাসেট, টিভি, একপাশে সেলারে সাজানো ফ্রিংকস্, মুখোমুখি কুড়ি ভল্যুম এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, মাথার ওপর মনজিত বাওয়া। ল্যান্ডিং থেকে একধাপ করে সিঁড়ি; ভেতরে চলে গেছে তিথির ঘর, তিথির মায়ের ঘর, তিথির বাবার ঘর। দক্ষিণে বড় ব্যালকনি, তাছাড়াও প্রত্যেক ঘরের লাগোয়া ছোট ছোট ব্যালকনি। ল্যান্ডিংয়ের পশ্চিমে দু'ধাপ উঠলে ডাইনিং স্পেস, কিচেন, কমন টয়লেট। প্রত্যেক বেডরুমের অ্যাটাচ্ড্ বাথরুমে শাওয়ার-বাথটাব।

কম্পানি যে ফ্ল্যাটটা দিয়েছিল আলিপুরে, সেটা ছোট, এটার মতো বাইশ শ' স্কোয়ার ফুট নয়। তাছাড়া, এটায় তিনখানা কার পার্ক, নীচে সার্ভেন্ট্স্ কোয়ার্টার। বাবা নিজেই পারচেজ করে নিল। মা-ও খোঁচাচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। একদিক থেকে সুবিধে হয়েছে, লোনের প্রিন্সিপালটা কম্পানি হাউসরেন্ট অ্যালাওয়েন্স হিসেবে দিয়ে দেয়, ইন্টারেস্টটা বাবার ট্যাক্সেব্ল্ ইনকাম থেকে বাদ যায়। বাবাকে পকেট থেকে কিছুই দিতে হয় না।

তিথির সাবজেক্ট অবশ্য কমার্শিয়াল ট্যাক্স, একজন সিনিয়ারের কাছে যেতেও শুরু করেছে। তাতে বাবার ইনকামট্যাক্স-এর ক্যালকুলেশন করা আটকায় না।

এতসব কিছুই বলতে পারেনি মাকে। হুঁ হাঁ গোছের দায়সারা জবাব শুনে মা সরে গেছে। অপেক্ষা করে আছে কবে তিথির মা এসে ডেকে নিজেদের ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে যাবেন।

—মাকে দেখছি না? দম চেপে প্রশ্নটা করেই ফেলল দীপ।

—না, নিউমার্কেটে গেছে। উত্তরটায় যতখানি উত্তেজনা আশা করেছিল তা না পেয়ে দীপ থমকে গেল।

কারণটা অবশ্য তিথির বেডরুমে ঢুকেই বোঝা গেল। ড্রেসিংটেবিলের সামনে দু'টো লিপস্টিকের শেড নিয়ে পরীক্ষা করছিল তিথির বয়েসিই যে মেয়েটা, তাকে আগে দ্যাখেনি দীপ।

আয় আলাপ করিয়ে দিই, এ দীপ, আমার বয়ফ্রেন্ড, আর ও হচ্ছে চন্দনা, আমার স্কুলের ক্লাশমেট, এখন নিজেই একটা বুটিক চালায়। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, দীপ ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার, তার সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট পড়ছে, কম্পিউটারেও অ্যাডভান্সড্ কোর্স করা আছে।

'বয়ফ্রেন্ড' কথাটা এত অক্লেশে বলা হল যে দীপের মনে হল বেড়াচাঁপার অন্ধকার চিলেকোঠাটা সবার সামনে হাট করে খুলে দিয়েছে তিথি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হল, ওদের সম্পর্কটায়, তিথির দিক থেকে, এটা এক ধরনের সরকারি শিলমোহর।

তবু একটা অস্বস্তি গ্রীষ্মের ঘামের মতো ঘাড়ে-গলায় লেপ্টে রইল দীপের। ওই ম্যানেজমেন্ট পড়া আর প্রবেশনারি অফিসার, দু'টোই মিথ্যে। কম্পিউটারটাও অর্দ্ধসত্য।

—তাই? কী ব্রিলিয়ান্টরে। তোর কি সব বন্ধুই এ'রকম ব্রিলিয়ান্ট? চন্দনা প্লাক করা ভুরু প্রায় চুলের কাছাকাছি তুলে দীপের দিকে এগিয়ে এল।

দীপ ভয়ে ভয়ে দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করে নমস্কার করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা নিচু টুলটায় বসে পড়ল। বসতে বসতেই ভাবল, সব বন্ধু মানে? কতগুলো বন্ধু তিথির? কতজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে চন্দনার?

তিথিই দীপের প্রশ্নটা তুলে নিল, তুই কার কথা বলছিল চন্দনা?

—সেই যে চিন্ময় না কার সঙ্গে সেবার ইস্টোডিউস করে দিলি। সেই যে রে ডাক্তার না কী যেন!

—চিন্ময়? তোর মনে আছে? ও আবার ব্রিলিয়ান্ট হল কবে থেকে? ডাক্তারি পড়তে ব্রিলিয়ান্স লাগে নাকি? দিনরাত খালি ঘ্যানঘ্যান মুখস্থ করতে হয়। মুখস্থ করতে করতে ওরাও কেমন ডাল হয়ে যায়। তাছাড়া চিন্ময় তো বাইরেও যেতে পারে নি। গ্রামে চাকরি নিয়ে চলে গেছে হেল্থ সেন্টার না কোথায়।

—গ্রাম? মাগো! ভাবলেই কান্না পায়। গ্রাম মানেই তো কাদা-ধুলো-পচাপুকুর- সাপ আর জোঁক। জানিস তিথি, আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে, গজার মা, ক্যানিং-এর দিকের কোন গ্রাম থেকে আসে, ও বলছিল, ওদের গ্রামে কারুর বাড়িতে টয়লেট অবধি নেই। পটি করতে ওরা খোলা মাঠে গিয়ে বসে থাকে। ছেলে মেয়ে সবাই।

হিহি করে হাসল চন্দনা।

দীপ দেখছিল চন্দনাকে। শাড়ি কিংবা সালোয়ার-কামিজ পরলে মেয়েটাকে খারাপ দেখাত না। সত্তরকিলো ওজন, পাঁচ ফুট হাইট আর স্কার্ট ব্লাউজে ওকে স্কুটারের টায়ারের মতো দেখাচ্ছে।

হঠাৎই দীপ বলে উঠল, গ্রাম মানেই ওইরকম হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। ইচ্ছে করলেই গ্রামের মানুষ বাড়িতে বাথরুম-টাথরুম বানিয়ে নিয়ে থাকতে পারে, আর অনেকেই থাকেও। গ্রামে যথেষ্ট বেশি আলো এবং হাওয়া, খাবার-দাবারও অনেক সরেস এবং টাটকা। তাছাড়া কলকাতা শহরেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মানুষকে সকালে ঘটি হাতে রাস্তার নর্দমায় গিয়ে বসতে হয়।

বলে ফেলেই দীপ অবাক হয়ে গেল। বাবা। এগুলো সবই দর্পনারায়ণের কথা। ভেতরে চাপা ছিল। চান্স পেয়ে বেরিয়ে এল। দীপও যে আসলে শুধু দীপ নয়, দর্পনারায়ণের ছেলে দীপনারায়ণ, সেটাও ঝুঁটি ধরে কে যেন মনে পড়িয়ে দিল।

অবাক-হয়েছিল তিথি এবং চন্দনাও।

চন্দনা বলল, বাবা! আপনি গ্রাম সম্বন্ধে এতখানি সেনসিটিভ জানতাম না তো? গ্রামে গেছেন কখনও?

দীপনারায়ণ বলল, গেছি তো বটেই, থেকেছিও। গ্রামেই আমাদের আদি বাড়ি। সেই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এইরকম ফ্ল্যাটবাড়ির একশ'খানা ধরে যাবে।

—তাই? আপনারা...মানে ওখানকার ল্যান্ডলর্ড? গালে হাত দিল চন্দনা।

—হ্যাঁ জমিদার। আগে রাজাই বলত লোকে। এখনও জমিদারি রয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই বেড়াতে যাই। তিথিও তো গিয়েছিল আমার সঙ্গে।

দীপ মন থেকে মুছে ফেলল যে জমিদারির গন্ধটুকুও পড়ে নেই দীপদের জন্যে। বিস্তারিত জানে না, কিন্তু দীপরা যে জমিদারির সমস্ত আয় থেকে বঞ্চিত, অভাবের সময়টায় বাবা অথবা মা কেউই বেড়াচাঁপায় আশ্রয়ের জন্য ফিরে না যাওয়ায়, দীপ ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারে মস্ত জমিদারির যে স্মৃতিটুকু দর্পনারায়ণের রয়েছে, দীপ অবধি পৌঁছতে সেটা শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে যাবে।

—তিথি তুই? এবারে চন্দনা তিথির দিকে ফেরে, তুই গিয়েছিলি গ্রামে? কেমন রে ওই রাজত্ব টাজত্ব, যেসবের ডেসক্রিপশন শুনছি?

কথাটায় লুকনো হুল ছিল বোধহয়। শুধু ঘাড় নেড়ে হুঁ বলল তিথি। তারপর শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, তোর বুটিকের এক্সটেনশন ইনঅগারেট কবে যেন বললি?

—দোলের দিন, হাতে আর মাত্র পাঁচটা দিন। প্লিজ! আজ তুই না গেলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাবে।

ইচ্ছে করেই কথাটা ঘুরিয়ে দিল তিথি, দীপ বুঝতে পারল। দীপ খুব চাইছিল ওদের জমিদারি সম্বন্ধে তিথিও কিছু বলুক। চাইছিল তিথি ওর পাশে দাঁড়িয়ে সেই পুরনো বাড়ি, হাতিশাল, পুকুর এবং চন্দ্রকেতুগড় সম্বন্ধে চন্দনাকে ওর অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিক। অথচ তিথি কথা বলল অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে। শুধু সামান্য হুঁ বলেই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিল।

দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে তিথি কি বুঝতে পারল? কাছে সরে এল। বলল, আমার নতুন কেনা কম্পিউটারটা দেখতে চাইলে না?

চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে দীপ তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় তোমার পি. সি?

এতক্ষণ খেয়াল করেনি, প্লাস্টিকের ঢাকনা চাপা ছিল। সরিয়ে দিতেই ঝলমল করে উঠল বিংশ শতাব্দীর শেষতম বিস্ময়। গায়ে হাত বুলিয়ে দিল তিথি, পোষা ল্যাপডগকে যেমন আদর করে মনিব, কী স্লিক না?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর, দীপও গলায় তিথিকে খুশি করার মতো আবেগ ঢেলে দিল।

চন্দনা এগিয়ে এল, কিনলি?

—না তো কী, এমনি এমনি এল? হাসল তিথি হিহি করে,—বাবাকে বলেছিলাম ল্যাপটপ দিও। তা বাবা বলেছে, যেদিন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সব হ্যান্ডল্ করতে পারব, সেদিন ল্যাপটপ দেবে। এটা বাবাও ইউজ করবে, বাড়িতে থাকবে।

দীপের বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়। কত সহজে এরা সব কিছু পেয়ে যায়। ইচ্ছেটা লম্বা করলেই ল্যাপটপ। একটা পার্সোনাল কম্পিউটার-এর এত শখ দীপের। টেলিফোন নিয়েই যা হল, তারপর কম্পিউটার! এই মেয়েটা কিসে যোগ্য তার চেয়ে? তিথির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল দীপ,—ও জন্মানোর জায়গাটা ঠিক ঠিক চুজ করেছে।

চন্দনা তাড়া লাগাল, কিরে, যাবি?

হ্যাঁ, যাই, দীপের আরও কাছে এগিয়ে এল তিথি, আমাকে একটু চন্দনার সঙ্গে বেরুতে হবে। না হলে ওর নাকি দোকান খোলাই হবে না। আমি রেডি হয়ে নিই?

ঘাড় নেড়ে বাইরে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল দীপ। সূর্য আর নেই। পুব থেকে অন্ধকারের হাত আকাশটাকে টেনে নিচ্ছে নিজের কোটরে। পাখির ডাক ঝিমিয়ে আসছে। সাততলার ওপর থেকে আকাশটা দেখতেই ভাল লাগে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। নীচে মরা খাল, আবর্জনা, বস্তি। এবং মানুষ। ছোট ছোট। তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোও সেই মাপের। একটা রেডিও, সাইকেল, বড়জোর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি। কম্পিউটার ছুঁতে গেলে সাততলা অবধি উঠতে হয়।

—দারুণ। ভীষণ হ্যান্ডসাম। টল, শার্প ফিচার্স। চেহারাটায় বেশ একটা অ্যারিস্টোক্রেসি আছে। হবে না। ওই হেরিটেজ। তবে তোর পাশে একটু কম স্মার্ট দেখায়।

—ওটা হয়ে যাবে। তৈরি করে নেব।

আগের কথাগুলো শুনতে পায়নি দীপ। অন্যমনস্ক ছিল। তিথির শেষ কথাগুলো মনের ভেতর নাড়াচাড়া করল।

কে বদলাবে? তিথি যাবে দীপদের তোলা উনুন, শেওলাধরা কলতলা, ভাগের সিঁড়িতে? এইসব,—এই ড্রেসিংটেবিল, পার্সোনাল কম্পিউটার, হেয়ার ড্রায়ার, দুশ'টা লিপস্টিকের শেড, এসি-ইনভার্টার শুদ্ধ?

তার চেয়ে অনেক বেশি সম্ভব দীপ-এর উঠে আসা। বেশি তো কিছু নয়, বাইরে থেকে দরজা টেনে দিলেই ছিটকিনিটা পড়ে যায়। তারপরেই পেছনে পড়ে রইল সব। আঠাশটা বছর। স্কুটারটা আনবে? স্কুটার তিথির পছন্দ নয়,—বাইক, হিরোহন্ডা। পেছনে বসবে কোমর জড়িয়ে চুল উড়বে হাওয়ায়। দিল মাঝে মোর। লিফ্‌ট। সাত অবধি গুনতে শিখলেই চলবে। দরজা খুলে যাবে। দশ পা হাঁটলেই 'রয়', পেতলের ফলক। ঝর্না বেল। সেগুনকাঠের দরজা হাট করে খোলা।

কিন্তু দীপ যে একা নয়! মা! তিথির মা ফিয়াট সিয়েনার দরজা আধখুলে পা রাখলেন মাটিতে, কাঞ্জিভরমের নীচটা উঠে গেছে গোড়ালি থেকে তিন ইঞ্চি উঁচুতে। সাবধানে পা ফেলছেন মিসেস রায়। কাদা, ময়লা, আবর্জনা। ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দীপদের দরজা। কড়া ধরে ঝাঁকানি। আরে, কী সৌভাগ্য, আসুন আসুন। দু'-চারটে মামুলি কথাবার্তা। তারপর,—একবার আসুন না! দীপের সঙ্গে সঙ্গে মা-ও।

কিন্তু বাবা?

—অসম্ভব।

আড়াইশ চারাপোনায় পঁচিশ পয়সা বেশি নিয়েছিল পঞ্চানন, তাই নিয়ে তুলকালাম, বাজারে সামনের দু'খানা দাঁত রেখে এসেছে বাবা। তবুও,—ব্লু ব্লাড, বুঝেছ, নীল রক্ত। আমাদের বংশে কেউ ভিক্ষাপাত্র হাতে কারও দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়নি, শুনে রাখ। জমিদারি লাথি মেরে বেরিয়ে এসেছে, চাকরির মুখে আগুন দিয়ে চলে আসতে এক মুহূর্তও ভাবেনি, না খেয়ে থেকেছে, কিন্তু দয়ার দান গ্রহণ করেনি। আমার শেষ কথা, আমি যাব না।

—কী হল, একা একা দাঁড়িয়ে কী ভাবছ?

আগুনের মতো সেজেছে তিথি। বুকের ভেতরে কী যেন গলতে শুরু করল। পারবে না। এই আকর্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার সাধ্য দীপের নেই।

—প্লিজ, কিছু মনে কোরো না। তোমাকে যখন ই-মেল করেছিলাম, তখন কি আর জানতাম ও আসবে? তুমি আসার আধঘণ্টা আগে এল। ফোনটোনও করে আসেনি। আমি জানি, তুমি খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছ। কিন্তু লক্ষ্মীটি, ডার্লিং, এবারের মতো ক্ষমা করে দাও।

চন্দনা নেই ঘরে? দেখার জন্য ঘাড় উঁচু করল দীপ। তিথি বুঝতে পারল। বলল, বাথরুমে গেছে, শুনতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, আর একটা দরকারি কথা বলার জন্যে এলাম। একটা গুড নিউজ। তুমি ফেরার পথে টেনশান করছিলে না? আজ ওটা হয়ে গেছে।

বুঝতে পারল না দীপ। তাকিয়ে থাকল তিথির মুখের দিকে।

—ঠিকই বলেছে চন্দনা, তুমি একটা আনস্মার্ট। অত কিছু করলে ওখানে। কিছু যদি হয়ে যেত? আজ ওটা হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত। পরেরবার অবশ্যই ডিউ প্রটেকশান নেবে। প্রিপেয়ার্ড থাকার দায়িত্ব কিন্তু তোমার।

—আরে, তোরা এইখানে? আমি ভাবলাম, আমাকে ফেলে রেখেই চলে গেলি নাকি! এই যে, আপনার পার্টিকুলার্স একটু দিন তো। নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার এইসব। কখন দরকার লাগে।

দীপ নামটা বলল, ফোন নাম্বার অ্যাড্রেসটা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল। ফোন আছে নাম্বার নেই, সেটা কি লোককে বলা যায়?

—ব্যাঙ্ক? কোন ব্রাঞ্চ?

নোটবুকে সব লিখে টিখে নিয়ে চন্দনা দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিথি হঠাৎই ওকে তাড়া লাগাল, এই চন্দা, প্লিজ, তুই একটু নীচে গিয়ে দাঁড়া। আমি ওর সঙ্গে জরুরি একটা কথা সেরেই যাচ্ছি।

চন্দনা বাইরের দরজাটা টেনে বেরিয়ে যেতেই ঝাঁপিয়ে এল তিথি। ঘরে টেনে নিয়ে গেল দীপকে। নিজের গোলাপী লিপস্টিকে দীপের ঠোঁটগুলোকে রং করতে করতে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে জড়িয়ে বলল, শোন, একটা কথা তোমাকে আগেভাগে সাবধান করে দিই। চন্দনার কিন্তু বাজারে ভীষণ বদনাম। হ্যান্ডসাম ছেলে দেখলে ওর মাথার ঠিক থাকে না। দেখাটেখা করতে চাইলে একদম পাত্তা দেবে না। প্রমিস?

তিথির ঘ্রাণ নিতে নিতে দীপের মনটা হঠাৎই ভাল হয়ে গেল। চুলে মুখ ডুবিয়ে কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে বলল, প্রমিস।

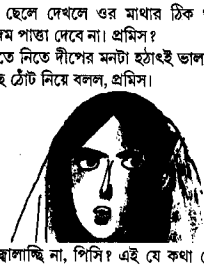

তোমাকে খুব জ্বালাচ্ছি না, পিসি? এই যে কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ হঠাৎ উদয় হচ্ছি। একলা মানুষ তুমি। অসুবিধে হচ্ছে খুব, নাগো?

বালাই ষাট, অমন কথা মুখে আনতে নেই। তোরা এলে কী যে ভাল

লাগে। একা একা প্রেতপুরীতে থাকি। যখের মতো পরের ধন আগলাই। আসবি বাবা, যখন প্রাণে চায় আসবি।

বলল বটে, কিন্তু দীপের মনে হয় বুড়ি একা একা মস্তিতেই আছে। বেশ রাজা রাজা ভাব। খাচ্ছে দাচ্ছে হুকুম মারছে। বললেই হল, পরের ধন।

ভাবল, একবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা পরের ধন পরের ধন করছ, ব্যাপারটা ঠিক কী ভেঙে বল তো ? বাবাকে জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যায়, মাও খুলে বলে না। এত কিছু থাকতেও বাবার অমন হাভাতের দশা কেন? কেনই বা তুমি এই বয়েসে পড়ে পড়ে শেয়াল-শকুন ভাগাচ্ছ?

থাক্। এখনও সম্পর্কটা তেমন শক্তপোক্ত হয় নি। সুযোগ বুঝে পরে জিজ্ঞেস করা যাবে।

অন্য কথা পাড়ল দীপ।

—না, মানে সেদিন অমন হুট করে এসে পড়লাম। একা এসেছিলাম তাও নয়। তিথি, মানে আমার বান্ধবী, ওকে নিয়ে হঠাৎ চড়াও হলাম। আমাদের তো ঠিক, ইয়ে, মানে এখনও...

—তাতে কী হয়েছে? আমার তো বেশ লাগল। মেয়েটাও খুব মিষ্টি। আজকালকার মেয়েদের মতো নয় মোটেও। সুন্দর কথাবার্তা। আমাকে পেন্নাম করলে, কত কথা বললে রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে। ওকে আবার নিয়ে আসিস, সেদিন ভাল করে আলাপই হয়নি।

সত্যি, এখনও বাঙালি কালচারে সুযোগমতো একটা প্রণামের চেয়ে ভাল ঘুষ আর হয় না। ইনটেলেকচুয়াল ঘুষ। উত্তম-সুচিত্রার ছবিতে কথায় কথায় প্রণাম। প্রণাম মানেই হয়ে গেল। পিসিকে তো বটেই, বাবা-মাকেও ওই এক প্রণাম দিয়েই ফ্ল্যাট করে ফেলেছে তিথি। বেঁচে থাক্ প্রণাম চিরজীবী হয়ে।

পিসি উঠে গেল। রান্নার নির্দেশ দিতে বোধহয়। পিসি আলাদা খায়। সন্ধেবেলাটায় রান্নার পাট নেই। ফল চিঁড়ে দুধ এইসব। দিনেও নিরামিষ। দীপের মতো কেউ এলে পুকুরে জাল পড়ে। তবে মুরগিটুরগি ঢোকে বলে মনে হয় না।

বারাসত ব্রাঞ্চে আসতে হবে ভেবেই উত্তেজনা হয়েছিল দীপের। তিথির কাছে কথাটা পেড়েওছিল। যাবে নাকি আর একবার? গরম পড়ে গেছে, যাওয়া-আসায় ধকল খুব। তাছাড়া ওদের সামনে কীসব অ্যাসেসমেন্ট আছে। ওর বাবাও কিছুদিন চেকআপ না কী করাবেন, বাড়িতেই থাকবেন ছুটি নিয়ে। সব মিলে তিথির আসা হবে না।

তিথিকে বাদ দিলেও আরও দু'খানা উত্তেজনার কারণ রয়ে গেল দীপের জন্য।

প্রথমটা চন্দ্রকেতুগড়।

এসে থেকেই চন্দ্রকেতুগড়টা মাথায় ঘুরছিল। নাটক করে কবিতা লেখে বিভাস, স্কুলের বন্ধু, ওর সঙ্গে একদিন দেখা, কথায় কথায় চন্দ্রকেতুগড়ের কথা বলে ফেলল। বিভাস বলল, এসব ব্যাপারে তো আমার তারাজেঠুই অথরিটি। চল্ তোকে একদিন আলাপ করিয়ে দিই।

বিভাসের সঙ্গেই একদিন গিয়ে হাজির হল ভদ্রলোকের বাড়ি। তারাপদ সাঁতরা। এইসব পুরাতাত্ত্বিক খোঁজখবরে সত্যিই শেষ কথা। লাইনের সকলেই নাম শুনলে দু'হাত কপালে ঠেকায়। গিয়ে অবাক হল। খালি গায়ে ধুতি পরে বারান্দায় ঝুঁকে বসে মন দিয়ে বইয়ের প্রুফ দেখছিলেন। দীপরা যেতেই একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন, কী বলব আপনি না তুমি?

সহজ হতে দু'মিনিটও লাগল না। পণ্ডিত মানুষরাই বোধহয় এতখানি নিরহঙ্কার হয়। দীপের মতো অচেনা-অজানা মানুষকেও যথেষ্ট সময় দিলেন।

—চন্দ্রকেতু? রাজা? ওটা মিথ্। বাংলায় কম করে তিনটে জায়গায় রাজা চন্দ্রকেতুর নাম পাবেন। চন্দ্রকোনার নাম শুনেছেন? সেখানেও রাজা চন্দ্রকেতু। কোনও একজন রাজা চন্দ্রকেতু নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু যে কোনও ঐতিহাসিক জায়গার সঙ্গেই চন্দ্রকেতুর নাম জড়িয়ে দেওয়া একধরনের অতিসরলীকরণ।

—তাহলে কি চন্দ্রকেতুগড়ের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নেই? দীপ যেন অনেক আশা করে এসেছিল, যেন চন্দ্রকেতুগড় তার একান্ত নিজস্ব কিছু, যেন চন্দ্রকেতুগড়ের ঐতিহাসিকতা কমে গেলে দীপেরও ব্যক্তিগত ক্ষতি।

—তা কেন? এবারে সোজা হয়ে বসলেন তারাপদ সাঁতরা—ওখানে অসাধারণ ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। এমন কিছু কিছু মূর্তি আছে যেগুলো গুপ্ত-কুষাণ যুগের। গ্রীকো-রোমান সভ্যতার সঙ্গে ওই অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগ ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে। আসলে ওটা ছিল একটা বন্দর। দূর-দূরান্তরের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগ ছিল ওই অঞ্চলের। খুব উৎকৃষ্ট সভ্যতা একসময় ওইখানে ছিল। সব মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে।

—হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর আমলের?

—না, অত আগের নয়। সেটা বরং পাওয়া গেছে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। তবে এইসব ঠিকমতো এক্সক্যাভেশন হলে প্রমাণ হবে, এই বাংলাতেও এককালে এমন এক সভ্যতা ছিল, যা নিয়ে আমরা অহঙ্কার করতে পারি।

—ওখানেও একটা ঢিবি দেখলাম—খনা মিহিরের ঢিবি। ওটার কি সত্যিই খনা বা মিহিরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে?

—নেই। ওটা আসলে মন্দির। ধাপে ধাপে নেমে গেছে। ওখানকার টেরাকোটার স্টাইল নিয়ে একটা বই লিখেছি আমি, দেখাব। পর পর নীচ থেকে ইঁটগুলো একটু একটু করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওপরে তোলা হয়। আর সেকি ইঁট। এক একটা বারো ইঞ্চি বা তার চেয়েও লম্বা। এখনও তেমনি মজবুত।

বৃদ্ধ মানুষটি উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। ভেতরে ঢুকে ধুলো ঝেড়ে একটা বই বের করে এনে খুলে দেখাতে লাগলেন দীপদের। দীপ আবার জিজ্ঞেস করল, আর বেড়াচাঁপা? ওই যে বেড়ার গায়ে চাঁপাফুল ফোটাবার গল্প?

—ওটাও মিথ্। আসলে আমরা বড় গল্পের ভক্ত। শুধু বাংলায় কেন, ভারতের ইতিহাসেই গল্পের মোড়ক ছাড়িয়ে সত্যের শাঁস বের করে আনা এক দুরূহ কাজ। মুখে মুখে এত প্রবাদ, এত কল্পকথা এত মঙ্গলকাব্য-উপকাহিনী ছড়িয়েছে যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে প্রমাণ করাই এখন শক্ত, তবে যে জায়গাটার কথা বলছেন, সেখানে প্রাচীন এক সভ্যতা মাটি চাপা পড়ে আছে। তার ওপর দিয়ে কাল তার রথের চাকা গড়িয়ে দিয়েছে হাজার বছর ধরে। বেড়াচাঁপায় যে ফকিরের গল্প শুনেছেন তার কাহিনী ছ' সাত শ' বছরের। মুসলিম ডাইন্যাস্টিতে পুরনো সভ্যতার অনেক কিছুই তো এলোমেলো হয়েছে, ধর্মপ্রচারে কিছু মিথও ছড়িয়েছে। তারই একটা বেড়ায় চাঁপা ফুল। তবে সবচেয়ে ভাল কাজ করেছি স্বাধীনতার পর, আমরা। কিছু চোর-জোচ্চোর-বদমায়েশ দামি দামি পোড়ামাটির জিনিস বর্ডার পেরিয়ে বিদেশে স্মাগ্‌ল করে পয়সা কামিয়েছে; কিছু মূর্খ অমূল্য কার্ট হুইল বাচ্চার খেলনা ভেবে বাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে; যাদের করার কথা ছিল তারা হয় অর্থের অভাবে না হয় ইচ্ছের অভাবে খোঁড়াখুঁড়ির কাজটা অর্দ্ধেক করে ফেলে রেখে দিয়েছে। তবে সমস্যা আছে। কোন জায়গাটায় খুঁড়লে যে পুরনো সভ্যতা ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে সেটা আজও নির্ণয় করা যায়নি।

আরও অনেক কথা বলেছিলেন প্রাজ্ঞ মানুষটি। ফিরে আসতে আসতে দীপের মনে হচ্ছিল, এখনই আর একবার চন্দ্রকেতুগড়ে যেতে পারলে হত।

দ্বিতীয় আকর্ষণটা সেই ছাদের ঘর। বন্ধ ছিল। খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। খাট। পুরনো তোরঙ্গ। ভেতরের চামড়া বাঁধানো ডায়েরি। প্রথম পাতাটাই খোলা হয়েছিল সেদিন। নামটুকুই পড়া হয়েছে। আর তারিখ। বছর ষাটেক অপেক্ষার একটা দিন। তারপরই নীচে ডাকাডাকি, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। পড়া হয়নি। ডায়েরিটা টানছিল দীপকে।

নামটুকুই বা কেন? প্রথম পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ছিল,—"শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীর নিজের কথা।"

"নিজের কথা।" আত্মজীবনী তো আকছারই লিখছে লোকে। চারটে সত্যের সঙ্গে দশটা মিথ্যের মিশেল। মশলা মাখিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করছে জনগণ গোগ্রাসে গিলছে। কিন্তু এটা আত্মজীবনী নয়। মানুষ যখন আত্মজীবনী লেখে অন্যদের পড়ার জন্যে সে আত্মজীবনী আসলে মিথ্যাজীবনী। সত্যিকারের আত্মজীবনী যে লেখে সে লুকিয়ে রাখে চামড়ার খাপে টিনের তোরঙ্গে চিলেকোঠার বন্ধ ঘরে। সে আত্মজীবনী নিজের সঙ্গে নিজের কথা।

ওই নিজের কথাটাই চুম্বকের মতো টানছিল দীপকে। যেন এক রহস্য। সঙ্কেতটুকুই করায়ত্ত হয়েছে। এবারে রহস্যভেদ। তর সইছিল না দীপের।

বারাসতে এসে দীপ দেখল, তেমন কিছু কাজ নেই। এই ব্রাঞ্চেও বেশ দক্ষ একজন কম্পিউটারজানা কর্মী রয়েছেন। তিনি নিজেই সব চালিয়ে নিতে পারবেন। সামান্য দু'য়েকটা প্রোগ্রামিং আর ফাংশন দেখিয়ে দিল দীপ। কিছু ফরম্যালিটিজ সেরে ফেলল। একটা দিন পুরোই কম্পিউটার চালাল। সুপারভাইজ করল। তারপর দু'দিনের কাজ একদিনেই সেরে ফেলে ব্রাঞ্চ-এর ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে দ্বিতীয় দিনটা ডুব মারল।

ঠিক ডুব মারা নয়। ডুবে ভেসে উঠল বেড়াচাঁপায়। পিসির কাছে। আজও পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। তবে রবিবার ধরলে দু'টো দিন হাতে আছে। কাল একবার চন্দ্রকেতুগড়ে ঘুরে দেখবে। পরশু দিনটা বরাদ্দ শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীর জন্য।

ঘরটা টানছিল। একবার ছুতো করে ছাদে ঘুরেও এল দীপ। দেখে দমে গেল। তালাটা খুলেই ঢুকেছিল ঘরে। আসবার সময় তালা লাগাবার কথা খেয়াল ছিল না। তাছাড়া চাবি ছাড়া ওই তালা লাগাবেই বা কী করে? মনে হয় না টেপা-তালা লাগানো ছিল দরজায়। যাই হোক, ছাদে উঠে উঁকি মেরে দেখল, ছাদের ঘরের দরজায় নতুন একটা তালা লাগানো। বেশ শক্ত মজবুত

তালা। সহজে খুলে ফেলা যাবে সে পাত্র নয়। রাতটা চিন্তায় চিন্তায় কেটে গেল।

সকাল সকাল উঠেই চলে গেল চন্দ্রকেতুগড়। এবারে একা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল দূরে, যেখানে আগেরবার দেখেছিল পরিখা, পরিখার শেষপ্রান্তে দরজা, দরজাও নয় দু'খানা গাছ, পেছনে ফেলে এসেছে দুর্গপ্রাকার। দেখল অনেক জায়গাতেই মাটি খোঁড়া হয়েছে। গোল কুয়োর মতো খোঁড়া হয়েছে মাটি, সেখানে স্তরে স্তরে মাটির নীচে জমে আছে পোড়ামাটির চিহ্ন। এক জায়গায় পুকুরের মতো কিছুদূর মাটি কেটে আর এগুনো হয় নি। সেবারে একা আসে নি। ভুল করেছিল। সেই মাটি চাপা ইতিহাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দীপের মনে হল নীচে কারা যেন ফিসফিস করছে, কিছু বলছে; দীপ তাদের ভাষা জানেনা।

একটা গরুর হাম্বাধ্বনি, কাকের তীক্ষ্ণ চিৎকার ফিরিয়ে আনে দীপকে। দীপ তাকিয়ে দ্যাখে রোদ এখন তীব্র, শীতের তলানিটুকুও পড়ে নেই, এখনই বাড়ি না ফিরলে পিসি চিন্তা করবে।

পিসি বলেছিল, এখানকার মানুষ অনেকেই যেমন মাটি খুঁড়ে জিনিস বের করে বিদেশে বিক্রি করে দু' পয়সা কামিয়ে নিয়েছে, তেমনি দু'একজন নিজস্ব সংগ্রহশালায় অসাধারণ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সাজিয়ে রেখেছেন। খোঁজ নিয়ে জানল, ভদ্রলোক কলকাতা গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তাছাড়া বাসন্তী চক্রবর্তী তাকে টানছিল।

ফিরে পিসিকে নতুন করে দেখল।

একরকম দেখা মনে মনে। পিসি, একা একা জমিদারি সামলায়। সে 'সামলায়'-এর মধ্যে 'ভোগদখল করে'-টাই বেশি জায়গা পেয়েছিল। যেন এক স্বার্থপর বিধবা সাধ মিটিয়ে বিশাল জমিদারির অধিকার তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে।

আগেরবারের দেখাটাও ওপর ওপর। স্নেহশীলা নারী, ধর্মপ্রাণ। স্নান-ঠাকুর ঘর—রান্নার তদারকি-অতিথি পরিচর্যা। গড়পড়তা বাঙালি মাসি-পিসিরা যেভাবে বয়েস হলে দিন কাটায়।

এবারে একদম অন্য চোখে পিসিকে দেখল।

সকালেই একগাদা মুনিষ বার দুয়ারে লাইন করে বসেছিল। তাদের মুড়ি-জল খাইয়ে যার যার কাজ বুঝিয়ে ছেড়েছিল পিসি। তারপর ঢুকেছিল গোয়ালে। সব ক'টা গাই-গরুর তদারকি করেছিল নিজে, সদ্য বিইয়েছে যে গাইটা তার পিঠে-গলায় হাত বুলিয়ে আদর করেছিল। ওইটুকু দেখেই বেরিয়ে গিয়েছিল দীপ। এখন এসে দেখল, দু'তিনজন জড়ো হয়েছে, তারা অনেক করে কী সব বোঝানোর চেষ্টা করছে। পিসি মন দিয়ে শুনে বলল, বাবার নামে ইস্কুল, জমিটাও আমাদের; সেখানে দোতলায় দু'খানা ঘর বাড়াবেন বলে ইস্কুলের মাঠে পর্দা খাটিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখাবেন, এ তো আমি মেনে নিতে পারি না মাস্টারমশাই। দরকার হলে টাকা আমি দেব, কিন্তু আগে দরকারটা আমাকে ভালভাবে বোঝাতে হবে। আর যে যাই বলুক, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, বাড়িটাড়ি সব বাজে কথা, ওই হিন্দি সিনেমাটাই আসল।

মুখ কালো করে ফিরে গেল তদ্বির করতে আসা মানুষগুলো। অতজন মান্যিগন্যি মানুষকে অতখানি অথরিটি নিয়ে প্রায় অশিক্ষিত একজন বিধবা প্রায় বাধ্য করল নিজের কথা মেনে নিতে দেখেশুনে দীপের বেশ ভক্তিই হল।

আর তাতে দীপ যা ভেবে এসেছিল, কেমন গুলিয়ে গেল সব।

দুপুরে খেতে বসে কথাটা পাড়ল, আলগোছে।

পিসি একটু দূরে বসেছে;—ওটা একদম ফেলবি না, একদম টাটকা জিনিস, বলে বলে সবকিছুই খাইয়ে ছাড়ছে; পিসির গা থেকে সকালের জমিদারনি জমিদারনি গন্ধটা একদমই বেরোচ্ছে না, দেখেশুনে দীপ বলল,—আচ্ছা পিসি, ছাদের ওপর যে ঘরটা আছে না, ওই যে পুব দিকে, তালাবন্ধ...

—টিলেকোঠার ঘর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটায় কে থাকত বলো তো?

—কেনরে তোর কী দরকার অত জেনে?

খেতে খেতে বিষম খেল দীপ। সত্যি কথা বলে এই বুড়িকে ম্যানেজ করা যাবে না।

—জল খা, ষাট ষাট, জীব জীব। কেউ নাম করছে নিশ্চয়। মাথায় দু'বার থাবড়া দিল পিসি।

সামলে নিয়ে দীপ বলল, আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন ওই ঘরটা দেখে আমাদের কিউরিওসিটি হয়। তালাবন্ধ একটা ছাদের ঘর। তালাটায় হাত দিতেই খুলে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, পরে ওরা আমাকে বলল, ঘরটার তালা খোলা তাই একটা নতুন তালা লাগিয়ে দিয়েছি।

—কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে পিসি। ওই ঘরে তিথি একটা জিনিস ফেলে গেছে।

কোনও উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে দীপের দিকে তাকিয়ে রইল পিসি। সেরেছে। এ বুড়িকে গ্যাস দিয়েও শান্তি নেই।

—কী জিনিস?

—একটা কানের দুল।

—সোনার?

—তাই তো বলল।

—সোনার হলে পাওয়া মুশকিল। হাজারটা মানুষ ঘুরে বেড়ায়। ঘর খোলা দেখে প্রথম যে ঢুকেছে তারই চোখে পড়বে। সোনার জিনিস দেবার ইচ্ছা থাকলে আমার হাতেই দিত। দেয়নি যখন, ও আর পাওয়া যাবে না। যাই হোক, বলে দেব, তালা খুলে দেবে, খুঁজে দেখিস।

পিসি উঠে গেল। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে দীপের।

বিশু ডাকাত। ছোটবেলায় গল্প বলত মা। চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে আসত। ভয়ে পঞ্চাশটা গ্রামের মানুষ ঠকঠক করে কাঁপত। গল্প শুনে দীপও আঁচলের তলায় মাথা গুঁজে মা'র কথামতো গরাসগুলো গপগপ করে গিলে ফেলত।

পিসির স্যাঙাত বিশুকে দেখে দীপের সেই কথাই মনে পড়ে গেল। গল্পের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। সেইরকম লম্বা, সেইরকম কালো, সেইরকম চেহারা-চোখ-গলার স্বর। দরজার তালা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন একটু এদিক ওদিক হলেই পাশ থেকে রামদা তুলে এনে এক কোপে দীপের মুণ্ডুটা নামিয়ে দেবে।

দীপ খোঁজার ভান করল। জানলা, কুলুঙ্গি, খাটের ওপর, শতরঞ্চির নীচ। কোথাও খুঁজে না পেয়ে শেষ অবধি বিশুরই শরণাপন্ন হল,—কোথাও পাচ্ছি না বিশুদা। খাটের তলাটা এত অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। তুমি একটু দেখবে?

বিশাল চেহারা নিয়ে বিশুও ঘরের মধ্যে সেঁধুলো। খাটের তলায় সার্চলাইটের মতো মুণ্ডু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজল। তারপর দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, নাই।

—ওইদিকে? ওই যে, চটের বস্তাগুলো জড়ো করা। ওর মধ্যে যায়নি তো?

বিশু একবার চোখ ফেলে বলল, অন্ধকার বটে। আলোখান আইনছি।

মানুষটার গলায় বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার টান। হতে পারে ও'দিককার স্যাম্পল, পিসির কালেকশনে তো ভ্যারাইটির অভাব নেই। ওর চেয়ে বিশ্বাসী বডিগার্ড এদিকে নিশ্চয়ই মেলে নি।

পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নিয়ে বিশু ঘুরে আসতে যেটুকু সময় নিল সেটুকুই দরকার ছিল দীপের জামার নীচে ডায়েরিটা গুঁজে দিতে। পেটটা একটু ফোলা ফোলা লাগছে। নেমে গিয়েই মালটা ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে ফেলবে।

বিশু এসে যথারীতি খুঁজে টুজে না পেয়ে তার পুরনো উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করল, নাই।

নাই যে সেটা দীপের চেয়ে ভাল আর কে কানে?

পিসিকে বলতে পিসি ভাবল একটু, তারপর বলল, ওই ঘরেই পড়েছিল ঠিক জানিস?

এবারে দীপই যেন ভাবনায় পড়ল,—তা অবশ্য ঠিক। ফিরে গিয়ে খেয়াল পড়েছে একটা দুল নেই। হতে পারে অন্য কোথাও হারিয়েছে, হয়ত রাস্তাতেই। ভাল করে জিজ্ঞেস করব।

—জিজ্ঞেস করতে হবে না, পিসির গলা এবার যথেষ্ট গম্ভীর, —ওর যখন মনে হয়েছে জিনিসটা এখানেই হারিয়েছে, ওটা খুঁজে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। পরের বার মনে করে অন্য দুলটা নিয়ে আসিস। স্যাকরাকে বলে রাখব। দু'খানা দুল নিয়ে যাবি, ও বুঝতে পারবে না।

দীপ বুঝতে না পেরে পিসির দিকে তাকিয়ে থাকল।

পিসি দূরের দিকে চোখ রেখে বলল, কেউ এ বাড়িতে এসে সোনা ফেলে রেখে গেছে এমন কখনও হয়নি। সোনা আমরা নিই না, দিই। ওকে একখানা দুল গড়িয়ে দেব আমি, অমনিই। কিছু বলার দরকার নেই।

দীপের মনে হয় পিসি, হ্যাঁ পিসিই এই বাড়ি-জমি-পুকুর-বাগান মিলিয়ে যে এখনও অবশিষ্ট রাজত্ব তার শেষতম রাজা।

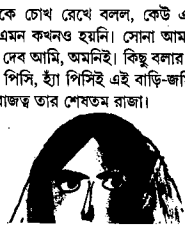

বেশ গরম পড়ে গিয়েছে, হেলমেটের মধ্যে মাথাটা সেদ্ধ হচ্ছে। ছায়া দেখে স্কুটারটা দাঁড় করাল দীপ। ইদানীং দু'য়েকটা চুরির কেস হচ্ছে এ দিকে। গোটা স্কুটার বা মোটরসাইকেল চুরি হয়নি, কিন্তু সিট খুলে নিয়ে গেছে এক কাস্টমারের। ক্যালি আছে। ওইটুকু সময়ের মধ্যে কাজ হাসিল করা চাট্টিখানি কথা নয়। ওই ঘটনার পর থেকে স্কুটারটা চোখের আড়ালে রাখে না আর। এমন জায়গায় রাখে যাতে ভেতর থেকেই তাকালে দেখতে পাওয়া যায়। একটাই অসুবিধে, কম্পিউটার ঘরটা পেছন দিকে, আর এসি বলে দরজা-জানলা সব বন্ধ। মাঝে মাঝে উঠে বাইরে আসতে হয় সেজন্য।

ব্রত আরও আগে এসেছে। জামাটা খুলে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রেখেছে। ফ্যান চালিয়ে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে পা দু'টো টান করে দিয়েছে সামনে। সান্যাল সাহেব এখনও আসেননি। এলে চাবি নিয়ে কম্পিউটার ঘরে ঢুকে এসি অন করে দিত। পাশের চেয়ার টেনে জামার ওপরের বোতাম দুটো খুলে হেলমেটটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে দীপ বলল, হঠাৎ কেমন গরম পড়ে গেল দেখলি?

ব্রত জবাব না দিয়ে চোখ বন্ধ করে রইল। ওর ফর্সা মুখটা লাল হয়ে আছে। মাথার চুলগুলো ভিজে লেপটে আছে কপালের ওপর। কানের পাশ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে নামছে। বয়েসে বছর তিন-চারের বড় হলেও তুইয়ের সম্পর্ক। দীপের হঠাৎই মনে হল, যতটা গরম ব্রত যেন তার চেয়েও বেশি ঘামছে।

—কীরে শরীর-টরীর খারাপ নাকি?

এবারে ব্রত চোখ খুলল, —শরীরের আর দোষ কী বল? ছেলেটার দুদিন জ্বর, কাল সারারাত ওর মা জেগে জেগে জলপট্টি দিয়েছে। আমিই বা ঘুমোই কী করে। একটুখানি ঘুম আসে আর উঠে কপালে হাত দিই।... ভাল আছিস তুই, বিয়ে-থা করিসনি। ছেলেপুলে হয়নি, নির্ঝঞ্ঝাটে আছিস। হোক, তখন বুঝবি ঠেলা।

জ্বর কমেনি? যতটুকু উদ্বেগ গলায় ঢাললে ব্রতর ভাল লাগবে ততটুকুই এনে ফেলল দীপ।

—কমেছে। আজ রেমিশন হয়েছে, সকালে দেখে বেরিয়েছি।

বটাদা দরজা ঠেলে ঢুকল। সান্যাল সাহেব এসে গেছেন। বটাদার লেটই হয়েছে বলতে গেলে। বাইরে কাস্টমাররা ভিড় করতে শুরু করেছে। জগদীশ এতক্ষণ মেঝে পরিষ্কার করছিল। একবার বাইরে উঁকি মেরে ঘড়িতে চোখ বোলাল। পাঁচ মিনিট বাকি আছে, তার পরেই গেটের তালা খুলবে।

—এদেশের কিস্যু হবে না। চেয়ার ঝেড়ে বসতে বসতে বটাদা কথাগুলো ওদের দিকে ভাসিয়ে দিল।

মানসও ঢুকেছে এতক্ষণে, —আপনিও আটকেছিলেন?

—আটকাব না? শুয়োরের বাচ্চারা অনর্থক আধঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখে দিল! ইচ্ছে করছিল, আমিই নেমে দু'চারঘা দিয়ে আসি।

ঘটনাটা কী হয়েছিল ঠিক? আমি যখন পৌঁছেছি তখন অবরোধ শুরু হয়ে গেছে।

—ও তাহলে আসল জায়গাটাই তো মিস করে গেছ। সার্জেন্টটা আমাদের সামনে সামনেই আসছিল। সামনের মিনিবাসটা অনেকক্ষণ থেকেই রংবাজি করছিল। কাউকে সাইড দেবে না, প্যাসেঞ্জার তুলবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে। তাও যদি ঠিকমতো চালাতি তো কথা ছিল। গাড়ি চালাচ্ছে যেন গেদে লোকাল। সুভাষনগরের মোড়ে পেছন থেকে একটা মারুতি বাঁদিক দিয়ে ওভারটেক করতে গেছে, মিনিটাও ইচ্ছে করে বাঁদিকে চেপে এল, ফুটবোর্ডে ঝুলছিল একটা ছেলে, এক চুলের জন্য বেঁচে গেল। সার্জেন্ট লক্ষ করছিল। মিনিবাস পেরিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারকে টেনে নামিয়েই এক ঝাপ্পড়। শালা ওই তো চেহারা, এক চড়েই নেতিয়ে পড়ল রাস্তায়।

—তারপর?

—হয়ে গেল। পঞ্চাশটা মিনি দাঁড়িয়ে গেল রাস্তায়। আইন আইনের পথে চলবে, তার বদলে গায়ে হাত? ততক্ষণে ধুলো ঝেড়ে আসল লোক গাড়ি চালিয়ে হাওয়া। ভাল মানুষ সার্জেন্ট সমবেত মিনিবাস ড্রাইভারের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে তবে রক্ষা।... এই করতে গিয়ে আধঘন্টা সময় গলে জল হয়ে গেল।

—মিলিট্যান্ট ট্রেডইউনিয়ন দাদা, এই করে করেই রাজ্যটা গেল। আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই। চোর-জোচ্চোর-গুণ্ডা-বদমাশকেও আপনি কিছু বলতে পারবেন না। উল্টে পুলিশকেই বেইজ্জত হতে হবে।

—আমাদেরটাই বা বাদ দিচ্ছ কেন? দেখছ না ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের কী অবস্থা? লোকে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টটার ওপরই এমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে, জেনুইন ডিমান্ড নিয়ে আন্দোলন করলেও লোকে নাক সিঁটকোয়,— ওই যে আবার সব অচল করতে নেমেছে।

দেরি হয়ে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে খবর এসেছে দু'বার। বাইরেও কাস্টমাররা চেঁচামেচি শুরু করেছে। জগদীশ দরজা খুলছে দেখে দীপ ভেতরে গেল।

কাজে ডুবে গিয়েছিল। আধঘন্টা কি কিছু বেশিই হবে, হঠাৎ দরজা ঠেলে ব্রত ঢুকল।

—গরমটা কিছুতেই কাটছে না, তোর ঘরে একটু ঠাণ্ডা হতে এলাম।

ব্রতটা মাঝে মাঝে এমনি পাগলামি করে। দীপ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, তোর সিটে কেউ...

—আছে, সুব্রতকে বসিয়ে এসেছি। হ্যাঁরে, তোদের গরম লাগছে না?

লাগছে, কিন্তু সেরকম কিছু নয়। বলার আগেই ব্রত মাটিতে বসে পড়ল।

ঘাবড়ে গেল দীপ। চেয়ার ছেড়ে ঝুঁকে এল ব্রতর দিকে, —কিরে, শরীর খারাপ লাগছে?

ব্রত কিছুই না বলে চোখ বুঁজল। হঠাৎই দীপ আবিষ্কার করল, ব্রতর মুখের একটা পাশ বেঁকে যাচ্ছে। তার পরেই সারাটা শরীরে ঝাঁকুনি লাগল। ব্রত কী যেন বলতে গেল। ডান হাতটা তুলল অল্প। হাতটা পুরো উঠল না। এলিয়ে পড়ল পাশে।

—ব্রত! চুল ধরে ঝাঁকাল দীপ।

ব্রত চোখ খুলতে পারছে না।

ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল দীপ, —বটাদা, মানস! অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার। ব্রত কীরকম করছে। জগদীশ, শিগগিরি জল।

দীপের পেছন পেছন বটাদা, মানস, জগদীশ ঢুকল ঘরে। এককালে খেলাধুলো করত, এ ডিভিশনেও খেলেছে, লম্বা শরীরটা মাটিতে পড়ে রয়েছে সোজা হয়ে, ঘাড়টা ডান দিকে কাত, কষ বেয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। দীপ তাড়াতাড়ি মাটিতে বসে মাথাটা তুলে ধরল, জগদীশ একটু একটু করে জল খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। মানস মগ থেকে জল তুলে ব্রতর মুখে ছিটিয়ে ডাকতে লাগল, ব্রত, ব্রত, চোখ খোল, কথা বল।

বটাদারই আগে খেয়াল হল। ছুটে বেরল বাইরে। দীপ শুনতে পাচ্ছে, কাস্টমারদের মধ্যে কেউ ডাক্তার আছেন কি না জিজ্ঞেস করছে বটাদা। সান্যাল সাহেব বেরিয়ে এসেছেন, আবার বটাদাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন, ফোন করতেই নিশ্চয়।

কখনও কখনও মনে হয় সময় থেমে গেছে। ব্রতর মাথাটা কোলে নিয়ে যতটুকু সময় বসে ছিল, পরে মনে হল তার চেয়ে দীর্ঘ সময় দীপের জীবনে আর আসেনি।

ডাক্তার আর অ্যাম্বুলেন্স একই সঙ্গে পৌঁছল। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন সান্যাল। ব্রতকে একবার চোখ দিয়ে জরিপ করে হাতটা তুলে নিলেন ডাক্তার পরক্ষণেই নামিয়ে রাখলেন, —সেরিব্রাল মনে হচ্ছে, এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যান, দেরি করা ঠিক হবে না।

বটাদা পেছন পেছনই আসছিল স্ট্রেচার ঘাড়ে করে। মানস দীপ আর বটাদা তিনজন মিলে ব্রতর ভারি চেহারাটা স্ট্রেচারে তুলল। জগদীশ আর অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার দু'জনে মিলে স্ট্রেচারটা গাড়িতে ওঠাল। সান্যাল সাহেব গাড়ির দরজা অবধি এলেন, —আপনারা চলে যান, এদিকের জন্য ভাববেন না, আমরা ম্যানেজ করে নিচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরাও হাসপাতালে যাচ্ছি। দেশবন্ধু ত?

দীপরা ঠাট্টা করত, যার নেই কোনও বন্ধু, সে যায় দেশবন্ধু। আজ সেই হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে ব্রতকে একটা কাঠের বেঞ্চে শুইয়ে দীপের মনে হল এরা সকাল-সন্ধে কত মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছে। ওই তো সাদা অ্যাপ্রন পরা ডাক্তারবাবু একটা বাচ্চার মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে গাল টিপে আদর করে দিলেন। বাবা-মার হাত ধরে বাচ্চাটা ফিরে যাচ্ছে বাড়ি।

বটাদার পেছন পেছন ডাক্তারবাবু এলেন। ব্রতর মাথাটা বেঞ্চের বাইরে ঝুলে পড়েছিল। মাথার পেছনে হাত দিয়ে তুলে চোখে আলো ফেললেন, ভেতরে তুলো লাগিয়ে পরীক্ষা করলেন, বুকে স্টেথো বসিয়ে নিবিষ্ট হয়ে কী খোঁজার চেষ্টা করলেন। তারপর ওদের ফেলে রেখে আবার কাউন্টারে চলে গেলেন। কোনও কথাই বললেন না।

বটাদা আর মানস দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। দীপই কথা বলল, ডাক্তারবাবু যে কোনও ওষুধপত্র দিলেন না। দেরি করলে তো বিপদ হয়ে যাবে। একটু খোঁজ নিলে হত না?

বটাদা বলল, যা, তুইই জিজ্ঞেস করে আয়।

দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে দীপই গেল ভেতরে। কাঁচের ঘরের ভেতর ডাক্তারবাবু আর একজনের মাথায় ব্যান্ডেজ করছিলেন। দীপ গিয়ে দাঁড়াতে মুখ তুললেন, বলুন।

—ওই যে দেখে এলেন, আমাদের কলিগ। সেরিব্রাল?

—হতে পারে। প্রেশারটেশার ছিল?

—জানি না, বলেনি কখনও।

—কতক্ষণ হয়েছে?

মনে মনে হিসাব করল দীপ, তা আধঘন্টাটাক তো হবেই।

ডাক্তারবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, বেশিক্ষণ কষ্ট পাননি। অ্যাটাকটা হবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই মারা গেছেন।

কথাটা দীপের ভেতর অবধি পৌঁছতে যেন সময় নিচ্ছিল। ব্রত, ওই যে কাঠের বেঞ্চে শুয়ে আছে, পাশে দাঁড়িয়ে মানস আর বটাদা, খানিকক্ষণ আগেই দীপের কাছে বসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলছিল, বড্ড গরম আজ নারে, সেই ব্রতর লম্বা শরীরটায় আর ব্রত নেই? ভাল ফুটবল খেলত, প্রিয়ার না এরিয়ালের হয়েও খেলেছিল, মস্ত চেহারাটায় প্রাণ যেন আঁটত না, সব সময় ছটফট করত, সেই ব্রত...। দুঃখ পেতেও ভুলে যাচ্ছিল দীপ।

ডাক্তারবাবুর কথাগুলো কানে ঢুকিয়ে, তখনও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমানায় দাঁড়িয়ে দীপ, ব্রত যেখানে শুয়ে আছে সেইখানে এসে বলল, ডাক্তার কীসব বলছে বটাদা?

—তুই বুঝতে পারিসনি? আমরা তো...

এবারে সত্যিই অবাক হয়ে গেল দীপ। মনে হল জেনেশুনেও ওরা কেন পাঠাল দীপকে? সরকারিভাবে খবরটা জেনে আসতে? যাতে ব্রতর পাংশু কপালে মৃত্যুর সিলমোহরটা দীপই মেরে দিতে পারে? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মানুষ কি এতখানি হৃদয়হীন হতে পারে?

বাড়িতে একটা খবর ত দিতে হয় এবার? মানস বলল। মৃত্যু তার সমস্ত স্বাভাবিকতা নিয়ে উঠে আসছে এতক্ষণে।

—খবর দিবি? শুনেছি তো ভাইটাই কেউ নেই। বউ আর একটা বাচ্চা। বুড়ো বাবা-মা থাকতে পারে। খবর দিলে বরং অনর্থ হবে। তার চেয়ে একেবারে বডি নিয়ে পৌঁছে যাওয়াই ভাল।

মানস ঘাড় নাড়ল, তা ঠিক। চলো, তাহলে কাগজপত্র কীসব লাগবে নিয়ে যাই।

মানস আর বটাদা দীপকে ফেলে রেখে কাঁচের ঘরের দিকে চলে গেল। দীপের হঠাৎই মনে হল ব্রতর ফেলে যাওয়া শরীরটার পাশে সে যেন ভীষণ একা। ঘাড়টা পেছনে হেলে রয়েছে, চোখ দু'টো আধখোলা, জিভের ডগাটা ঠোঁট আর দাঁতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ডান হাতটা বেঞ্চের বাইরে ঝুলছে, ডান পা-টাও ভাঁজ করা। বাঁ হাতের মুঠিতে যেন জীবনকে আঁকড়ে রাখার শেষ চেষ্টাটুকু ধরা। এতক্ষণে দীপের মনে হল ব্রত আর কখনও চোখ খুলে লাফিয়ে উঠে বলে উঠবে না, শারজায় ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল, একটু আগে কেটে পড়ব, ম্যানেজ করে দিস।

বটাদারা ফিরে এল। কপালে দু' ভাঁজ চিন্তা, সকালের ডাক্তারটা কেটে পড়েছে। দুপুরের জন এসে নাকি ডেথসার্টিফিকেট দেবে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

বলতে বলতেই ওরা দেখল সান্যালসাহেব আরও দু'-চারজন এসে হাজির হয়েছে।

—কী ব্যাপার? কেমন আছে? অ্যাডমিশন হয়েছে? প্রশ্ন করতে করতেই এগিয়ে আসছিল। ওরা, ঘরের মাঝবরাবর এসেই থেমে গেল। ব্রতর দিকে চোখ পড়তেই সব উত্তর পেয়ে গেল যেন। এবং ওরা, ওদের মুখচোখ। দাঁড়িয়ে থাকা।

এক মিনিট বাধ্যতামূলক নীরবতা। প্রশ্নটা পাল্টে গেল এবার— কখন হল? কতক্ষণ?

—পৌঁছনোর আগেই। এখানে এসে শোয়ানোর সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম। ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। দীপ গিয়েছিল, ওকে বলে দিয়েছেন।

—কী হয়েছিল কিছু জানা গেছে?

সবাই দীপের দিকেই তাকিয়ে আছে। জবাবটা দীপকেই দিতে হবে।

—সেরিব্রাল। খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। আনার আগেই। ডাক্তার সে রকমই বললেন।

সান্যাল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। বটাদা এবার দরকারি কথাটা মনে করিয়ে দিল। ডেথ সার্টিফিকেট এখনও দেয়নি। সকালের শিফটের ডাক্তার চলে গেছে। কাগজপত্র নাকি দুপুরের জন দেবে। এ দিকে তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারটাও এবার ঝামেলা পাকাবে।

সান্যাল গেলেন কাচের ঘরের ওদিকে। বটাদাও সঙ্গে গেল।

পা ব্যথা করছিল দীপের। মাথার ভেতরটা ফাঁকা লাগছিল। আসলে ব্রতর কাছ থেকে সরে যেতে চাইছিল ও। একপাশে একটা খালি টুল রাখা ছিল। সেখানেই গিয়ে বসল। মানস তাকাল দীপের দিকে। বাঃ, বেশ ভাল ম্যানেজ করলি তো, আমি যে কেন দেখতে পাইনি— চোখ দিয়ে দীপকে বলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে পা বদলাল মানস।

এবারে হন্তদন্ত হয়ে ফিরলেন বটাদা,— সর্বনাশ হয়েছে। বলছে ব্রট ডেড, পোস্টমর্টেম না করে বডি দেবে না।

—তার মানে? একসঙ্গে দু'-তিনটে গলা শোনা গেল।

—ওদের বক্তব্য, কী কারণে মারা গেছে না জানলে ডেথ সার্টিফিকেট দেবে কী করে?

—এই যে বলল সেরিব্রাল? দীপ জিজ্ঞেস করল।

বটাদা বলল, প্রেশার বেশি ছিল...দেবে না।

—তার মানে পোস্টমর্টেম? ব্রতকে কাটাছেঁড়া করবে ওরা? মগের মুলুক নাকি? দেশে আইনকানুন নেই? দীপ এবার নিজের গলায় নিজেই চমকে উঠল। যেন ব্রতকে এরাই মেরেছে। এখুনি ডেথসার্টিফিকেট না দিলে প্রত্যেকের ফাঁসির বন্দোবস্ত না করে দীপের যাওয়া নেই।

—আইনের কথাই বলছে এরা, বটাদা ঠাণ্ডা গলায় বলল। এমনও তো হতে পারে, আমরাই ওকে খাইয়ে খুন করে হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে এনে ফেলেছি। তার পর একটা নর্মাল ডেথ-এর সার্টিফিকেট বাগিয়ে কোনও ঘাটে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললাম। পরে আত্মীয়স্বজন এসে ডাক্তারকে ধরেই টানাটানি শুরু করল। সবাই নিজেকে আগে বাঁচাতে চায় রে!

—আমরা সবাই ডিগনিফায়েড পার্সন, ব্যাঙ্কে চাকরি করি। সান্যাল সায়েব একজন ম্যানেজার। ওনার পরিচয়েও হবে না? মানস জিজ্ঞেস করল।

—উনি সেই চেষ্টাই করছেন। দেখা যাক।

বলতে বলতেই সান্যাল ফিরলেন।

—হল না। কী করা যায় বলুন তো?

বটাদা একটু ভেবে বলল, যে ডাক্তারবাবুকে আমরা ব্যাঙ্কে ডেকেছিলাম তাঁর কাছেই নিয়ে গেলে হয় না?

মানস খেঁকিয়ে উঠল, চান্স নেই। মনে নেই, কেমন নিয়ে যান নিয়ে যান, এখখুনি হাসপাতালে নিয়ে যান বলে সাততাড়াতাড়ি কেটে পড়ল। ও শালা ডেথ সার্টিফিকেট দেবে না।

সান্যাল বললেন, তার চেয়ে আমার মনে হয় ওকে ওর বাড়ি নিয়ে যাওয়াই ভাল। পাড়ায় কোনও না কোনও সহৃদয় ডাক্তার থাকবেনই। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। পাড়ার লোকজনও কিছু একটা ব্যবস্থা করবে।

কথাটা সকলের মনে ধরল। কিন্তু বিপদ বাধালো অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার। সাফ সাফ বলে দিল, পাগল হয়েছেন? অ্যাম্বুলেন্সে রোগী নিয়ে যাই আমরা। আপনি বললেই ডেডবডি নিয়ে যাব? যদি জানাজানি হয়ে যায়? হাসপাতালের গেটে ম্যাটাডোর ভাড়া পাওয়া যায়, ম্যাটাডোর দেখুন। আমাকে ছেড়ে দিন।

সান্যাল অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া মিটিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, বটাদা আটকাল, চলুন, আগে ম্যাটাডোরের লোকের সঙ্গে কথা বলে আসি। আয় দীপ।

দীপ যেন বেঁচে গেল। বাইরে বেরিয়ে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দু'টো ম্যাটাডোর দাঁড় করানো ছিল। খাটিয়াও বাঁধা আছে একপাশে। ফুলটুল। পরিপাটি ব্যবস্থায় চিত হয়ে খাটিয়ায় শুয়ে চোখ বুঁজে ফেললেই অর্ডর মতো ডেলিভারি দিয়ে দেবে।

বটাদা ম্যাটাডোরের ড্রাইভারকে খুব ঘরোয়াভাবে বলল। আমাদের এক বন্ধু, একই অফিসে কাজ করি, হঠাৎ মারা গেছে। ওর বডিটা আপনাদের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবে?

ড্রাইভার প্রায় স্টার্ট দেয় আর কি, হ্যাঁ সার, কেন যাবে না? কত দূর? পাঁচটাকা কিলোমিটার। আপডাউন ভাড়া দিতে হবে। আর মড়াখাঁটা কাজ তো! পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা। কাগজপত্র পেয়ে গেছেন?

—সেটাই তো সমস্যা! ডেথ সার্টিফিকেট দিতে চাইছে না। ভাবছি বডিটা ওর বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফেললে লোকাল কোনও ডাক্তারকে দিয়ে...

বাইরে দাঁড়িয়েছিল, শুনেই গাড়িতে উঠে পড়েছে ড্রাইভার।

—কী হল?

—হবে না স্যার। পুলিশ ধরবে। কাগজ ছাড়া ডেডবডি গাঁজা-চরসের চেয়েও ডেনজারাস। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। অন্য কাউকে দেখুন।

অন্য ম্যাটাডোরের ড্রাইভারটাও শুনছিল। আগেভাগেই ঘাড় নেড়ে দিল, —অসম্ভব, কাগজ ছাড়া যেতে পারব না।

দীপের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সান্যালও ঘাবড়ে গেছেন। বটাদাই বুদ্ধি দিল। কোনও উপায় নেই দাদা, ওই অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারই ভরসা। ওকে বেশি কবুল করুন। বাঁচালে ও-ই বাঁচাবে।

তাই হল। দু'টো পাঁচশ টাকার নোট পকেট বদল হতেই মরা ব্রত জ্যান্ত হয়ে গেল। চুপচাপ অ্যাম্বুলেন্সে তুলে স্টার্ট দিল ড্রাইভার। সঙ্গে গেল মানস আর বটাদা। পেছনে ভাড়া করা ট্যাক্সিতে সান্যালের সঙ্গে উঠল দীপ।

দীপের হঠাৎই মনে হল, পাশপোর্ট-রেশন কার্ড-ভোটার আইডেনটিটি কার্ডের মতো জীবিত প্রত্যেক মানুষের একটা ডেথ সার্টিফিকেটও বুক পকেটে নিয়ে ঘোরা উচিত।

কিসের যেন মিছিল বেরিয়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখারও চেষ্টা করে না মিছিলটা কী বা কেন। মিছিলের প্রাত্যহিকতা এবং অর্থহীনতা সম্বন্ধে মানুষ এতটাই উদাসীন। তাও রোজ মিছিল তৈরি হয়, রাস্তাঘাট, অ্যাম্বুলেন্স, পরীক্ষার্থী ও শবদেহকে দাঁড় করিয়ে রেখে। কারা মিছিলে সামিল হয়?

ভাবতে ভাবতেই অ্যাম্বুলেন্স আবার চলতে শুরু করল। পেছন পেছন দীপদের গাড়িটাও।

লেভেলক্রসিং পার হয়ে অ্যাম্বুলেন্স স্লো হল। একবারই থেমেছিল ওরা। সকলেই বাড়িতে ফোন করল, ফিরতে দেরি হবে। দীপের এমনিই বাড়ি ফিরতে কোনও কোনও দিন রাত দশটা হয়ে যায়। তার চেয়েও দেরি হলে তখন ফোন করে দেবে।

বটাদা বলল, কিছু ফুল কিনে নেওয়া দরকার। ঘণ্টা চারেক হতে চলল। এবারে গন্ধ ছড়াবে।

ফুলের দোকানও পাওয়া গেল একটু দূরেই। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার বলে দিল,। ডেডবডি নিয়ে যাচ্ছেন বলবেন না যেন। হাসপাতালের সামনে ও-ই ফুল কিনতে বারণ করেছিল।

একগুচ্ছ রজনীগন্ধার স্টিক কিনল বটাদা। দোকানদার অবাক হয়ে দেখল, চারজন মানুষ অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে বিয়ের নেমন্তন্ন অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছে।

মানস আগে একবার এসেছিল। আবছা মনে আছে। সেই স্মৃতি থেকে মানস বলেছিল, লেভেল ক্রসিং পার হয়ে একটা খেলার মাঠ। লোকে বলে গদার মাঠ। সেখান থেকে হেঁটে দু' মিনিট।

জিজ্ঞেস করতেই গদার মাঠ দেখিয়ে দিল পায়ে-চলা মানুষ। ছায়ারা লম্বা হয়েছে, বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের মতো উত্তাপ, দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের হাওয়া ঘরবাড়ির ফাঁক গলে মুখু বাড়াচ্ছে।

গদার মাঠে ফুটবল নেমেছে। গোলপোস্ট-নেট-রেফারি- বাঁশি সবই আছে। মাঠটা যথেষ্ট বড়। যেটুকু জায়গায় ফুটবল খেলা হচ্ছে তার পাশেও বেশ খানিকটা ফাঁকা। সেখানে গাছের ছায়ায় এলাকা-বিভাজন। কুচোকাচা, বৃদ্ধ ও মহিলারা যথাক্রমে তেন্তুলকর, তহেলকা ও শাহরুখ খানে ডিমারকেশন করে নিয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সটা একটু দূরে দাঁড় করিয়ে ট্যাক্সি থেকে দীপরা নামল।

সান্যাল বড় অশ্বত্থ গাছটার দিকে এগিয়ে গেলেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারদের গড় বয়েস সত্তর।

আট জোড়া চোখ দীপদের মাপছিল। কাছাকাছি পৌঁছতেই ওদিক থেকে প্রশ্ন উড়ে এল, কাউকে খুঁজছেন?

—হ্যাঁ, ব্রত ভট্টাচার্য, ব্যাঙ্কে কাজ করে...

—বারীনবাবু!

বৃদ্ধ পেছন দিকে বসেছিলেন। ওরা খেয়াল করেনি। ছিপছিপে কিন্তু টানটান চেহারা। লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবি, চশমা, মাথাভর্তি সাদা চুল। লাঠি ও টাক নেই। সোজা উঠে এলেন। চশমার পেছনে উদ্বেগ।

—বলুন, আমি ব্রতর বাবা।

এইভাবে? মুখোমুখি? সত্য কখনও কখনও গলায় আটকে যায়। দীপ মুখ ঘুরিয়ে নিল। সান্যালই এগিয়ে গেলেন।

—আসুন, আমরা ওইখানে একটু বসি। সান্যাল বারীন ভট্টাচার্যর পিঠে হাত রেখে এগিয়ে যেতে গেলেন।

বারীন ঘুরে দাঁড়ালেন, —কোথাও যেতে হবে না। বলুন, যা বলার এখানেই বলুন।

অশ্বত্থ-অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা একে একে বারীনকে ঘিরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। একটা জারুল গাছের পাশে দাঁড়িয়েছিল ওরা। সবুজপাতার ফাঁকে বেগুনি থোকা থোকা ফুল ঝুলে রয়েছে। ওপরে গাঢ় নীল আকাশ। সামনেই লাল-হলুদ জার্সি এবং সবুজ ঘাসের ওপর একটা ঝকঝকে সাদা বল। রং-বেরং-এর জামা পরে বাচ্চাগুলো হই হই করে ছুটে বেড়াচ্ছে। চারদিকে রং-এর রোশনাই। সাদা অ্যাম্বুলেন্সটা ঘাপটি মেরে আছে খেলার মাঠের ওই ধারে।

সেই দিকে তাকিয়ে সান্যাল বললেন, আমরা ব্রতর কলিগ, একই ব্রাঞ্চে কাজ করি। একটা খারাপ খবর আছে। ব্রত,... মানে আজ দুপুরেই অফিসে অসুস্থ হয়ে পড়ে,... সেরিব্রাল। আমরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু করার ছিল না।

ঘামছেন সান্যাল। কথাগুলো বলে ফেলে যেন দায়মুক্ত হয়েছেন। তাকিয়ে আছেন বারীন। হাত বাড়িয়ে কিছু ধরার চেষ্টা করলেন। জারুল গাছটা ধরে সামলালেন। দাঁড়াতে পারছেন না। বসে পড়লেন। চশমা খুললেন চোখ থেকে।

দাঁড়িয়েছিল সকলে। কেউই কথা বলছিল না। সান্যালই কথা বললেন আগে, —আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনি আসুন।

মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ, না, আমি আগে যাই। আপনারা পরে আসুন, পেছনে। ...দাদুভাই, ঋজু! কোথায় তুমি? চলে, আজ আর খেলা হবে না।

ঋজু ছুটে এসে দাদুর হাত ধরল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, রং ব্রতর মতো নয়। ঘেমে গিয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এখনও তো অন্ধকার হয়নি দাদু?

বারীন শক্ত করে ঋজুর হাত ধরে বললেন, হয়েছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না।

তার পর সেই দীর্ঘপথ বৃদ্ধ তাঁর নাতির হাত শক্ত মুঠোয় ধরে ফিরে চললেন বাড়ি। দূরত্ব রেখে হেঁটে চলল দীপ সান্যাল ও অন্যরা। আরও পিছনে ব্রতকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স।

বটাদা কখন অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে এসেছে খেয়াল করেনি দীপ। কানে কানে বলল, ম্যানেজ হয়ে গেছে। চিন্তা নেই। ক্লাবের ছেলেদের বললাম। ওরা বলল, পাড়ার ডাক্তার সর্বাধিকারী তার নামই নাকি সার্টিফিকেট সর্বাধিকারী। অসুখ-বিসুখ-জন্ম-মৃত্যু, সমস্ত সার্টিফিকেট রেডি। মূল্য ধরে দিলেই পাওয়া যায়। ছেলেরা একেবারে সার্টিফিকেট নিয়েই আসবে। আর দাহটাহর ব্যাপারেও আমাদের কিছু করতে হবে না। ওদের একটা স্ট্যান্ডবাই টিম আছে। টাকা-পয়সা দিলে ওরাই সব করে দেয়। সান্যালদা কত টাকা এনেছ কিছু জানিস?

দীপ শুনছিল, আবার শুনছিলও না। বটাদা তুমি বলে, আবার আদর করে তুইও বলে অনেকসময়। যখন বেশ কাছের ভাবে। বটাদাকেও কি খুব কাছের মানুষ ভাবতে পারে দীপ?

এলোমেলো ভাবতে ভাবতেই কখন যেন ওরা এসে দাঁড়িয়েছে একটা একতলা বাড়ির সামনে। বাড়িটা যেন এখনও তৈরি হচ্ছে। সিমেন্টের প্রলেপ লেগেছে। রং আসতে বাকি; ছাদে ওঠার সিঁড়িটা ন্যাড়া, ওপরে কোনও ল্যান্ডিং নেই; ছাদ থেকে মরচে পড়া রড বেরিয়ে আছে সামনে, যেন একটা ঝুল বারান্দা হতে গিয়েও থমকে আছে, স্টার্টারের গুলির শব্দ এখনও শোনা যায়নি।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। সামনের করবী গাছ, দেওয়ালের মাধবীলতা, কোথাও কোনও কাঁপন নেই। দীপ যেন আশা করেছিল, একটা কান্নার রোল ভেতর থেকে ভেসে আসবে, দীপরা দাঁড়িয়ে পড়বে, শোকের মুখোমুখি হতে না পেরে পিছিয়ে আসবে। তবে কি খবরটা পৌঁছয়নি? অথবা তীব্র শোক আরও কোনও দুর্যটনার জন্ম দিয়েছে?

বটাদাই আগে ঢুকল। দরজা খোলা ছিল। দরজা পেরিয়ে ছোট একটা উঠোন। তার পর বারান্দা। বারান্দায় বসে আছে তিনজন।

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে ঋজু। দু'জনকে দু'হাতে জড়িয়ে বারীন। ঋজু বসে আছে, খবরটা জেনেছেও নিশ্চয়, কিন্তু ওর দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে, এই সামান্য খবরের অসামান্যতা উপলব্ধি করার বোধ ওর হয়নি। অন্য দু'জনের চোখে কোনও দৃষ্টি নেই। এমনকী কান্নাও নেই।

দীপের মনে হল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটো গাছ। আকাশ কালো হয়ে ঝড় উঠেছে। গুম গুম করে ডেকে উঠেছে মেঘ। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে অপেক্ষা করছে। একা অথচ একা নয়।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে।

দীপুদা, তোমার বাবাকে ক্লাবে আটকে রেখেছে। কেস জন্ডিস। শিগগির যাও।

শিবমন্দিরের পাশে ধনার তেলেভাজার দোকান। দীপ স্কুটার চালিয়ে গলিতে ঢুকতে যাবে, ধনা সামনে এসে হাত দেখাল। দীপ গাড়ি থামিয়ে মাটিতে পা ঠেকিয়ে দাঁড়াল, নামল না। ধনা এদিক ওদিক দেখে কথাগুলো দীপের কানে গুঁজে দিয়েই তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকে গেল।

চড়া রোদ্দুর, বেলা বারোটা-টারোটা হবে, রাস্তাঘাট শুনশান, ধনার

দোকানেও এই সময় খদ্দের থাকে না তাই ধনা সাহস করে এগিয়েছিল। নইলে গবার ভয়ে ধনা দোকানেই সেঁটে থাকত।

গবার প্রতি একটা দুর্বলতা দীপের থেকেই গেছে। দীপের কেবলই মনে হয় গবা আজ যা তার জন্য দীপই দায়ী। সে দায় দীপ কখনওই অস্বীকার করতে পারবে না।

ইট পেতে ক্রিকেট খেলত ওরা। টিফিন পিরিয়ডে। আধঘন্টার টিফিন। শুক্রবার চল্লিশ মিনিট। ইস্কুল থেকে টিফিন দিত না। বাড়ি থেকে খাবার আনত এমন ছেলেও ছিল হাতে গোনা। টিফিনের ঘন্টা পড়ার পর মাঠে পৌঁছতে যে তিরিশ সেকেন্ড লাগত, সেটুকু ছাড়া একটা মুহূর্তও ওরা অপচয় করত না। গ্রীষ্মে ফুটবল, শীতে ক্রিকেট।

ব্যাট-উইকেট কেনার সামর্থ্য ছিল না। ইট সাজিয়ে উইকেট, গণেশের বাবা ছুতোর মিস্তিরি, ছাঁটের কাঠ জুড়ে একটা ব্যাটগোছের বানিয়ে দিয়েছিল। সেটা পেয়েই ওদের মনে হয়েছিল চাঁদ ছাড়া পেড়ে আনার মতো আর কিছু পড়ে রইল না। গণেশ, যার ডাকনাম গবা, স্বভাবতই ব্যাটের জোরে ক্যাপ্টেন হয়ে গেল। দীপের বাবা তখনও সত্যিকারের বাবা, অতএব একটা ক্যাম্বিস বলের টাকা জোগাড় করেছিল দীপই। অতএব দু'টো দল করে যখন খেলা হতো তখন দীপ আর গবা পড়ত দুই বিরুদ্ধ দলে।

সেদিন দীপরা ফিল্ডিং করছিল। ব্যাট করছিল গবা। দীপ দাঁড়িয়েছিল খুব কাছে। এখন বোঝে, জায়গাটা সিলি মিড-অফ বা সিলি পয়েন্ট। দীপ অত কাছে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করছিল বলে গবা হাত খুলে খেলতে পারছিল না, ব্যাট করছিল ভয়ে ভয়ে। বল করছিল সোনা। হঠাৎ কী হল, দীপ ভাল করে বোঝার আগেই গবার ব্যাট এসে লাগল দীপের নাকে। রক্তে সাদা শার্ট লাল হয়ে গেল। সবাই মিলে ধরাধরি করে দীপকে তুলে ক্লাশের বেঞ্চিতে শুইয়ে দিল। বরফ জোগাড় হল আইসক্রিমওলার বাক্স থেকে। রক্ত বন্ধ হতে হতে দুটো ক্লাশ পার।

হেডস্যার-এর ঘরে ডাক পড়ল পরদিন। গবা একপাশে দাঁড়িয়ে, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ লাল। এর মধ্যেই একপ্রস্থ পালিশ করা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। হেডস্যার-এর টেবিলে বিখ্যাত বাঁধানো লাঠিটা শোয়ানো। ঘরে ঢুকে দীপেরই হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল, গবার যে কী হচ্ছিল ও-ই জানে।

—বল, ও কি তোমাকে ইচ্ছে করে মেরেছে?

হেডস্যার-এর বড় বড় দুটো চোখ চশমার আড়ালে ঘোরাফেরা করছে, গম্ভীর গলা দীপের ভেতর অবধি যেন কাঁপিয়ে দিল। দীপ মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

একই প্রশ্ন আরও দু'বার করলেন হেডস্যার। দীপ আড়চোখে গবার দিকে তাকিয়ে দেখল, গবা তারই দিকে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে। দীপ জবাব দিল না।

—আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, যাও, বলে হেডস্যার দীপকে ক্লাশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন থেকে গবা ইস্কুলে আসা বন্ধ করে দিল। দীপরা শুনল, ওর বাবাকে ডেকে হেডস্যার নাকি টিসি ধরিয়ে দিয়েছেন।

টিসি মানে যে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট সেটা বুঝতেও লেগে গেল বেশ ক'টা বছর। ততদিনে দীপ বুঝতে পেরেছে দীপের সেদিনের নিরুত্তর থাকাই গবার ছাত্রজীবনে ছেদ টেনে দিয়েছিল। কারণ গবাকে তার ছুতোর মিস্ত্রি বাবা কোনও নতুন ইস্কুলে ভর্তি করায়নি। বদলে অ্যাপ্রেনটিস হিসেবে নিজের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল।

গবা কিন্তু ততদিনে অন্য কাজে অনেক বেশি হাত পাকিয়ে ফেলেছে। ভারতী সিনেমায় দুপুরের শোয়ে টিকিট ব্ল্যাক করত, সন্ধের দিকটায় রমনার মাঠে অন্ধকারে পুরিয়া বানাত, বেশি রাতে নেউলের ঠেকে বোমায় সুতলি জড়াত। দীপরা স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠল। গবাও বড় কাজে প্রোমোশন পেল। ইয়ার্ডে ওয়াগন খালি করা, রেললাইনের তার কাটা, রাতের ট্রেনে প্যাসেঞ্জারদের পকেট হালকা করাতেও ততদিনে হাত পাকিয়েছে গবা।

চাকরি করতে ঢুকল দীপ। গবা তখন গণেশবাবু। সুরেশ স্মৃতি সংঘের সেক্রেটারি। এলাকার সবক'টা মাল্টিস্টোরিডের প্রোমোটার। কুমার শানু থেকে সাতদিন ব্যাপী লাগাতার সাইকেলচালনা সব ফাংশনেরই প্রধান অতিথি। জনপ্রতিনিধিত্বের সবকটা যোগ্যতাই অর্জন করা হয়ে গেছে, এবারে দাঁড়িয়ে যাবার অপেক্ষা।

দীপের ভেতর থেকে চিন্তাটা কিন্তু যায়নি। গবার হয়ে ওঠার পেছনে দীপই তার কিছুক্ষণের স্তব্ধতাকে দায়ী ঠাউরে রেখেছে আজ পনেরো বছর। তাই নিজের বাবার নামে যে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে গবা, যার বাইরের ঠাটের আড়ালে চলে সমস্ত অসামাজিকতা, তার সরস্বতীপুজোতেও দীপ দু'শ' টাকা চাঁদা দেয়, ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

আওয়াজটা দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল। ভিড়। পেছনে গিয়ে দাঁড়াল দীপ।

—শালা, চোখে দ্যাখো না, না? গোপলা হেঁটে গেলে বলো, কে যাস, কেষ্টা? আর মনিকার মাথার ফিতে কাল বেগুনি ছিল, আজকে সোনালি হল কী করে সেই চিন্তায় তোমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেল, বুড়ো আলুবাজ! আজ তোমার রস আমি পাম্প করে বের করব।

গলাটা নিমাইয়ের, গবার ডানহাত। ক্লাবটা ও-ই চালায়। গবা একা সবদিক সামলাতে পারে না।

দীপ দেখল আর দেরি করা ঠিক হবে না। ভিড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল।

—এই যে দীপুদা, তুমি এসে গেছ, দেখে যাও তোমার বাবা কী করেছে। পাড়ার অবিভাবকদের অভিযোগ শুনে শুনে আমাদের কান ঝালাপালা। তুমিই বিহিত কর। তুমি শিক্ষিত ছেলে, গবাদার বন্ধু। তোমার মুখ চেয়েই...

"পাড়ার অবিভাবকদের" অভিভাবক নিমাই বলটা দীপের কোর্টে ছুঁড়ে দিয়ে বসে পড়ল। দীপ তাকিয়ে দেখল একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে বাবা বসে, মুখোমুখি পাড়ার দু'-তিনজন বয়স্ক মানুষ, একজন মহিলাও রয়েছেন।

দীপ তাকিয়ে আছে দেখে মহিলাই আগে মুখ খুললেন, ঘাটের মড়া, আজ বাদে কাল চিতায় উঠবে, এখনও রস গেল না? আমার মেয়ে চিত্রা, তাকে বলেছে, তোকে চুড়ো করে চুল বাঁধলে বড় সুন্দর দেখায় মা, এবার থেকে অমনি করেই বাঁধবি।

সুন্দর জ্যাঠা, সেটেলমেন্টে কাজ করতেন। বাবা এককালে দাদা দাদা করত, তিনিও হাজির হয়েছেন, দীপ দেখতে পায়নি।

—তুমিই বল বাবা দীপু, তোমার মতো ছেলে, অমন সচ্চরিত্র, এত চমৎকার ব্যবহার, অত বিনয়, তার বাবা, রোজ ইস্কুল ছুটির সময়ে রকে বসে থাকবে? আর কী অশ্লীল কথাবার্তা! মেয়েগুলোর ইস্কুল যাওয়াই বন্ধ হবার জোগাড়! উপায়ও তো নেই, রাস্তা যে ওই একটাই।

নিমাই আবার ঝামড়ে উঠল, অথচ জিজ্ঞেস কর, চোখে দ্যাখে না। আমাকে তিন হাত দূর থেকেও দেখতে পায় না, বলে, দীপু এলি নাকি, আমার নস্য এনেছিস? শালা কলির কেষ্ট, লীলা হচ্ছে? দেব এক ঝাপ্পড়...

দীপ দেখল এ যাত্রা আর কোনও উপায় নেই। গলা নামিয়ে বলল, বলুন কী করতে হবে?

নিমাই বলল, কথা আমাদের হয়ে গেছে। যাদের যাদের উনি অপমান করেছেন সকলের কাছে জোড় হাতে ক্ষমা চাইতে হবে। দোলের দিন সন্ধেবেলা, আমাদের বসন্ত সন্ধ্যার ফাংশন, সেদিনই, ফাংশনের আগে। আর ক্ষতিপূরণ, ক্লাবের ফান্ডে, এক হাজার টাকা।

—টাকাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? দীপ বলল।

—ওর কমে কোনও কথাই চলে না। নইলে ওই অবিভাবকরা যেমন বলছিলেন, থানা-পুলিশ, পার্টি, তখন আর ক্লাব কিন্তু...

—ঠিক আছে।

ভিড় সরিয়ে বাবা অবধি পৌঁছে গেল দীপ। টেনেহিঁচড়ে বের করে আনল। তার পর হাঁটতে থাকল বাবার পাশে পাশে।

স্কুটারটা দূরে স্ট্যান্ড করে রেখেছিল। বলা যায় না, উত্তেজিত জনতা ওটাতেই আগুন লাগিয়ে দিল হয়তো। দুপুরের গনগনে রোদে মাথা জ্বলে যাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে বাবাকে আড়চোখে দেখল। বাবার এখনও লাঠি লাগে না। সুন্দর পা মেপে মেপে হেঁটে চলেছে দীপের পাশাপাশি। মাথাটি নিচু। ওই পর্যন্তই। দেখলে কেউ বুঝতেও পারবে না একটু আগেও কতখানি অপবাদ ঘাড়ে করে বসেছিল মানুষটা।

এটাই প্রথম নয়। এরকম ছোটখাট ঘটনা আগেও হয়েছে। সকালে পারে না, বাজার করে বাথরুম টাথরুম সেরে বসতে বসতেই ইস্কুল বসে যায়। দীপদের বাড়ি থেকে একটু এগিয়েই কুমুদমঞ্জরী বালিকা বিদ্যালয়। তাই বিকেলটাকেই টার্গেট করে বাবা। দিনের কাগজখানা হাতে নিয়ে বাইরের রকে গিয়ে বসে। দেখতে থাকে। শুধু দেখলেও কথা ছিল। কমেন্ট পাস করে। অনেককে নামে চেনে। না চিনলেও অসুবিধে ছিল না। কাল কে কী পরে এসেছিল, কী পরলে তাকে সুন্দর দেখায়, কার কোন জায়গাটা সুন্দর সমস্ত বাবার মুখস্থ। দরকার মতো পরামর্শ দেয়। প্রথমদিকে সকলেই হালকাভাবে নিয়েছিল। বুড়োমানুষ, নাতনিদের সঙ্গে মস্করা করছে। বাড়তে বাড়তে এক সময় সহ্যের সীমা পার হয়ে গেল। দীপ জানত, যে কোনও দিন এরকম হবে। শেষ অবধি হয়ে গেল।

ভাবল, একবার জিজ্ঞেস করে। কেন কর বাবা? পরে মনে হল, বাবা কোনও জবাব দেবে না। তাছাড়া জবাব দেবার তো কিছু নেইও। দীপই বরং জবাবটা তৈরি করে নিতে পারে।

সিংহাসনে রাজা। হারেম বোঝাই সুন্দরী। কেউ দীর্ঘাঙ্গী কেউ খর্বাকৃতি, কেউ স্থূল কেউ বা ক্ষীণকটি, কেউ কৃষ্ণা কেউ বা দুগ্ধ ধবল, কেউ

সঙ্গীতনিপুণা কেউ কেউ বাক পটিয়সী। সব মিলিয়েই তো হারেম। বৈচিত্র্যেই রাজার সুখ। দেখে, শুনে, আলাপ করে। বৃদ্ধ নখদন্তহীন রাজা। তাতে রাজার রাজধর্ম যায় না। ইন্দ্রীয় তখন ভর করে দৃষ্টিতে, রসনায়, চন্দ্রকেতুগড় ধমনী-শিরা-রক্তবাহে শোনিতের মতো খেলা করে।

বাড়ি কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল ওরা।

দরজায় কড়া নাড়ার আগে বাবা ঘাড় ঘোরাল। দীপকে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিল। বলল, তোর মাকে কিছু বলিস না।

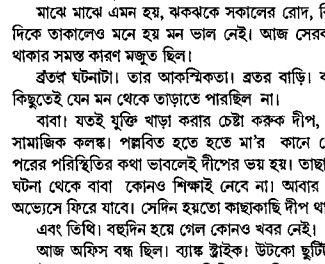

মনটা ভাল ছিল না।

মাঝে মাঝে এমন হয়, ঝকঝকে সকালের রোদ, কিংবা নীল আকাশের দিকে তাকালেও মনে হয় মন ভাল নেই। আজ সেরকম নয়, মন ভাল না থাকার সমস্ত কারণ মজুত ছিল।

ব্রতর ঘটনাটা। তার আকস্মিকতা। ব্রতর বাড়ি। বাবা-ছেলে এবং স্ত্রী। কিছুতেই যেন মন থেকে তাড়াতে পারছিল না।

বাবা। যতই যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করুক দীপ, ঘটনাটা এক ধরনের সামাজিক কলঙ্ক। পল্লবিত হতে হতে মা'র কানে পৌঁছবেই এক সময়। পরের পরিস্থিতির কথা ভাবলেই দীপের ভয় হয়। তাছাড়া দীপ নিশ্চিত, ওই ঘটনা থেকে বাবা কোনও শিক্ষাই নেবে না। আবার রকে বসবে। পুরনো অভ্যেসে ফিরে যাবে। সেদিন হয়তো কাছাকাছি দীপ থাকবে না।

এবং তিথি। বহুদিন হয়ে গেল কোনও খবর নেই।

আজ অফিস বন্ধ ছিল। ব্যাঙ্ক স্ট্রাইক। উটকো ছুটিটা দীপ ভাবল কাজে লাগাই। সকাল সকাল চলে গেল তিথিদের বাড়ি।

গিয়ে দেখল তিথির মা তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে ড্রয়িংরুমে জমিয়ে গল্প করছেন। এইসব পরিস্থিতিতে দীপ ঘাবড়ে যায়। একা থাকলে তবু তিথি ও দীপের সম্পর্কটা ভদ্রমহিলা স্বীকার করেন, দু-একটা কথাবার্তা বলেন। অন্য লোকজনের সামনে দীপকে দুধওয়ালা কিংবা রঙের মিস্ত্রির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন না।

—কী চাই? প্লাককরা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস রায়।

—তিথি, মানে ওর সঙ্গে একটু দরকার...

—তিথি নেই, সকালে বেরিয়ে গেছে।

বলে এমনভাবে বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তায় ডুবে গেলেন, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির দীপ যে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আর দেখতেই পেলেন না। মিনিট পাঁচ দাঁড়িয়ে থেকে 'আসছি' বলে দীপ চলে এল।

তিথিদের বাড়ি থেকে ফেরার রাস্তাতেই মোড়ের মাথায় খবরটা পেল। পেয়েই ক্লাবে দৌড়ল। বাবাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এল। ভেবে দেখতে গেলে গত চার-পাঁচদিনে মন ভাল হবার মতো একটাও খবর দীপের তৈরি হয়নি।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে আকাশের তারা গুনছিল, হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। চলে গিয়েছিল, গত মাসখানেক কলকাতার এই পুরনো বন্ধু আবার কলকাতায় ল্যান্ড করেছে, আর এসেই বন্ধুত্বটা ভালমতোন ঝালিয়ে নিচ্ছে। অন্ধকার হতেই, হঠাৎ দীপের ভেতর ঝলসে উঠল সেই চামড়া বাঁধানো "নিজের কথা"। এনেছে, কিন্তু হাজারটা ঝামেলায় প্রথম পাতার পর আর ওল্টানো হয়নি।

আলো আসতে আসতে পাড়াটা নিঃঝুম হয়ে গেল। বাবা-মাও ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে ডায়েরি খুলে বসল দীপ। কেমন একটা উত্তেজনা হচ্ছে, যেন নিষিদ্ধ কিছু। কৈশোরে বন্ধুদের হাতে হাতে ফেরা ছবির বইয়ের মতো। পাতা ওল্টালো দীপ।

বড় বড় গোটা গোটা অক্ষর, মাত্রা টেনে লেখা, কালো কালি। লক্ষ করার বিষয় যেটা কাটাকুটি বিশেষ নেই। যেন একটানা লিখে গেছে লেখক, যেন প্রতিটি শব্দের সঙ্গে মিশে আছে গভীর প্রত্যয়, যেন যা ভেবেছে এবং লিখেছে তা বদলানোর কোনও প্রয়োজন মনে করেনি। পড়তে শুরু করার আগে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইল দীপ।

"অনেক ভাবিয়া নিজেই নিজের কথা লিখিব ঠিক করিয়াছি। আর কাহাকেই বা শুনাইব। শুনিলেও আমার কথায় কেহ কান দিবে এমন ভরসা কম। তার চেয়ে আমিই লিখি, নিজেকেই শোনাই। তাহাতে কোনওদিকেই কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে। না লিখিয়া নিজেকে শুনাইয়া বলিলেও তো চলিত। তা একপ্রকার ঠিক, কিন্তু লিখিলে মনে হয় যেন আরো জোরের সঙ্গে বলা হইল। যেন মনের কথাটা লিখিয়া তাহাতে সরকারি শিলমোহর দেওয়া হইল। তাছাড়া লিখিলে অন্তরে শান্তি হয়, যে কথাগুলি ভিতরে গুমরাইয়া মরিতেছিল তাহাদের উগরাইয়া দিয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। এইসব নানাবিধ ভাবিয়া বাবামশাইয়ের কাছ হইতে পাওয়া ডাইরিতে নিজের কথা লিখিতে মনস্থ করিলাম।

লিখিব তো, কিন্তু কোথা হইতে শুরু করিব? সেইদিন, যেদিন বাবামশাই ডাকিয়া বলিলেন, কাল থেকে তোমার আর ইস্কুলে যাবার দরকার নেই? নাকি তারও আগে, যেদিন বিকেলবেলা ধাপ্‌সা খেলা শেষে বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম বাবামশাই সাজগোজ করিয়া ফিটনে চাপিয়া গায়ে গন্ধ মাখিয়া কোথায় যেন যাইতেছেন; জিজ্ঞেস করিলে মানদামাসি মুখে আঙুল ঠেকাইয়া চোখ গোল করিয়া বলিয়াছিল, চুপচুপ, জিজ্ঞেস করতে নেই। অথবা তারও চেয়েও আগে, যখন ভোরে উঠিয়া মাকে বিছানায় না দেখিয়া কাঁদিলাম, এবং পরে পুকুরধারে শান বাঁধানো ঘাটে মাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া মার বুকের ওপর আছড়াইয়া পড়িয়া ডাকাডাকি করিলাম, এবং সাড়া না পাইয়া আশ্চর্য হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং সবাই জোর করিয়া আমাকে সরাইয়া নিয়া গেল।

বায়োস্কোপের ছবির মতো এক একটি দৃশ্য ভাসিয়া যায়। পুকুরে ঝাঁপাইয়া স্নান করিতেছি; ভেতর-পুকুরের বড় দুই মাছ কার্তিক-গণেশ আমার বন্ধু; মনদামাসি আসিয়া তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলাইয়া পরিষ্কার জামা পরাইয়া আমাকে বার-বাড়িতে নিয়ে গেল। বাবামশাইয়ের সামনে এক বৃদ্ধ, পলিতকেশ, শুভ্র উপবীত, দৃষ্টিখানি স্নিগ্ধ, আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, বেশ বেশ, প্রশস্ত ললাট, বৃহস্পতিস্থান উচ্চ। আপনি বলছেন যখন, আমি না হয় এসে পড়িয়ে যাব।

বার-বাড়িতে একটি ঘরে আমার বিদ্যাভ্যাস শুরু হল। মানদামাসি বসিয়া থাকিত দূরে, ঘরের বাহিরে, থামের গায়ে হেলান দিয়ে। সঙ্গে পাথরের গ্লাসে ঢাকা দেওয়া দুধ। অ আ ই ঈ দিয়া শুরু, ক খ ঞ হইয়া ং ঃ ঁ; সঙ্গে এক দুই হইয়া একশ, আরও পরে শতকিয়া। বসিয়া বসিয়া পিঠ ব্যথা করিলে মাদুরের ওপরেই গড়াইয়া নিতাম। ক্ষুধা পাইলে মানদামাসির কাছে ছুটিয়া যাইতাম। এক দলা মাখা সন্দেশ ও একগ্লাশ দুধ গলায় ঢালিয়া আবার পণ্ডিতমশায়ের সামনে আসিয়া বসিতাম। আরো প্রয়োজনে মানদামাসির ডাক পড়িত। ইজের ছাড়াইয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিত মানদামাসি, আবার সাফ সুতর করাইয়া জামাকাপড় পরাইয়া দিতও মাসিই।

অ আ ক খ-র বেড়া ডিঙাইয়া 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে' শুরু হইল। অন্যদিকে শুনিয়া শুনিয়া দু'য়েকটা কীর্তন ও ভজনও গলায় তুলিয়া ফেলিলাম। সন্ধ্যায় বাবামশাই কখনো কখনো আদেশ করিতেন সেইটা গা তো মা। সেই মীরার ভজনটা। ভুল সুরে আধো স্বরে মীরার ভজনও শুনাইতাম বাবামশাইকে।

তখনো বাগানের দোয়েলটির সঙ্গে সখ্য ছিল অনাবিল, কালবৈশাখীর ঝড়ে লাফাইয়া লাফাইয়া আম কুড়াইতাম, বাগানের শিউলি কোঁচড়ে ভরিয়া ঘরে আনিয়া গাঁথিয়া তুলিতাম মানদামাসির সাহায্যে। কোথাও বাধা দেবার কেহ ছিল না।

বাবামশাইও তখনো জমিদারির দেখাশোনা, ভজন-কীর্তন, আমার ও ছোট বোন পারুর খোঁজখবর নেওয়া এর বাইরে কিছুতে মনোনিবেশ করেন নাই। বাবামশাইয়ের তখন আমি ও পারু এই দুই মা-মরা কন্যা ভিন্ন পৃথিবীতে নিকট বলিতে আর কেহ ছিল না। আমাদের জীবন বহিতেছিল নিস্তরঙ্গ শান্ত নদীর মতো। দিনগুলি প্রজাপতির ন্যায় কাটিতেছিল। ছন্দোপতন ঘটাইলেন পণ্ডিতমশাই নিজে। একদিন বাবামশাইয়ের নিকট গিয়া বলিলেন, মান্যবর। আমার যা কিছু শেখানোর ছিল আপনার কন্যাকে আমি শিখিয়ে দিয়েছি। কন্যা বুদ্ধিমতী। ওকে উচ্চশিক্ষাদান কর্তব্য।

উচ্চশিক্ষা মানে ইস্কুল। বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল। ফিটনে চড়িয়া যাইতাম, সঙ্গে খাবার লইয়া মানদামাসি। ইস্কুলও বাবামশায়ের প্রতিষ্ঠা করা, মাইনেপত্র আমাদের সেরেস্তা থেকেই যাইত। সেটা অবশ্য তখন বুঝি নাই। বিদ্যালয়ে আমার খুব সুনাম হইল। আমি নাকি শ্রুতিধর, যা শুনি তা-ই মুখস্থ করিয়া ফেলি। ফলে ইতিহাস-ভূগোল-প্রকৃতিবিজ্ঞান-ইংরিজি সবকিছুতেই ঝুড়িঝুড়ি নম্বর। সব বিষয়েই বর্ষশেষে চণ্ডীমণ্ডপে অনুষ্ঠান করিয়া আমার হাতে সোনার মেডেল অর্পণ করা হয়। বাবামশাইয়ের হাত হইতে মেডেল লইয়া বাড়ি পৌঁছিয়াই সেইসব মেডেল বাবামশাইয়ের হাতেই অর্পণ করি।

সেই সময়ই দুটি ঘটনা ঘটিল। এক, আগেই বলিয়াছি, এক গোধূলি লগ্নে সাজিয়াগুজিয়া বাবামশায়ের নিষ্ক্রমণ এবং পরদিন প্রত্যুষে নববস্ত্রপরিহিত বধূসমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তন। বধূটি আমার চেয়ে বছর কয়েকের বড়। বাড়ি আসিবার তিনদিন পরেই এতজোরে আমার হাত মুচড়াইয়া ধরিল যে

ডানহাতের কব্জিতে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়া গেল।

অন্য ঘটনাটি আরো উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ে সববিষয়ে আমার সোনার মেডেল বাঁধা, বাংলা বাদে। অথচ বাংলাটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। 'আমাদের ছোট নদী' হইতে যে ভালবাসার সূচনা, তা তখন অনেক সুদৃঢ়। রবীন্দ্রনাথ নামক এক কবির কবিতা ও অন্যান্য লেখাও তখন বাড়িতে আসে, এবং তাঁহার প্রতিটি লেখাই আমি সাগ্রহে গিলি। আমাদের ইস্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই, সুধীর সামন্ত, যাঁহার বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা কণ্ঠস্থ, কিছুতেই আমার উত্তর তাঁহার পছন্দ হয় না। শেষ অবধি আমাকে, ঠিকমতো উত্তর লেখা দেখাইয়া দেবার প্রস্তাব তাঁহার কাছ হইতে আসিল। ইতোমধ্যে তিনি যে ক্লাশের পাঠ চশমার আড়াল হইতে আমারই চোখে চোখ ন্যস্ত করিয়া দিনের পর দিন দান করিতেছেন তাহা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অবশেষে শিক্ষকদেরও চোখ এড়াইল না। সে খবর যথাবিধি বাবামশাইয়ের কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। ফলে সুধীর সামন্ত বিদ্যালয় এবং গ্রাম হইতে বিদায় নিলেন।

এখানে পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত, মাস্টারমহাশয় সম্বন্ধে আমার কোনরূপ দুর্বলতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য লেখার দৌলতে, বন্ধু বান্ধবদের আনুকূল্যে এবং প্রকৃতির বদান্যতায় নারীপুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে একেবারে যে অজ্ঞ ছিলাম তাহা নয়, কিন্তু সুধীরবাবু সম্বন্ধে আমার অন্তরে একপ্রকার বিরাগ ও বিদ্বেষ জাগরূক ছিল। আমা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট রচনা লিখিয়াও অন্যে যখন দশে আট পাইত, আমাকে পাঁচ কিংবা ছয় দিতেই তাঁহার ঘাম ছুটিয়া যাইত। কারণটা অবশ্য তখন বুঝি নাই, বন্ধুরা দেখাইয়া দিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটায় 'আমাদের সেই'-এর পর গ্রামের নাম, নদীর নাম, গাছের নাম, পাখির নাম আরও কার কার নাম বলিবার সময় সুধীরবাবুর চোখ জানলা দিয়া বাইরে ভাসিয়া যায়, কেবল 'আমাদের সেই তাহার নামটি' বলিতে বলিতে আমার চোখে তাঁহার চোখ স্থাপন করিয়া যেন আকুল হইয়া যান। তবে তাঁহার জন্য আমার বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছিল। মনে হইতে লাগিল, আমারই জন্যে মাস্টারমহাশয়ের চাকরি গেল। মানুষটির ওই একটি ব্যতীত আর দোষ ছিল না। শুনিয়াছিলাম গ্রাম ত্যাগ করিয়া তীব্র অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বাবামশাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন এমন সাহস বা সামর্থ্য গ্রামে কাহারো ছিল না।

কিন্তু মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল ইস্কুল হইতে আমাকে ছাড়াইয়া আনায়। পারু আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট, বিনাদোষে তাহারও একই ভবিতব্য হইল। বাবামশাই বলিলেন, অনেক হয়েছে, আমার মেয়েরা তো আর লেখাপড়া শিখে অফিসে চাকরি করতে যাবে না, যতদূর হয়েছে হয়েছে, বাকিটা ঘরে বসেই শিখে নেবে।

আসলে বাবামশাইয়ের ইচ্ছা ছিল অন্য। এবং সে ইচ্ছার ইন্ধন জোগাইতেছিলেন আমার নতুন মা।

ইচ্ছাটা অচিরেই প্রকাশ পাইল। বাড়িতে ঘটকের আনাগোনা শুরু হইল। মানদামাসি এবং আরো অন্যান্যদের নিকট হইতে খবর পাইতাম। রামহরি ভট্টাচার্য আমাদের পুরনো ঘটক, তাহাকেই নিয়োগ করা হইয়াছিল। সে আসিলে ভালমন্দ খাবার যাইত ভিতর হইতে, বাবামশায়ের সঙ্গে অনেক বেলা অবধি শলা-পরামর্শ চলিত।

প্রথমদিকে আমার মন্দ লাগিত না। নিজেকে বেশ মূল্যবান মূল্যবান লাগিত। ফুল-পাখি সকলকেই নূতন চোখে দেখিতাম। মনে হইত, কবি ঠিকই বলিয়াছেন, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। পশু-পক্ষীর মিলনদৃশ্যে শরীরে উত্তেজনা আসিত। এর মধ্যে রজঃস্বলা হইলাম। মানদামাসি শিখাইয়া দিল নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত রাখিতে হয়। বন্ধুদের কারো কারো আগেই হইয়াছিল কাজেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম। তবুও যেটুকু ভয় পাইয়াছিলাম, মাসি নিজের কাছে সারাদিন রাখিয়া অনেক গল্প করিয়া সেই ভয় কাটাইয়া দিল। কটা দিন পার হইলে স্নান শেষে চিবুকে আঙ্গুল ছোঁয়াইয়া চুমো খাইয়া বলিল, এবার একটা টুকটুকে বর এলেই আমি নিশ্চিন্ত।

ও'দিকে কিন্তু কথা যেসব ভাসিয়া আসিতেছিল তাহাতে শঙ্কা দিনদিন বাড়িতেছিল। রূপ নয় শিক্ষা নয়, বয়েস তো নয়ই,— বাবামশায়ের একমাত্র বিচার্য্য ছিল কুল। ফলে উচ্চকুলের পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে রামহরি ক্রমশঃ বৃক্ষের চূড়ায় উঠিতে শুরু করিল। শেষ অবধি আমার জন্য যাহার সন্ধান আনিল সেই পাত্রের বয়স আমার চেয়ে প্রায় তিরিশ বছর বেশি, প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছে, মৃত্যুর কারণ খুব পরিষ্কার নয়, তবে বংশকৌলীন্যে অতি উৎকৃষ্ট, এবং বাবামশায়ের সেটা সবচেয়ে পছন্দের, ঘরজমাই থাকিতে আপত্তি নাই।

আমি ছিলাম বাবামশাইয়ের অত্যন্ত প্রিয়। যতই নতুন মা উস্কানি দিক আমাকে চোখের আড়াল করিতে বাবামশাইয়ের ছিল ঘোর আপত্তি। তাই আগের বিবাহ, বয়েসের ফারাক সবই বাবামশায়ের কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল।

শুনিলাম বাবামশাই বলিয়াছেন, বয়েস? তাতে কি হয়েছে? আমার ও আমার স্ত্রীর বয়েসের তফাৎ কুড়ি বছর।

স্ত্রী বলিতে এক্ষেত্রে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর কথাই বলিয়াছিলেন তিনি। এবং আমার এটাও স্মরণে আসিল, আমার চেয়ে তিরিশ বছরের বড় যিনি, তিনি বাবামশাইয়ের অপেক্ষাও হয়ত বয়েসে প্রবীণ।

অনেক কাঁদিলাম। মানদামাসিও, পাছে আমার মুখের দিকে তাকাইলে চোখে জল আসিয়া যায়, লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইল। পারু যে পারু, দিনরাত আমার খেলার পুতুলগুলি নিয়া টানাটানি করিত, সেও, এতদিনে বোধবুদ্ধি হইয়াছে, আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ভাসাইল। কিছুতেই কিছু হইল না। বিবাহের দিন আসিয়া গেল।"

এই অবধি টানা লেখা। তারপর দু'তিন পাতা খালি। রাত্রির শেষ শব্দটুকুও অন্ধকার শুষে নিয়েছে। বহুদিন এত রাত জাগেনি দীপ। চোখ জ্বালা করছিল। এরপরে জেগে থাকলে কাল উঠতে দেরি হয়ে যাবে। তবু ডায়েরিটা যেন টানছিল দীপকে। ইচ্ছে করছিল শেষ করে ওঠে। কিন্তু বেশ মোটা। আরও অনেক পাতা লেখা। সারারাতেও শেষ হবে না।

উঠে জল খেয়ে জানলা খুলে দিল। হাওয়া আসছে হু হু করে। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া। ভোরের দিকে বৃষ্টি না হয়।

সকালবেলা উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাতেই দীপের মনে হল দিনটা অন্যরকম।

রাতে বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ে উড়ে পাতা জড়ো হয়ে আছে রাস্তায়। গাছের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা এখনও আলগোছে লেগে। রোদ ওঠেনি। আকাশ থেকে গনগনে তাপের বদলে স্নেহের মতো মেঘ চোঁয়ানো আলো গড়িয়ে নামছে।

আজ রবিবার। দিন চারেক হল দিনে অসহ্য গরম, রাতের দিকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে দূরে কোথাও। সকালে ঘাম শপশপে হয়ে বিছানা ছাড়তে ছাড়তে ভাবছে, নাঃ, সামনে আরও একটা রোদে পোড়া দিন। আজই, একই সঙ্গে রাতের বৃষ্টি, ভোরের মেঘ এবং রবিবার। দীপ কি দিনটা চেখে দেখবে? অপশনগুলো ভেবে নিল।

তিথি? বাবা-মা'র সঙ্গে গোয়ার সমুদ্র সৈকতে রোদ পোয়াচ্ছে। ডায়েরির ঠেলায় রাত করে শুয়ে দেরিতে ঘুম থেকে উঠে দেরি করে অফিসে গিয়ে পরশুই ই-মেলটা পেয়েছিল, রাগ করেছ? সরি! কটা দিন পরীক্ষাপরীক্ষা করে এমন স্টাক-আপ হয়েছিলাম! সব চুকে বুকে গেছে। যাই হোক, এখন ছুটি। ইচ্ছা করছে এক্ষুনি তোমার কাছে চলে যাই। কিন্তু পারব না। বাবা টিকিট করে ফেলেছে। কালই ভোরের ফ্লাইটে যমবে। না না মুম্বই। যাই বলো, আমার কিন্তু বমবেটাই ভাল লাগে বলতে। বমবে থেকে গোয়া, স্টার্লিং রেসর্ট। ওদের নিজের একটা বিচ আছে। ভ্যাগাটর না ভ্যাগাবন্ড কী যেন। সেখানে চারদিন সমুদ্রস্নান। ফিরতে ফিরতে সেই সামনের স্যাটারডে। সব জমিয়ে রাখব। এসেই ছুটব তোমার কাছে। রাগ কোরো না প্লিজ্। স্মাইল্। গুড বয়। বাই।

তিথি আউট। কম্পিউটার ক্লাশ? আজ রোববার বন্ধ। রবীন্দ্রসদন চত্বরে চলে যেতে পারে, কোনও নাটক বা নন্দনে সিনেমা। কিন্তু তাও তো সেই বিকেল। আগে অন্তত সাত-আটঘণ্টা। এই রকম একটা দিন, রোদ নেই বৃষ্টি নেই, যেন জানলা দিয়ে দীপকে ডাকছে, দীপ পাজামা পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় বসে চানাচুর দিয়ে মুড়ি খাবে?

দাড়িটাড়ি কামিয়ে স্নান করছে দেখে মা জিজ্ঞেস করল, আজ ছুটি না, কোথায় চললি?

—দেখি, একটু কাজ আছে। দেরি হলে ভেবো না।

—দুপুরে খাবি তো?

সপ্তাহে একটা দিনই বাড়িতে দুপুরে খায়। মা'রও এক্সপেকটেশন থাকে। একটা দুটো পদ স্পেশাল রাঁধে। হ্যাঁ-ই বলে দিল দীপ।

বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করে দীপ নিজেই অবাক হয়ে গেল। যেন দীপ নয়, অন্য কেউ দীপের হয়ে পা ফেলে ফেলে দীপকে নিয়ে যাচ্ছে। আজ স্কুটার নিয়ে বেরোয়নি; গিয়ারের তারটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, আরও দু'য়েকটা ছোটখাটো কাজ আছে, শেরসিং-এর গ্যারেজে দিয়েছে। হেঁটে বাসস্টান্ড অবধি গেল; হাত দেখিয়ে বাস দাঁড় করাল। ছুটির দিনের সকালের বাস, তাও যাচ্ছে শহর ছাড়িয়ে উল্টোমুখো, ফাঁকা, বাসে উঠে গুছিয়ে বসে দীপ

ভাবল, তাহলে সত্যিই অবচেতন বলে কিছু একটা আছে!

লেভেলক্রশিং থেকে বাসটা অন্যদিকে ঘুরে গেল। আগেরদিন লেভেলক্রশিংটা খোলা ছিল। আজ দেখল গেট নামানো। একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। সিঙ্গল লাইন। মালগাড়ি ছাড়া আর কিছু যায় বলে মনে হয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনল দীপ, একশ' ছ'টা বগি। মালগাড়িগুলো এত বড় হয়? ইঞ্জিনটা পারে টানতে? অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ সুর করে গেট উঠতে শুরু করল। সাইকেল, রিক্সা, স্কুটার, অটো সবাই মিলে একসঙ্গে হর্ন দিতে শুরু করল। দীপও গুটিগুটি রেললাইন পার হয়ে ওপারে গেল।

একবার ভাবল রিক্সা নেয়। ওপারে কয়েকটা দাঁড়িয়ে, দীপকে দেখেই কিনা কে জানে, হর্ন বাজাতে শুরু করল। খেয়াল হতে দীপ দেখল সে নয়, লক্ষ্য তিনটে মেয়ে, সাত সকালেই কষে মাঞ্জা দিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। রিক্সাওয়ালাগুলোও, বয়েস কম, শখ মিটিয়ে হর্ন টিপে নিল।

ভাবতে ভাবতেই রাস্তায় এসে পড়ল দীপ। এইটুকু রাস্তা সরু। দু'পাশে দোকানপাট। সেদিন দুপুরে এসেছিল, আজ সকাল, বাজার বসেছে, বাজার উপচে উঠে আসছে রাস্তায়। কাঁচাবাজার যেটুকু সেটুকু তবু পদের, মাছের বাজার শুরু হতেই জল-কাদায় জায়গাটা দই মাখা হয়ে গেছে। জুতো তো বটেই, প্যান্টেরও নীচে কাদা লেগে গেল দীপের। মনে হল রিক্সা নিলেই ভাল হত।

একটু এগিয়েই কিন্তু রাস্তাটা অনেক চওড়া। পরিস্কারও। বাঁক ঘুরলেই খেলার মাঠ। মাঠের সামনে এসে পা আটকে গেল দীপের।

কীসের টানে এতদূর এসেছে দীপ? কোথায় যাবে? কেনই বা যাবে? গিয়ে কী বলবে? খোঁজ নিতে এলাম? শুকনো খোঁজখবরে উপকার হয় কোনও? দীপ কি কোনও কাজে লাগতে পারবে শোকসন্তপ্ত পরিবারটির? দীপ কি বহিরাগত নয়? দীপের এই অনাহুত আসা কি অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে না?

মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল দীপ। আজ অন্য মাঠ। নেড়া গোলপোস্ট, ঘাসওঠা মাঠে এখানে ওখানে রাতের বৃষ্টির জমা জল-কাদা। খেলোয়াড় নেই- রেফারি নেই- ছুটন্ত বল নেই- উৎসাহে টগবগ করা একরাশ দর্শক নেই। নেহাৎই প্রাণহীন একখণ্ড ভূখণ্ড যেন চিত হয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দীপ দেখল একটা চনমনে রোদ অবধি নেই। মাঠ ছাড়িয়ে গাছ, গাছের নীচে গোল হয়ে থাকা বিভিন্ন বয়েসের মানুষ, উলের বলের মতো গড়িয়ে যাওয়া কথা, কিশোরীর খিলখিল হেসে ওঠা, আজ কিছুই নেই। অবশ্য সেদিন দীপের সঙ্গে আরো কিছু ছিল। পেছনে ভিড়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটা অ্যাম্বুলেন্স, সেখানে শোয়ানো ছিল একটা মানুষ, এবং দীপ ও অন্যান্যরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা খবর। আজ বাসি হয়ে যাওয়া ম্লান স্মৃতিটুকু ছাড়া মানুষটার আর কিছু পড়ে নেই।

—আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি না?

চমকে উঠল দীপ। এতটাই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, খুব কাছ থেকে বলে ওঠা প্রায়-ভৌতিক কণ্ঠস্বরে থতমতো খেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দীপ দেখল চেনা মানুষ। এইখানেই খবরটা পেয়ে সময় নিয়েছিলেন, নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে নাতির হাত ধরে ফিরে গিয়েছিলেন বাড়ি। দীপরা অনুগমন করেছিল। অনুগমন। শব্দটা আগে পড়েছিল। সেদিনই মানে বুঝতে পেরেছিল।

—হ্যাঁ, আমি ব্রতর সহকর্মী, সেদিন এসেছিলাম।

বৃদ্ধ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। যেন দীপ অপরাধী। যেন দীপরা বয়ে নিয়ে না এলে হেঁটেই বাড়ি ফিরত ব্রত।

আনমনে, যেন মনে পড়ে গেছে এইভাবে হাঁটতে শুরু করলেন বৃদ্ধ। এতক্ষণে খেয়াল করল দীপ, —হাতে বাজারের ব্যাগ। লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবি পায়ে চামড়ার চপ্পল, বাজার করতে চলেছেন ব্রতর বাবা। একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস, যা এতক্ষণ দীপের মধ্যে ধরা ছিল, সঙ্গোপনে বাতাসে মিশে গেল। যেন একটা আশ্বাস, একটা ভরসা— এই মানুষগুলো এখনও শোকসর্বস্ব হয়ে বেঁচে নেই। নিজের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি রিপুগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে আবার জীবনে ফিরছে।

পেছন পেছন, সামান্য দূরত্বে, দীপও চলতে শুরু করল। চেনা রাস্তা নয়, দু'-তিনটে বাড়ি পেরিয়েই একটা গলিতে ঢুকলেন বৃদ্ধ। এদিকে বাড়ি-ঘর আরও কাছাকাছি, সাইকেল রিক্সা চলতে পারে, কিন্তু গাড়ি ঢুকবে না, রাস্তার এপার থেকে ওপারে বাড়ির ছাদে লাফিয়ে চলে যাওয়া যায়। মনে হয় বাড়িগুলোর খুব আত্মীয়তা, সুখ-দুঃখে ছাদে দাঁড়িয়ে এ ওর দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করে, কি গো ভাল আছ তো?

—দেখতে দেখতে কত বদলে গেল জায়গাটা! কথা শুরু করেছেন বৃদ্ধ। দীপ কাছাকাছি এগিয়ে গেল।

—এই যে পুকুর দেখছেন, ততক্ষণে একটা বাঁধানো পুকুরঘাট ডানদিকে রেখে বাঁয়ে ঘুরেছে ওরা, এই কুণ্ডু পুকুর অবধি ছিল কলোনির সীমা। তারপর থেকেই জঙ্গল। আমরাই প্রথম সেটেলমেন্টের সঙ্গে কথা বলে জঙ্গল সাফ করে জায়গাটা দাগ দিলাম। তারপর ক'বন্ধু মিলে প্লট করে কেনার পরিকল্পনা করলাম। জায়গাটা ছিল হালদারদের। জলের দরে পেয়ে গিয়েছিলাম, সেভেনটি এইটে, একহাজার টাকা কাঠা। ভাবতে পারেন? এখন ওই পাশে জলার জমিই ষাট হাজারে বিকোচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে দীপ ভাবছিল, যেন ব্রতর বাবা নয়, কোনও জমির দালাল, দীপও দীপ নয়, কোনও উৎসাহী খদ্দের, জমির সুলুক-সন্ধান দিচ্ছেন ভদ্রলোক।

—সেন্ট্রাল এক্সাইজে কাজ করতাম। জীবনে এক পয়সা ঘুষ নিয়েছি কেউ বলতে পারবে না। জানেন তো, সেন্ট্রাল এক্সাইজ, অফিসের চেয়ারটেবিল অবধি ঘুষ খায়, সেইখানে চৌত্রিশ বছর কাজ করে ফুল পেনশান নিয়ে বেরিয়ে এলাম মাথা উঁচু করে। রিটায়ারমেন্টের দিন সাদা একখানা শাল দিয়েছিল। সাহেব বলেছিলেন, বারীনবাবুর সার্ভিস রেকর্ড শালখানার মতোই সাদা, নিষ্কলঙ্ক।

মাথা নিচু করে হাঁটছিল দীপ। প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন দিতে দিতে শর্টকাট করা দু'য়েকটা রিক্সা এলে জায়গা দিতে পাশে সরে যেতে হচ্ছিল, দু'য়েকবার বাড়ির সিঁড়িতেও উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। মানুষটার খুব কাছাকাছি চলে আসছিল দীপ, গায়ের গন্ধ পাচ্ছিল, গন্ধে কোনও বাসি ময়লা জড়িয়ে নেই।

—মেয়ের বিয়ে দিলাম। জামাই ইঞ্জিনিয়ার, থাকে নাসিকে। রিটায়ার করে যেকটা টাকা পেয়েছিলাম ফুস। ঐদিকে বাড়ির ভিত খোঁড়া হয়ে গেছে। ব্রত চাকরিতে ঢুকেছে, বলল ব্যাঙ্ক থেকে সহজ সুদে লোন দেবে। বাড়ি শুরু করল। ও আর কতটুকু দেখেছে? বালি-সিমেন্ট-রড-ইঁট-কাঠ সমস্ত আমাকেই খুঁজে খুঁজে জোগাড় করতে হয়েছে। ছাদ ঢালাই হল, ঢুকে পড়লাম। আগে থাকতাম ভাড়াবাড়িতে, ওই যে লেভেলক্রশিং, তার কাছে। গৃহ প্রবেশের পর একটু একটু করে করেছি।। ভেতরের প্লাস্টার, মেঝে দরজা-জানলার রং, তাও তো প্রাইমার অবধি দেওয়া হয়েছে। কথা ছিল ঝজুর ছুটি পড়লে জানলাগুলো রং করা হবে। স্কুল খোলা থাকলে আমিও সেইভাবে নজর দিতে পারি না। ব্রতর মা, আমার স্ত্রী অনেকদিনই গত হয়েছেন। বউমাই সংসার সামলায়, ওর পক্ষে একা....। হঠাৎই থেমে গেলেন ব্রতর বাবা। কথায় নয়, চলাতেও। ফিরলেন দীপের দিকে। চশমার ভেতর থেকে পুরো তাকালেন। বলে উঠলেন, বেশ জোরে, জীবনে কখনও চুরি করিনি, অসৎপথে একটা পয়সাও রোজগার করিনি, ছেলেকেও শিখিয়েছি সৎপথে থেকে ফেনাভাত খাওয়াও সম্মানের। সেও অক্ষরে অক্ষরে মেনেছে। ভাল খেলত, ময়দানে এ ডিভিশনে খেলত, কতবার টোপ দিয়েছে খারাপ করে খেলো, ম্যাচ ছেড়ে দাও, শোনেনি, ওই করে তো বড় লেভেলে যেতেই পারল না, সেই আমার, আমার ছেলের এমনটা হল কেন বলতে পারেন?

বৃদ্ধ তাকিয়ে আছেন দীপের দিকে, যেন বিচারের ভারটা দীপের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন, যেন দু'পক্ষের সওয়াল শেষ হয়ে গেছে, রায় ঘোষণার অপেক্ষা।

দীপের গলা শুকিয়ে গেল।

বৃদ্ধই বাঁচালেন। আবার ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন। দীপও চলল সঙ্গে সঙ্গে।

মানুষটা এবার যেন একটু চুপচাপ। অভিযোগ যতটুকু জানানোর ছিল কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়ে গেছে, আর কিছু বলার নেই। হাঁটাতেও দৃপ্ত ভাবটা অদৃশ্য। একটু ঝুঁকে পড়েছেন সামনে, মাঝে মাঝে হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।

হঠাৎই চেনা রাস্তাটা সামনে এসে গেল। সেই জল-কাদা-আনাজ-মানুষ। বাজার। পাশের গলি দিয়ে এতক্ষণ শর্টকাট করছিল ওরা। যেখানে এসে বাজারের রাস্তায় মিশেছে সেইখানে, বাঁদিকে দু'ধাপ সিঁড়ির ওপর একটা দরজা, দরজায় সবুজ পর্দা, পর্দার নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে মানুষের পা, কিছুর মধ্যে কিছু না বারীনবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠে পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

দীপ অবাক। এদিক ওদিক তাকাতে নজরে পড়ল একটা সাইনবোর্ড, পর্দার ওপর কাত হয়ে ঝুলছে, সাদায় কালোয় মুছে যাওয়া লেখাগুলো সাইনবোর্ডের মতো দীপও ঘাড় কাত করে পড়ে ফেলল, ডাঃ জে. ডি. বাগচি, এম. বি. বি. এস। তারপরও হিজিবিজি কীসব লেখা ছিল, দীপ আর চেষ্টা করল না।

ডাক্তার। তার মানে ডাক্তারখানা। তার মানে অসুখ-বিসুখ। কার অসুখ? ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি হচ্ছিল। তবু পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখ দুটো বাড়িয়ে দিল ভেতরে।

বাইরে থেকে যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন নয়। একটাই ঘর। বেঞ্চে

খানদুই রোগী। অসুখ-বিসুখ তেমন জোরালো কিছু নয়। মুখচোখে ব্যথা-যন্ত্রণা নেই, গোঙানি-কাতরানিও নয়। বসে বসে কেউ আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, কেউ ডাক্তারবাবুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বাইরে দেখছে। ভাবখানা, যা দেবার এইবেলা ছাড়ো, রোদ লম্বা হচ্ছে, গিয়ে হাঁড়িতে চাল বসাই। দীপের মনে হল, এখনও যে রোগীপত্তর আসে সেটা প্রমাণ করার জন্য এইসব ভাড়াটে রোগীকে ডাঃ জে. ডি. বাগচি, এম. বি. বি. এস বেঞ্চিতে সকাল থেকে বসিয়ে রাখেন।

অবশ্য সত্যিকারের রোগী একজন ছিলেন। ব্রতর বাবা। ডাক্তারবাবুর সামনের চেয়ারে বসে ডানহাত খানা ডাক্তারবাবুর দিকে বাড়িয়ে গভীর মনোযোগে ডাক্তারবাবুর মুখের রেখা লক্ষ করছিলেন। একজন যদি ডাক্তার হয় তাহলে আর একজন মুখের রেখা পড়তে পারা জ্যোতিষী। ডাক্তারবাবু ব্রতর বাবার প্রেশার মাপছিলেন। মাপা হয়ে গেলে হাত থেকে কাপড়ের ফেট্টিটা খুলতে খুলতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, —না হে, এবারও একশ' চল্লিশ আশি। তোমার চিকিৎসা করা আমার কপালে নেই। রোগীর মুখে কে যেন পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বালিয়ে দিল। ডাক্তারের হাত ধরে বারীন বললেন, বলছ ডাক্তার, বলছ? সমস্ত কলকব্জা ঠিকঠাক আছে? ডাক্তার স্মিতহাস্যে অভয় দিলেন, আমার বিজ্ঞান যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আরও কুড়িটা বছর হেসে খেলে...

—কুড়িটা? হ্যাঁ জয়দুলাল, কুড়িটা বছর পেলেই আমার চলে যাবে। ছাব্বিশ-সাতাশে আজকাল সকলেই দাঁড়িয়ে যায়। আমার দাদুভাইয়ের যা মাথা....। চললাম হে!

বাইরে বেরিয়েই চোখ গেল দীপের দিকে। জিভ কাটলেন।

—এহে, দেখেছ, তোমাকে রোদ্দুরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। কী অন্যায়, কী অন্যায়। জয়দুলাল, ডাক্তার, আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমাদের কো অপারেটিভেরও মেম্বার। আমার দু'টো বাড়ি পরেই বাড়ি করেছে। ওর কাছে প্রেশারটা চেক করাই। আজও হান্ড্রেড ফর্টি এইট। ঠিক আছে বলো? ভুল করে তুমি বলা শুরু করে দিলেন বারীন। দীপও ভুলটা ধরিয়ে দিল না।

—একদম পারফেক্ট। আপনার যা ফিজিক্, মনে হয় ফিফটি ফাইভও ছাড়াননি।

—সিক্সটি সিক্স রানিং। শুধু বাইরের ফিজিক্টা দেখছ, প্রেশার, সুগার, কোলেস্টেরল! সমস্ত চেক করিয়েছি, সব অ্যাবসলিউটলি অন দ্য ডট। একটা নেশা ছিল সিগারেট। সেটাও ছেড়ে দিয়েছি। আর কুড়িটা বছর, পারব না টানতে, কী বলো?

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এবার আর ভারডিক্ট দিতে অসুবিধা হয় না দীপের। বৃদ্ধের পাশাপাশিই হাঁটতে থাকে। একবার যখন তুমি বলে ডেকেছেন, এটুকু অধিকার তো অর্জন হয়েই গেছে।

একটু চুপ করে হঠাৎ থেমে পড়লেন বারীন। দীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, ছাগল।

দীপ ঢোক গিলল। কোথাও ভুল করে ফেলল নাকি? ব্রতর বাবা কমপ্লিট করলেন, আমার ছেলেটা, তোমাদের বন্ধু। একটা রামছাগল। একবার প্রেশার দেখিয়েছিল, তাতে নাকি হাই পাওয়া গিয়েছিল, হা হা করে হেসে বলেছিল, তোমাদের ওই মেশিন ভুল, ফেলে দাও। ওরে গাধা মেশিন কখনও ভুল বলে? ভুল তো তোর। না প্রেশার না সুগার, কোনওদিনই কিছু চেক করালি না। ব্লোটা এল ঝড়াৎ করে মুণ্ডুটা খুলে নিয়ে চলে গেল। এখন বোঝ। বেশি পাকামি করতে যাওয়ার ফল। গাধা, পাঁঠা, রামছাগল কোথাকার!

বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল ওরা। এদিকটা মাছের বাজার। রাস্তা অবধি মাছের আঁশ— রক্ত-তেল-গন্ধ ছড়ানো। দু'টো কুকুর তার ভাগ নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। কাদা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মাছের বাজার পার হয়ে গেলেন ব্রতর বাবা।

—দাদু, আজ টাটকা পটল এনেছি, দেখে তো যান। ঘাড় না ঘুরিয়েই বারীন বললেন, না রে পাঁচু, দূর থেকেই বুঝতে পারছি, ওগুলো রং করা ঘষলেই রং বেরুবে।

তারপর দীপের দিকে ফিরে বললেন, চালানি পটলগুলো পেট মোটা, বিচি বোঝাই, কাটলে ভসভস করে জল বেরোয়। খবরদার ওই পটল নেবে না। দিশি পটল রোগা, ওপর-নীচ সরু, দেখলে মনে হয় খেতে পায়নি। ওগুলোই আসল। ঝিঙেও তাই। পারলে মাথা ভেঙে দেখে নেবে।

—ওকী করচেন দাদু? ওই লাউ আর কাউকে বেচতে পারব? হাঁ হাঁ করে তেড়ে এল দোকানদার।

নখ ঢুকিয়ে লাউয়ের কচিত্ব পরখ করছিলেন বারীন, ভাঙলেন, তবু মচকালেন না, —নেবো বলেই তো অমন করে দেখছিলাম রে গিয়াসুদ্দিন, দে, গোটা লাউটাই ওজন করে দে... আরে আরে করছিস কী, ওই একশ' গ্রামটা আবার চাপাচ্ছিস কেন, এক কেজিই তো হল, কাল না হয় পঞ্চাশ গ্রাম কমই দিস।

এইভাবে পটল, ঝিঙে, লাউ, আলু হয়ে শাক।

—বুঝেছ হে, শাকই হচ্ছে আসল। রোজ যে ব্রাহ্মীশাকের রস খেয়েছে, অঙ্কে তার মাথা হবে সত্যেন বোস। তেমনি গাঁদাল পাতা আমাশায় অব্যর্থ। থানকুনির রস রক্ত পরিষ্কার রাখে পেটের পক্ষেও ভাল।

বলছিলেন আর এক আঁটি করে ছাগলের খাদ্য থলিতে ঢোকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর দীপেরই হাঁটু ব্যথা করতে লাগল। এখনও মাছের বাজার বাকি।

সবজি-বাজার সেরে আড়াইশ' দই কিনলেন বারীন। তারপরেই বাড়ির পথ ধরলেন। দীপ বলে ফেলল, মাছ নিলেন না?

দাঁড়িয়ে পড়লেন বারীন, —মাছ? বিয়ে দিয়ে ঘরে আনলুম দুধের মেয়েটাকে, সে আমার সামনে শাকসেদ্ধ দিয়ে ভাত মেখে খাবে, তার সামনে আমি, এই ঘাটের মড়া মাছ গিলব? বাড়িতে মাছ ঢোকাই বন্ধ করে দিয়েছি! দাদুভাইয়ের কষ্ট হয়। কী আর হবে? বড় হলে সব সহ্য হয়ে যাবে। ....দেখো না বলে কয়ে। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়েও তো মাছ-মাংস খেতে পারে।

দীপের গলার কাছে কী যেন আটকে গেল। ব্রতকে মনে হল একটা হতভাগা। এই বাবাকে ছেড়ে অত তাড়াতাড়ি কেউ যায়?

বারীন ততক্ষণে চলতে শুরু করেছেন, আঠারো বছরের মেয়েটাকে যখন এনেছিলাম, আমিই তো ভরসা দিয়েছিলাম, কোনও চিন্তা নেই মা, এই বুড়ো বাপ যতদিন আছে...। সেই আমিই থেকে গেলাম। সাদা শাড়ি, সাদা কপাল, সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কপাল চাপড়াই। কেন আনলাম? এমনি করে মুখে চুনকালি দিয়ে গেল হারামজাদা?

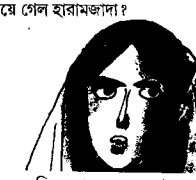

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খেতে বসতে যাবে, ফোন বেজে উঠল। ফোন? ছুটে গেল দীপ। অপেক্ষায় অপেক্ষায় থেকে , শেষ পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিল। সত্যিই ফোনের লাইন লেগে গেল তাহলে!

রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে একজন দীপের নাম জানতে চাইল। দীপের নামেই ফোন। নিজের নাম-ঠিকানা বলতেই ওপাশের কণ্ঠ অভ্যস্ত সুরে জানিয়ে দিল ওর ফোন নম্বর। তারপর ধন্যবাদটুকুও শোনার অপেক্ষা না করেই লাইন কেটে দিল। রিসিভারটা হাতে নিয়ে দীপ ভাবল,— কনগ্র্যাচুলেশনস্, ওয়েলকাম টু টেলিফোন ফ্যামিলি এইরকম কিছুও তো বলতে পারত ওরা। যাক গে, দীপ নিজেই নিজেকে কনগ্র্যাচুলেট করে দিল।

মা ডাকল, কী রে, আজ কি না খেয়েই অপিস যাবি? দীপ জানে, এই ফোনটার প্রতি মা'র খানিকটা সতীনপনা আছে। মোটে পছন্দ করে না। চেষ্টা করেছিল যাতে না নেওয়া হয়। শেষ অবধি, —সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরি, তোমাদের খোঁজখবরটাও তো নিতে পারি বলে রাজি করিয়েছিল। দীপের ধারণা ওটাও নয়, ফোন থাকলে তিথি মাঝে মাঝে ফোন করবে, দীপ বেরিয়ে গেলে মা-ই রিসিভ করবে, এবং তিথির সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে পারবে, সেই লোভেই মা শেষ অবধি ফোন নিতে রাজি হয়েছে।

—এই যাই, বলতে বলতে ডায়াল ঘোরাল দীপ। প্রথমে একবার রিং হয়েই কেটে গেল। দ্বিতীয়বার ডায়াল করতেই— তিথি!

—হ্যালো! একটু আদুরে নাকি নাকি গলার স্বর; ঘুমের মধ্যেও দীপ বলে দিতে পারে তিথিই, অন্য কেউ নয়।

—আমি কি একটু তিথি রায়-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি? গলাটা সাধ্যমত মোটা আর ভেঁড়ে করল দীপ।

—তিথি রয় স্পিকিং, আপনি কে বলছেন?

হা হা করে হাসল দীপ; গলা গোপন না করে বলল, কবে ফিরলে? ফিরে একটা খবর পর্যন্ত...।

—দীপ! তুমি? ফোন? কানেকশন পেয়ে গেছ?

—এইমাত্র। পেয়েই তোমাকে ফোন করছি। নাম্বারটা নোট করো। কেমন, চিনতে পারোনি তো!

—হ্যালো দীপ আছেন? কি আমার গলা চিনতে পারলে তুমি? ওইভাবে হাঁড়ির মধ্যে থেকে বললে চেনা যায়? ছাড়ো, বলো তোমার নাম্বার।

নম্বরটা বলতে বলতে ঘড়ি দেখল দীপ। নাঃ আজ আর অফিসে ঢুকতে

দেবে না।

—শোন, এক্ষুনি না বেরুলে আজ অফিস কামাই। ফোন রেখে দিচ্ছি।

—অফিসটাই আজ বাদ দাও না হয়। আজ তোমার ফোন এলো, কতদিন দেখা হয় না, চলো না কোথাও সেলিব্রেট করি।

সেটাই যে হয় না তিথি। মনে মনে বলল দীপ। অফিসে না গেলে ফোন-স্কুটার-তিথি কিছু থাকবে না। দীপ জানে মনের কথাটা মুখে বললে তিথি বলবে, কত টাকা মাইনে দেয় তোমার অফিস? আমার কনসালটেন্সি ফার্ম চালু হোক, সেখানে তুমি বসবে ডিরেক্টর হয়ে। ওই ক'টা টাকার জন্যে সারাদিন চাকরি? ছিঃ!

—শোন, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পাঁচটার মধ্যে ড্রিমহাউসের সামনে পৌঁছে যাব। তুমিও চলে এসো। লক্ষ্মীটি, আর কথা বলার সময় নেই, রাখছি।

ফোন রাখতে রাখতেও দীপ শুনল, পাঁচটা? অত দেরি?

কোনওরকমে গিলে, দু'টো স্কুলের বাচ্চাকে ধাক্কা দিতে দিতে শেষ অবধি বাঁচিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে, অফিসে পৌঁছল পনেরো মিনিট দেরিতে।

মানস চোখ তুলে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে টাকা গোনায় মন দিল। বটাদা শুধু বলল, চাকরিটা তোমাদের জন্যেই ভায়া!

দুপুরে বটাদা কম্পিউটার রুমে ঢুকল। কয়েকটা বড় কাজ দিয়েছিলেন সান্যাল, দীপ হিমশিম খাচ্ছিল, বটাদা ঘরে ঢুকে শব্দ করে চেয়ার টেনে বসল।

দীপ তখনও তাকাচ্ছে না দেখে বটাদা সুর নরম করল, রাগ করলি? মুডটা ভাল নেই। শুনছি ফর্টি ফাইভ হলেই ভি আর ধরিয়ে দেবে। আমার তো ফর্টি ফাইভ হয়েই গেল।

দীপ মুখ তুলল।

—শোনা যাচ্ছে এবারে আমাদের হাজার কোটির কাছাকাছি লস। প্রফিট-মেকিং অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে অ্যামালগ্যামেট করে দেবে, তারপরই কর্মী সংকোচন। তোদের মতো ইয়াং অ্যান্ড এনারজেটিক, কম্পিউটার-লিটারেট যারা তাদের রাখবে, বাকিদের অর্দ্ধচন্দ্র। শুনে থেকে মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে। ছেলেটা মাধ্যমিক দিল। হায়ার সেকেন্ডারিটাও যদি পাশ করত চিন্তা ছিল না। চাকরি চলে গেলে কী করব রে? খাব কী?

দীপ চুপ করে বসে শুনছিল। কখন মানস ঘরে ঢুকেছে খেয়াল করেনি।

মানস বলল, কেন ভি আর দিলে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক, লাখ দশেক টাকা ধরিয়ে দেবে হাতে, পেনশনও দেবে। ভালই ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে কাটিয়ে দেবে। রোদে পুড়ে অফিসেও আসতে হবে না, টাকাকে টাকাও পাবে।

—ভুল, পুরো টাকা কেউ একসঙ্গে পাবে না। লপ্তে লপ্তে দেবে। তাও দেবে কিনা সন্দেহ। আজ কারগিল কাল গুজরাট করে আটকে রেখে দেবে। বলবে দীর্ঘমেয়াদি বন্ড কেনো, টাকা হাতে দেব না। আর পেনশন? শুনছি অর্থ কমিশন পেনশন ব্যাপারটাই রদ করে দিতে বলেছে।

দীপের কেমন অস্বস্তি হয়। কথাগুলো আগেও শুনেছে। বটাদা বলেছে, ইউনিয়নও লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করছে। তবু দীপ ঠিক ভেতরে ঢুকতে পারে না। যেন দীপের নয়, বাইরের কারও কথা বলছে বটাদা। বটাদা বলেছে দীপও জানে, আপাতত তার চাকরি নিরাপদ। নিরাপত্তাই কি মানুষকে স্বার্থপর করে? হয়তো। এই মুহূর্তে তিথি ছাড়া আর কিছু ভাবতে চায় না দীপ। তিথি। কারণ বিকেল পাঁচটায় স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছতে গেলে দীপকে সাড়ে চারটের আগে বেরোতেই হবে। আর সেটা দীপের সহকর্মীরা বিশেষত বটাদার আনুকূল্য ছাড়া সম্ভব নয়।

—সমস্ত বেচে দেবে, বটাদা ঘাড় নেড়ে বলে যেতে থাকে, সব প্রফিটমেকিং কনসার্ন। একটার পর একটা, স্টিল প্লান্ট, সিমেন্ট-কারখানা, পাওয়ার....

—কোন স্টিল-প্লান্টটা প্রফিট দিচ্ছিল বটাদা? নাকি কান্নার একটা সীমা আছে। মানস দৃশ্যতই রেগে যাচ্ছিল।

—ঠিক আছে ভাই মানস, তোমার মা'র বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে বলে, মা আজকাল আর রাঁধতে পারেন না বলে, চোখে ভাল দেখতে পান না বলে মাকেও বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে আসবে একদিন, ঠিক কিনা বলো?

—তুমি যুক্তির ধার ধারো না, বটাদা, তোমার সঙ্গে কোনও কথাই বলা যায় না।

রেগেমেগে বেরিয়ে গেল মানস। দীপ চুপ করেই ছিল। বটাদা আড় চোখে দীপকে দেখে গলা নামিয়ে বলল, ওরা ভালই চেষ্টা করছে, খবর পেয়েছ? দীপ কিছুই বুঝতে পারল না। বলল, কারা?

—ব্রতর বাবা। ঘোড়েল লোক। একসময় সেন্ট্রাল এক্সাইজে কাজ করত। ইউনিয়নের লিডার ছিল। তবে ঘুষটুষ খেত না শুনেছি। অনেক ফলোয়ার আছে। আমাদের ইউনিয়নেরও অনেকে চেনে। ওদের কাছেই শুনছিলাম। ব্রতর চাকরিটা ওর বউ যাতে পায় সেজন্যেই চেষ্টা চরিত্র করছে। দিল্লি অবধি ক্যাচ লাগিয়েছে। কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ড। আজকাল হচ্ছে অবশ্য খুবই কম। তবে ব্রতর বাবা খেলছে ভাল। হয়েও যেতে পারে।

বটাদা উঠে গেল।

দীপের হঠাৎ মনে হল, ব্রতর চাকরিটা ওর স্ত্রী পেলে বটাদা যেন খুশি হবে না। কিন্তু ব্রতর স্ত্রীর চাকরি পাওয়াতে বটাদার কী আসে যায়? দীপের অস্বস্তি হতে থাকল। যেন একটা প্রতিযোগিতা। ব্রতর বউয়ের চাকরি মানেই বটাদার চাকরি চলে যাওয়া। ব্রতর পরিবার খেয়ে পরে বাঁচছে, তার অর্থ বটাদা বউ-ছেলে নিয়ে না খেয়ে মরছে। ব্যাপারটা কি এইরকম?

দীপ চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলল। বটাদা নয়, ব্রতও নয়। এখন তিথি এবং তিথি। তিথির কাছে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাওয়াটাই এই মুহূর্তে দীপের কাছে একমাত্র প্রায়োরিটি।

বটাদারা এত দেরি করিয়ে দিল, স্কুটারে হিরোহন্ডা ফিট করেও দীপ পাঁচটার আগে পৌঁছতে পারল না। ভয়ে ভয়ে ছিল, নামতেই তিথি লামার্টস্ অ্যাকসেন্টে ঝড় তুলে দেবে। শুরুতেই টেমপেস্ট, বৃষ্টি নামতে আধঘণ্টা, তারপরেই ঘড়ি দেখে বলবে, ইস্। পৌঁছে আশ্বস্ত হল। না, এখনও পৌঁছয়নি! সত্যি, এতদিন হয়ে গেল, তবু এত ভয় পায় দীপ!

স্কুটারটা দাঁড় করাতে না করাতেই দেখল তিথি নামছে। রাস্তার ওপারে ট্যাক্সি থেকে। ট্যাক্সি? গাড়ি কোথায়?

—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ না? কী করব বলো? বাবার লম্বা মিটিং, বড় গাড়িটা ফেরেনি। ছোটটা নিয়ে মা গেছে ক্লাবে, আজ ক্লাবপার্টি আছে, ফিরতে রাত হবে। আমাদের ওদিকে এই সময়টা, ট্যাক্সি পাওয়া এত ডিফিকাল্ট। সরি, অন্যায় হয়ে গেছে, কান মলছি, চলো ভেতরে গিয়ে পুষিয়ে দেব।

একটা খয়েরি বাঙ্গালোর-সিল্ক পরেছে তিথি, টিপ লাগিয়েছে কপালের অর্ধেকটা বোঝাই করে, চুলগুলো উপনট করে বাঁধা, ঠোঁটে কালো লিপস্টিক। কালো? পড়ন্ত আলোয় ভাল করে দেখল দীপ, না, কালো নয়, শাড়ির পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে চকলেট। সত্যি, পারেও মেয়েটা! এই গরমে পারলে জামাকাপড় খুলে জলে ঝাঁপায় মানুষ, সেখানে বাঙ্গালোর সিল্ক? দেখেই গরম লাগতে শুরু করল দীপের।

গটগট করে ভেতরে ঢুকল তিথি। ওর এইরকমই ধরন। যেখানে যায় রানির মতো গটগট করে ঢোকে, পেছনে ল্যাপডগের মতো পায়ে পায়ে দীপ। রেস্টুরেন্টের সবাই ওদের চেনে, বিশেষ করে তিথিকে। একশো টাকার খেয়ে পঞ্চাশ টাকার টিপ্স দেনেওয়ালা পার্টি এখানে আর ক'টা আসে? তিথি বলে, টিপস্টা কেবিনভাড়া। ওদের পছন্দের পর্দাঢাকা কেবিনটায় যে আনডিস্টার্বড্ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসতে দেয়, সেটারও কিছু মজুরি আছে।

পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকেই দীপ কিছু বোঝার আগেই তিথি ছোট করে পুষিয়ে দিল। দীপ ঠোঁট মুছে বলল, এটা যেমন বিস্কিরি দেখতে তেমনিই বিস্বাদ। এর চেয়ে ভাল কিছু জুটল না?

—তুমি একটা গাঁইয়া। এখন এটারই চল। দেখোনি, রেখা থেকে ঋতুপর্ণা সকলের ঠোঁটেই এখন এই জিনিস। অ্যাডজাস্ট করো, মানিয়ে নাও। এখন থেকে এটাকেই টেস্টি বলতে শেখো।

মুখ গম্ভীর করে দীপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল হানিফ। ও-ই ওদের বাঁধা স্টুয়ার্ড। তিথিও ঝটপট ওর বাঁধা মেনু আউড়ে গেল। দীপ অনেকবার বলেছে, মোগলাই পরোটা জিনিসটা ভীষণ গ্রাম্য, মফস্বল শহরে গেলে দেখবে রেস্টুরেন্টগুলোয় অর্ধেক অর্ডারই মোগলাই পরোটার। তিথি অন্য যুক্তি দেখিয়েছে—যাই অর্ডার দাও, জিনিসটা সেমি-প্রিপেয়ার্ড থাকে, ঝটাকসে বানিয়ে এনে দেয়; মোগলাই পরোটা অর্ডার এখানে কম আসে, বানিয়ে দিতে হয়, সময় লাগে প্রিপেয়ার করতে, অতএব অনেকক্ষণ বসে থাকা যায়।

—কতদিন পর তোমাকে দেখলাম বলো তো? দাঁড়াও, একটু ভাল করে দেখে নিই, বলে পাশ থেকে ঘাড় হেলিয়ে দীপকে দেখবার ভান করল তিথি, তারপর কাঁধে মাথা রেখে বলল, ক'দিন প্রায় বসে থেকে মুটিয়েছ খানিকটা, আর চড়া রোদে স্কুটার চালিয়ে রংটা পুড়িয়ে ফেলেছ। আমার কোনও চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ?

দীপ দেখার চেষ্টা করল, তুমিও মনে হয় কালো হয়েছ?

—কালো? আরও? কী হবে? লোকে অন্ধকারে তো এবার খুঁজেই পাবে না? সত্যি বলো, খুব কালো হয়েছি?

—খুব নয়, সামান্য। সি-বিচে খুব ঘুরেছ বোঝা যাচ্ছে। একা, না সঙ্গে কেউ ছিল?

—ছিলই তো! গোয়ানিজ ছেলেগুলো কি স্মার্ট! সবসময় গান গাইছে, আর গানের সঙ্গে নাচ। ওখানে একটা প্রোগ্রাম হয়, নদীতে জলের ওপর জাহাজ ভাসিয়ে তার ওপর গান আর নাচ। তাই দেখতে দেশবিদেশ থেকে লোকজন আসে। কী যে অসাধারণ, যদি দেখতে!

—তুমিও নেচেছ?

—নাচবই তো! আমাকে স্টেজে ডেকে নিল ওরা। তারপর নাচ। ছাড়তেই চায় না। ওদের মেয়েগুলো কেমন আনস্মার্ট! পারেও না ভাল। ভাবছিলাম থেকে যাই।

—থেকে গেলেই পারতে!

—ভালই হত বলো। একটা গোয়ানিজ ছেলেকে বিয়ে-টিয়ে করে জাহাজে নাচ দেখিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতাম।

—এলে কেন?

—এলাম তোমার জন্যে, নাকটা জোরে টিপে দিল তিথি, কোথায় কে তোমাকে এর মধ্যে খেয়ে রেখে দিল, তাড়াতাড়ি না ফিরলে চলে?...হ্যাঁগো, এর মধ্যে দেখা করেছিল?

—কে?

—ন্যাকা। জানো না যেন। সেই যে, আমাদের বাড়িতে, তোমার অ্যাড্রেস চাইল, ভুলে গেলে? নাটক করছ? এর মধ্যে তলে তলে...

এই জন্যেই তিথিকে এত ভাল লাগে দীপের। যেন দীপ ওর সম্পত্তি হয়ে গেছে। সবসময় একটা হারাই হারাই ভাব! তিথিকে আর একবার আদর করার ইচ্ছাটা যখন খুব তীব্র হয়েছে, হানিফ আবার মুণ্ডু গলাল, পরোটা রেডি, দিয়ে দিই?...সঙ্গে কী দেব? কোল্ড কফি?

—হ্যাঁ, কোল্ড কফিই ভাল, যা গরম, একটু পরে দিও হানিফ। খেয়ে নিই।

হানিফ খাবার আনতে গেল, তিথি দীপের দিকে ফিরল, কী হল, জবাব দিচ্ছ না যে বড়। ডাল মে কুছ হ্যায়? সত্যিই অ্যাপো করা শুরু করে দিলে নাকি? ঝেড়ে কাশো তো মিস্টার দীপনারায়ণ।

হেসে ফেলল দীপ, নিজে কত কী করে এলে তার বেলা?

—আমি যা-ই করি না কেন তোমার দেখার দরকার নেই। তোমার করা বারণ। মনে থাকবে কথাটা?

দীপ বাধ্য ছেলের মতো মাথা নামিয়ে ঘাড় হেলায়।

হানিফ ততক্ষণে প্লেট সাজিয়ে ফেলেছে।

তিথি গম্ভীর হয়েছিল। দীপ জানে এই মেয়েটার গাম্ভীর্যের ঘোমটাটা সরিয়ে ফেলতে এক মিনিটও লাগে না।

—শুধু তো নদীতে বেড়ানোটাই বললে, সমুদ্র?

—রিভারক্রুজটাই দারুণ! ফ্যাবিউলাস! সবচেয়ে মনে দাগ কাটে। সমুদ্র তো অন্য জায়গাতেও দেখেছি। তবে, যেখানে ছিলাম সেটাও ভীষণ সুন্দর। ওদের নিজস্ব একটা বিচ আছে জানো! আনজুমা বিচের একটা পার্ট। শান্ত নিরিবিলি। সমুদ্রটাও শান্ত। পোষা বেড়ালের মতো। পায়ের কাছে গড়াগড়ি দেয়। মাথায় হাত বুলনো যায়। তবে ভীষণ চড়া রোদ। স্নান করে উঠে বেশিক্ষণ বালিতে গড়াগড়ি দেওয়া যায় না, গা পুড়ে যায়।

—ফরেনার দেখনি? তারা নাকি পোশাক-আসাকের বাড়াবাড়ি মোটেও পছন্দ করে না?

দেখব না আবার? টল হ্যান্ডসাম সব ছেলে। সঙ্গে অবশ্য মেয়েও আছে। ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আবার ক্লান্ত হয়ে বালিতে শুয়ে থাকছে।

—ছেলেগুলোকে দেখতে খারাপ লাগছিল না বলো?

—কেন লাগবে? ওইরকম ফিজিক! খুব ম্যানলি!

ভীষণ গরম। খেয়াল করেনি, অনেকখানি মুখের মধ্যে পুরে ফেলেছিল, তাড়াতাড়ি বের করে উঃ আঃ করতে লাগল।

—দেখলে তো, যতটুকু গিলতে পারো ততটুকুই মুখে ঢোকাতে হয়, বেশিও নয়, কমও নয়।

ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, ফুঁ দিতে দিতে আবার মুখে ঢুকিয়ে দীপের কী যেন মনে পড়ে গেল। তিথির দিকে অনেকখানি ঘুরে চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, ক'দিন ধরেই জিজ্ঞেস করব ভাবছি, তাড়াতাড়ি নেই, ভেবে উত্তর দিও।

তিথি একটু অবাকই হল। দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, বলো।

—ধরো, যদি তোমার বাবা তোমার বিয়ের ঠিক করেন, তোমার পছন্দ নয় এমন কারও সঙ্গে, পাত্র তোমার চেয়ে অনেক বড়, এমনও হতে পারে তার আগে একবার বিয়েও হয়েছিল, তুমি রাজি হবে?

তিথি এক মুহূর্তও সময় নিল না, এতে আর ভাবাভাবির কী আছে? করব না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে কোনওভাবেই আমাকে রাজি করাতে পারবে না বাবা। যার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাব, তার চয়েসের ব্যাপারে কোনও কম্প্রোমাইজ করলে চলে? এখানে আমার সিদ্ধান্তই শেষ এবং ফাইনাল।

সিদ্ধান্তটা ঝট করে এনডোর্স করে নিল তিথি। হানিফ আবার আইসক্রিম বা অন্য কিছু লাগবে কিনা জানতে পরদা টেনে ঢোকার আগেই।

দীপের ভাল লাগছিল। বাসন্তীর থেকে তিথি কতদূর এগিয়ে এসেছে! আর অন্য কারও ভয়ে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয় না। এর কারণ কি ইকনমিক ইনডিপেনডেন্স, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা?

দীপ তবুও আর একবার খোঁচাল, ধরো আমাকে বিয়ে করতে গিয়ে যদি তোমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়?

—তা কেন হবে? বিয়েটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। তার জন্যে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে কেন?

—আমাদের বিয়ে তোমার বাবা-মা যদি মেনে না নেন। বলেন, করতে হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েই বিয়ে করতে হবে।

—ফার্স্টলি আমার বাবা-মা সেরকম মানুষই নয়। ওরা আমাকে ভীষণ ভালবাসে। তাছাড়া, আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।...আচ্ছা তুমি ভাবছ কেন, তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা আমার বাড়িতে কেউ মেনে নেবে না?

দীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে দূরে তাকায়। কেবিনের পর্দায় দৃষ্টি আটকে যায়। তিথির দিকে না তাকিয়েই বলে, তোমার মনে আছে, আমাদের দেশের বাড়ি সেই চিলেকোঠা, আমাদের ব্যাপারটা...

বলতে বলতে তিথির দিকে চোখ পড়তে দীপ দেখল তিথি খুব নরম চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কোন ব্যাপারটা গো?

হেসে তিথির হাতে হাত রেখে দীপ বলল, দুষ্টু মেয়ে...তা সেই ঘরে একটা ট্রাঙ্ক ছিল, পায়ে লেগে গেল, একটা ডায়েরি বেরিয়ে এল, সেই ডায়েরিটা জোগাড় করে আমি পড়তে শুরু করেছি। সেটা একজন মেয়ের লেখা। তার ভাষায়, নিজের কথা। পড়তে এত অদ্ভুত লাগছে, ভাবলাম তোমাকে জিজ্ঞেস করি।

—কেমন মেয়ে? ইয়াং? কিউট?

—দেখিনি, তাই বলতে পারব না। তবে জমিদার বাড়ির মেয়ে তো, কিউট হওয়াই স্বাভাবিক। আর ইয়াং কিনা? হ্যাঁ, লিখেছে যখন তখন ইয়াং তো ছিলই। তবে বেঁচে থাকলে এতদিনে আশি-টাশি ছাড়িয়ে যেত।

—ইন্টারেস্টিং! সেই যুগে ডায়েরি লেখা? কী লিখেছেন তিনি?

—এইসব কথা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে। ছোটবেলা। মা মারা যাওয়া। সৎমা। গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া। সব পড়া হয়নি। পড়তে শুরু করেছি। কিন্তু বেশ হন্ট করছে। মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না।

—দেখো আবার প্রেমে পড়ে যেও না যেন। তোমার যা রোগ!

—যদি যাইও, কী এমন ক্ষতি হবে শুনি? তোমার মতো যেখানে সেখানে ম্যানলি আর হ্যান্ডসাম ছেলে দেখলেই গলে তো যাই না। এইক্ষেত্রে আমার প্রেমিকা হবে একজন সিনিয়ার সিটিজেন, এইটি প্লাস।

—আটই হোক আর এইটি, আমার কিছু যায় আসে না, বুঝেছ? চলো, কটা বাজে খেয়াল আছে? আজ আমার গাড়ি নেই, পৌঁছে দিতে হবে।

স্কুটারে তিথি এমন জড়িয়ে ধরে বসে থাকে, দীপের শরীর ঝিমঝিম করে। ভুলভাল হয়ে যায়। কোন্‌দিন অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে।

তিথিদের ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে পৌঁছে তিথিকে নামাতে গিয়েই একটা চেঁচামেচি কানে এল। গলাটা চেনাচেনা। বেসমেন্টে গ্যারেজের ভেতর থেকে গোলমালটা আসছে। তিথি এগিয়ে গেল। পেছন পেছন দীপও।

—শালা, নবাবী হচ্ছে? যখন তখন ছুটি? কাল কিসের ছুটি রে? সপ্তাহে ক'দিন ছুটি লাগে?

—বললাম না, ছেলেটার জ্বর, ডাক্তার দেখাতে হবে।

—কটা ছেলে তোর? বছর বছর পয়দা হচ্ছে। খেতে দেবার মুরোদ নেই, বাচ্চা পয়দা করছে।

—মুখ সামলে কথা বলবেন। আপনার বাবার খেয়ে বাচ্চা পয়দা করছি? মাইনে দিচ্ছেন, সকাল থেকে রাত অবধি খেটে পয়সা তিনগুণ উশুল করে দিচ্ছি। ভদ্দরলোক। শালা অমন ভদ্দরলোকের মুখে পেচ্ছাপ করি।

ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল লোকটা। তিথিদের ড্রাইভার। পেছন পেছন কষে ফেনা তুলতে তুলতে তিথির বাবা, —যা যা, পয়সা ফেললে তোর মতো দশটা ড্রাইভার পায়ের ওপর লুটোপুটি খাবে। রোয়াবি হচ্ছে? যা, কাল থেকে তোর চাকরি খতম।

দাঁড়াতে পারছেন না। বিল্ডিং-এর সিকিওরিটির ছেলেটা পেছন থেকে ধরে রেখেছে। অল্প আলোয় খেয়াল করেননি, হঠাৎই তিথির দিকে চোখ পড়ল, —এই যে এতক্ষণে বাড়ি আসা হল? কোথায় ছেনালি হচ্ছিল মা-জননী? যেমন মা তার তেমনি মেয়ে।

দীপের দিকে একবারও না তাকিয়ে ছুটে লিফটের দিকে চলে গেল তিথি। দীপও পেছন ফিরল। দাঁড়িয়ে থাকলে দু'য়েকটা বাছাবাছা খিস্তি দীপেরও জুটে যেতে পারে।

স্কুটারে লাথি মেরে ছিটকে রাস্তায় পড়ে হঠাৎই হাসি পেয়ে গেল দীপের।

মনে হল, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সবকটা লুই ফিলিপ-ভ্যান হিউসেন খুলে নিলে দেখা যাবে ভেতরের গেঞ্জি রসময় মুদির মতো তেলচিটে আর ময়লা, মোজায় পচা গন্ধ।

স্কুটারে স্পিড বাড়াল দীপ, গন্ধটা যাতে তাড়াতাড়ি পেছনে সরে যায়।

"সানাই বাজিল, শঙ্খ বাজিল, উলুধ্বনি হইল। আত্মীয়স্বজন সমাগমে বাড়ি গমগম করিতে লাগিল। নতুন শাড়ি, মূল্যবান বেনারসীই বেশি, এত ভারী আর গরম, পরিয়া নড়াচড়া করাই দায়। চাপাইয়া গলদঘর্ম হইয়া সকলে কাজ থাকুক না থাকুক হন্তদন্ত হইয়া ব্যস্ততার ভান করিতে লাগিল। ও পক্ষ হইতে গায়ে-হলুদের তত্ত্ব আসিল। মানদামাসি আমার গায়ে হলুদ ছোঁয়াইয়া স্নানের ঘরে চলিল। এতদিন পুকুরঘাটে স্নান সারিতাম। এখন থেকে ঘেরা আড়াল দেওয়া স্নানঘরে। স্নান করাইতে করাইতে মাসি অনেক উপদেশ দিল। কিছু জানিতাম, কিছু আন্দাজ করিতাম, যেটুকু অস্পষ্ট ছিল তাহাও মাসি বুঝাইয়া দিল। চুপচাপ শুনিলাম।

চুপচাপ, কারণ আমার ভিতরে কী হইতেছিল আমি ছাড়া কেহই জানিল না। মাসি কিছুটা আন্দাজ করিতে পারিয়াছিল। হাজার হোক সেইভাবে বলিতে গেলে আমি তো মাসির হাতেই মানুষ। কিন্তু আভাসেও প্রকাশ করে নাই। যদি আমারও বাঁধ ভাঙিয়া যায়! কিছু করিয়া বসি।

বিবাহ নয়, উৎসব নয়, যেন বধ্যভূমি। যেন বলির জন্য স্নান করাইয়া কচিকচি বটপাতা খাওয়াইয়া আমাকে প্রস্তুত করা হইতেছে। উলু নয়, শঙ্খ নয়, সানাই নয়, ঢাকের বাদ্যি কানে আসিতেছিল। সন্ধিপূজার ঘণ্টাধ্বনি, সবকিছু ছাপাইয়া একটি ছাগশিশুর মর্মস্পর্শী আর্তনাদ। মা মা ডাক ছাড়িয়া হাতে খড়্গ লইয়া পাশে গিয়া দাঁড়াইল সন্তোষ। চক্ষু লাল, কালো পেশিবহুল চেহারা। এককোপে না কাটিলে ফের অমঙ্গল। খড়্গ উঠিল। তুমুল কলরোলে ছাগশিশুর আর্তনাদ চাপা পড়িয়া গেল। উত্তেজিত মানুষ রক্তের ফোঁটা কপালে মাখিয়া পূজায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

দৃশ্যটা একবারই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। রাতে কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছিল। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিয়াছিলাম। প্রলাপের মধ্যে কী বলিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু তার পর হইতে আমার সন্ধিপূজা দেখা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। তবু ওই বীভৎস দৃশ্য মনের ভিতরে গাঁথিয়া গিয়াছিল। দৃশ্যটা বারবারই ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তফাতের মধ্যে সন্তোষের স্থলে এক্ষেত্রে খাঁড়া হাতে বাবামহাশয়।

বাবামহাশয়ও কি শেষের দিকে অন্যরকম ভাবিতেছিলেন? অসম্ভব নয়। কারণ বিবাহের দিন তাঁহাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখিতেছিলাম। বারবারই আমার কাছে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতেছিলেন। আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আমার চোখের মধ্যে কী যেন খুঁজিতেছিলেন। অন্যরা লক্ষ করে নাই। শুধু আমিই দেখিয়াছিলাম। অবশেষে সেই মুহূর্ত আসিল। যে মুহূর্তটি যে-কোনও নারীই যৌবনসমাগমের ক্ষণ হইতে বহুবার স্বপ্নে দেখিয়াছে, দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে। যে মুহূর্তটির জন্যে বালিকা কৈশোর হইতে যৌবন পার হইয়াও অপেক্ষা করিয়া থাকে।

একটি কাপড় দু'জনের মাথার উপর ওড়নার মতো ঢাকিয়া দেওয়া হইল। উলুধ্বনিতে কান পাতা দায়। আশপাশ হইতে প্রায় অশ্লীল নানাবিধ মন্তব্য উড়িয়া আসিতেছে। তাহারই মধ্য হইতে কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে কোনওমতে চোখ তুলিয়া সামনে তাকাইলাম।

শুভদৃষ্টি! গোঁফদাড়ির জঙ্গল পার হইয়া প্রায়বৃদ্ধ মানুষটির চোখদুটি খুঁজিয়া পাইতে অনেক বিলম্ব হইল। সেখানে দেখিলাম, না, বাসনা দেখিতাম যদি, কামনা বা লালসাও, মনে ভাবিতাম, যাক, মানুষটা আমাকে দেখিয়া উত্তেজিত হইতেছে। দেখিলাম মরা মাছের মতো সাদা নিষ্প্রভ একটি দৃষ্টি, যেন ঘুম আসিতেছে, জোর করিয়া দু'টি চোখ খুলিয়া রাখা হইয়াছে, যেন এই শুভদৃষ্টির পরেই তাহারা বন্ধ হইয়া যাইবে, হাজার ডাকাডাকিতেও আর খুলিবে না।

চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। আমারও দুই চক্ষু যদি আর না খুলিত!

বাসরশয্যা অবধি জাগিতে পারিলেন না আমার স্বামী, ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার পাকা চুল পাকা দাড়ি ও প্রচণ্ড নাসিকাগর্জন পাশে লইয়া নানাবিধ রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে বাসর জাগিয়া কাটাইলাম।

পরদিন কালরাত্রি। সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। পূর্বের ব্যবস্থাক্রমে বউভাতের বন্দোবস্ত আমাদের বাড়িতেই হইয়াছে। একসময় একটি বদ্ধ ঘরে আমরা স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি হইলাম। নিকটেই একটি শয্যা, তাহার উপরে-নীচে-বাজুতে-ছত্রীতে ফুলের সমারোহ। কক্ষটি গোলাপগন্ধে আমোদিত। আড়ি পাতিবার ভয়ে জানলা আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, দরজা বন্ধ করিয়া উনি আসিয়া বসিলেন সামান্য দূরত্বে। আমি বেশবাস ও গহনার ভারে জড়সড় হইয়া অপেক্ষা করিতেছি আমার জীবনের একটি প্রতীক্ষিত মুহূর্তের জন্য।

চোখ বন্ধ করিয়া ছিলাম। চোখ খুলিলাম অবাক হইয়া, অমন দাড়িগোঁফওয়ালা মানুষটি কথা বলিতেছেন, গলার স্বর মেয়েদের মতো। দেখিলাম মানুষটি আমার পায়ের কাছে বসিয়া করজোড়ে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন।

কথাগুলি আজও আমার মনে আছে।

—শোন, আমি কালীসাধক। মা কালীর পায়ে উৎসর্গীকৃত। সাধন-ভজনেই আমার দিনাতিপাত হয়। তোমার বাবার অনুরোধে আমি তোমাদের কুলরক্ষা করেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনও শারীরিক সম্পর্ক থাকবে না। তুমি হবে আমার সাধনসঙ্গিনী। রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়। বলিয়া আর সময়ক্ষেপ না করিয়া তিনি অবিলম্বে শয্যাগ্রহণ করিয়া নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। আমি বজ্রাহতের মতো বসিয়া রহিলাম।

সারাটা রাত কাটিল বিনিদ্র অবস্থায়। মনে হইতে লাগিল এই রাতটি শেষ রাত নয়, প্রথম রাত। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব প্রহরে প্রহরে শৃগালের ডাক, রাতচরা পাখির চিৎকার ও অসংখ্য নিদ্রাহীন নক্ষত্রকে সঙ্গে করিয়া এইভাবে জাগিয়া জাগিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইবে। প্রার্থনা করিলাম এই রাত্রিটিই যেন আমার জীবনের শেষ রাত্রি হয়।

তবু নিদ্রা আসে। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা বাতাস ও সারাদিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির জন্য চোখের পাতা বোধহয় লাগিয়া আসিয়াছিল, চটকা ভাঙিয়া গেল মন্ত্রোচ্চারণে। উদিত সূর্যকে সাক্ষী রাখিয়া উনি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেছেন। আমি উঠিয়াছি দেখিয়া আমাকে ইশারায় ইঙ্গিত করিলেন। আমিও করজোড়ে সূর্যপ্রণাম করিলাম।

উনি দরজা খুলিবার জন্যে উঠিয়া যাইতেছিলেন, আমি কথা বলিলাম। আমার প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ। আপনি যে কথাগুলি আমাকে বললেন, সেগুলি কি বাবামশাই জানেন?

একটু দ্বিধা করিলেন উনি, তারপর বলিলেন, না। বলিয়াই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একটি উষা তাহার সমস্ত আলো, পাখির ডাক ও সম্ভাবনা লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। কী করিয়া আমি জনসমক্ষে মুখ দেখাইব? কী বলিব সকলকে?

আমার মধ্যে যে অত বড় একজন অভিনেত্রী লুকাইয়াছিল, আমি নিজেই কখনও টের পাই নাই। ইচ্ছা করিয়া জামাকাপড় আলুথালু করিয়া নিলাম, সিন্দুরের টিপটা ধ্যাবড়াইয়া দিলাম, তারপর যাহারা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের মুখ দেখাইলাম। তাহারা অনুমান করিয়া লইল, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করিল, সুর করিয়া গান বাঁধিল, তারপর যে যার কাজে চলিয়া গেল।

ঠকাইতে পারি নাই মানদামাসিকে। কোলে টানিয়া লইয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইল। আর বাবামশাই। বারবার কাছে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া কী যেন বলিতে গিয়াও না পারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

আত্মীয়স্বজন বিদায় নিলেই আমার স্বামী আমাদের বাড়ির একাংশ তাঁহার সাধনপীঠ বানাইয়া ফেলিলেন। যাগযজ্ঞ-মন্ত্রোচ্চারণ-হোম। সকাল-সন্ধ্যা আরতি। পট্টবস্ত্র, রুদ্রাক্ষ। এবং যা না থাকিলে শাক্তবিধি অনুসারে পূজা হয় না, অন্তত তাঁহার মতে, তা-ই, অর্থাৎ কারণবারি। পরে দেখিলাম গঞ্জিকাও। রাতে অধিকাংশ দিনই ঘরে আসিতেন নিদ্রিত অবস্থায়। কোলে করিয়া আনিয়া শোয়াইয়া চাকরবাকরেরা চলিয়া যাইত। আমি জাগিয়া বসিয়া পাহারা দিতাম।

মানদামাসি আমার মুখোমুখি হইত না, বাবামহাশয় পালাইয়া বেড়াইতেন। রাত্রিটি একলা অতিবাহিত করিতাম। দিনেও একা হইয়া গেলাম।

এর মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটিল। আমার একটি ভাই জন্মিল। আমার বিমাতা আমার বিবাহের সময়ই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া সকলকে সুখী করিলেন। বাবামহাশয়ের মুখেও অন্ধকার সামান্য কাটিয়াছে

দেখিয়া আমারও স্বস্তি হইল।

পারুকেও বাবামহাশয় আর আমার দুরবস্থা দেখিবার জন্য বাড়িতে রাখিতে ভরসা পাইলেন না। মনে হয় বিমাতার সঙ্গেও তাহার বনিবনা হইতেছিল না। এবারে কমবয়সী রূপবান কৃতী একটি পাত্র নির্বাচিত করিয়া বাবামহাশয় পারুর বিবাহ দিলেন, যদিও পাত্রটি কুলগৌরবে আমাদের চেয়ে কিঞ্চিৎ খাটো।

আমাদেরও দাম্পত্য সম্পর্কে কিছু নূতন আলোকসম্পাত ঘটিতে লাগিল।

আমার স্বামী তাঁহার গুরুদেবের কথা প্রায়ই বলিতেন। তিনি নাকি সিদ্ধপুরুষ। অনেক শুনিয়াছিলাম, শেষে দেখিলাম। বয়েসে আমার স্বামী অপেক্ষা খুব যে বৃদ্ধ তা নন। কিন্তু দু'জনের যে জায়গাটায় আসল তফাৎ সেটা চোখের দৃষ্টি। প্রথমদিন দেখিয়াই বুঝিলাম, এই মানুষটির চোখে কামনা থিকথিক করিতেছে, পার্থিব বাসনা ইহার নিবৃত্ত হয় নাই, সিদ্ধপুরুষ কিনা জানি না, সিদ্ধকাম যে নন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

সারাদিন গুরুদেব-ভজনা করিলেন স্বামী। তাঁহার নির্দেশমত খাবারদাবার ও অন্যান্য সমস্ত উপচারই আমি গুরুগৃহে প্রেরণ করিলাম। রাতে স্বামী আসিয়া যাহা আদেশ করিলেন তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমাকে গুরুর কাছে রাতে শয়ন করিতে হইবে। এবারে আমি বিদ্রোহ করিলাম, আপনি স্বামী, আপনার সহিত শয়ন আমার ধর্ম। কিন্তু এ কী বলিতেছেন?

স্বামী বলিলেন, এই পদ্ধতিও ধর্মস্বীকৃত, ইহাকে নিয়োগপ্রথা বলা হয়।

বলিলাম, কেন, আপনি নিজে সুস্থ থাকিতে নিয়োগপ্রথার প্রয়োজন কেন?

স্বামী জবাব না দিয়া আভাসে যা বুঝাইলেন তাহাতে আমার পায়ের নীচে মাটি থাকিল না। আমার স্বামী অক্ষম। আমি কেন, কোনও নারীর সহিতই সহবাসের ক্ষমতা তাঁহার নাই। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরেও আমাকে রাজি করাইতে না পারিয়া স্বামী বলপ্রয়োগ করিলেন। তখন আমি বলিলাম, এবার তাহলে বাবামশাইকে ডাকি, তাঁর সামনেই প্রস্তাবটা পাড়ুন।

পরদিন সকালেই গুরুদেব বিদায় নিলেন।

আমারও জীবন হইতে শেষ আশার আলোটুকুও অন্তর্হিত হইল। এতদিন সব সহ্য করিতে ছিলাম, বুক বাঁধিয়া ছিলাম এই আশায়, একদিন না একদিন স্বামীর মতি ফিরিবে, তিনি আমার দিকে মুখ ফিরাইবেন। কোথায় কী? এই শালগ্রামশিলা এ-পাশ ফিরিলেও যা ও-পাশ ফিরিলেও তা। নামকাওয়াস্তে বিবাহ। বিবাহিত হইয়াও কুমারী রহিয়া গেলাম।

একবার মনে হইয়াছিল গেলেই বেশ হত। গুরুদেব আবার কী? একজন পুরুষমানুষ বই তো নয়। ওনার মতো দাড়িগোঁফ দেখানো মেকী পুরুষ তো নয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, কে গুরুদেব? ওনার গুরুদেব। আমার কে? কেন তাঁহাকে আমার সবকিছু নৈবেদ্য সাজাইয়া মুখের কাছে ধরিব? আমার স্বামীর আদেশে? কোন স্বামী? স্বামীর কোন্ কর্তব্যটা করিয়াছেন তিনি? তাঁহার আবার আদেশ? যদি সত্যই কখনও পরপুরুষে গমন করিতে হয় নিজের ইচ্ছায় নিজের পছন্দমতো পুরুষে করিব।

লোকদেখানো সম্পর্কটুকু রহিল। একই গৃহ, ভিন্ন শয্যা। জনান্তে কথাবার্তাও বন্ধ হইয়া গেল। দিনরাত ভাবি এই জীবন, এই অসহ্য বেদনা আর কত কাল? বৈধব্যও ইহার চেয়ে ভাল। বৈধব্যে কৃচ্ছ্রসাধন আছে, কিন্তু তঞ্চকতা নাই। লোকটিকে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

ডায়েরি বন্ধ করল দীপ। একটানা পড়ে যাচ্ছিল। যেন লেখাটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বানান ভুল আছে, গুরুচণ্ডালী দোষ আছে। কমলবাবু পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে চোখ তুলে বলতেন, বি চৌধুরীর নোটে পুকুরের জল পাইল করেছিস। হয় সাধু না হয় চলিত, যে কোনওটা বাছবি। দুটো একসঙ্গে নৈব নৈব চ। অথচ এই ডায়েরি পড়তে গিয়ে দীপের মনে হল সাধুভাষাতেও চমৎকার কথ্য শব্দ এই নারী কী অক্লেশে ব্যবহার করেছে, কোথাও হোঁচট খেতে হয় না।

বুকের ভেতরে একটা কষ্ট পাক খাচ্ছিল। আশ্চর্য নিরাসক্তিতে যেন অন্য কারও গল্প বলছে এইভাবে 'নিজের কথা' শুনিয়ে যাচ্ছে এক রমণী। যাকে ঠকানো হয়েছে। যে প্রতিবাদ করছে। নিজের ভাষায়। নিজের মতো করে। দীপ যেন শ্রদ্ধা করতে শুরু করছে সেই অজানা নারীকে।

ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল দীপ। পাশের ঘরে বাবা-মা ঘুমিয়ে রয়েছে। বাবাকে ধোলাই করাই এখন মা-র ফেভারিট পাসটাইম, সুদে-আসলে সব শোধ নিচ্ছে, তবু রাতে একসঙ্গে একঘরে দরজা বন্ধ করে না শুলে ওদের ঘুম হয় না। একদিনের জন্যও একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারে না। মা কি কখনও বিদ্রোহের কথা ভেবেছিল?

সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল দীপের। রাত্তিরে ফোন করে তিথি বলেছিল, বাবাটা এমনিতে দারুণ সুইট জানো, শুধু একটু টিপসি হয়ে গেলেই ওরকম করে। তুমি কিছু মনে করনি তো?

তিথি নয়, অন্য আর একজনকে ভাবছিল দীপ। তার কোনও বিদ্রোহ ছিল না। তবু দীপ যেন ভাবনা থেকে সেই মানুষটাকে সরাতে পারছিল না।

ছাদে উঠে এল। তার নিজস্ব শব্দ ও নৈঃশব্দ্য, আলো ও অন্ধকার, নিরুচ্চার উপস্থিতি নিয়ে রাত্রিটি জেগে রয়েছে। ওপরে তাকাল দীপ।

দরজা খুলেই পাশে সরে গিয়েছিল। বারীন আগে ঢুকেছিলেন। পেছন পেছন দীপ। প্রথমে খেয়াল করেনি। পেরিয়ে ঘুরে দেখেছিল।

—রাত্রি মা, এ হচ্ছে ভরত বন্ধু, ওর সহকর্মী, একই অফিসে কাজ করে। ওর নাম...দেখেছ, এতক্ষণ কথা বলছি, নামটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি!

—দীপ।

রান্নাঘরের দরজার পাশে বাজারের ব্যাগটা নামিয়ে রাখছিলেন বারীন। না ঘুরেই বললেন, আগে আমরা নাম জিজ্ঞেস করলে পদবিসুদ্ধ নামধাম গড়গড় করে আউড়ে যেতাম। আজকাল কত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, শুধু দীপ।

দীপ লজ্জা পেল। ভুল হয়ে গেছে। মূল্যবোধ এইখানে পঞ্চাশ বছর আগে থমকে আছে। এখানে সে শুধু দীপ নয়।

—দীপনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

—বাঃ। আজকাল এত লম্বাচওড়া নাম দেখা যায় না। সেইজন্যেই লেজ খসতে খসতে শুধু দীপটুকু পড়ে আছে। বেশ, গঙ্গোপাধ্যায়, সাবর্ণ গোত্র, রাঢ়ী শ্রেণী।

দীপের মনে পড়ল, কিছুদিন পৈতে রেখেছিল। বাবা সামনে বসে সকাল-সন্ধ্যা পাখি-পড়াত—'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ'। কবে উড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দ্বিজত্ব এখন ওই নামের পেছনটুকুতেই বর্তমান।

বারান্দায় চেয়ার টেনে বসতে বসতে গলা নামালেন বারীন, তুমি এলে, তাই ওই হতভাগার নামটা এতদিন পরে এ-বাড়িতে উচ্চারণ হল। না হলে ওর নাম করাও নিষিদ্ধ।

দীপের বুঝতে দেরি হল—ব্রত।

—রাত্রি মা, আমার দাদুভাই কোথায়?

—কাল সারাটা সন্ধে একফোঁটা বই নিয়ে বসেনি। আজ আর বেরুতে দিইনি। সকালটা অন্তত পড়ুক, বিকেলে তো আর আটকাতে পারব না। আর সন্ধেবেলা...

—সন্ধেবেলা দাদুভাই আমার কাছে বসে গল্প শোনে, বারীন দীপের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, অবশ্য ছুটির দিনে। মা'র আমার কড়া শাসন। এতটুকু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। আমরা দুই ছেলে দু'জনেই সবসময় ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকি। একজনই শুধু কোনও কথা শুনবে না ঠিক করেছিল, শেষ কথাগুলো গলা নিচু করে বললেন বারীন।

পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেছিলেন, রাত্রি এসে বলল, গেঞ্জিটাও ভিজে গেছে বাবা, খুলে ফেলো। আমাকে দাও, আমি জলকাচা করে তারে টাঙিয়ে দিচ্ছি, দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

—দুপুরের আর দেরি আছে কি? গেঞ্জিটা মাথা দিয়ে গলাতে গলাতে বারীন বললেন, তা রাত্রি মা, আমাদের আজ ছুটির দিনের মেনু কী?

—খাবার সময়েই দেখতে পাবে। রাত্রি রান্নাঘরে ঢুকে গেল বাজারের থলি হাতে।

—আমি কিন্তু আগেই বলে রেখেছি, আজ ধোঁকার ডালনা খাব, গরমমশলা দিয়ে রগরগে করে। না হলে কিন্তু খাবার সময় কুরুক্ষেত্র হবে।

রান্নাঘর থেকে কোনও জবাব এল না। বারীন চোখ টিপলেন, মাছ খাবে না, ডিম খাবে না, মাংস খাবে না। ডালটাও পেটে না গেলে চলে? প্রোটিন খাওয়াও তো জরুরি।

রাত্রি ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, হাতে দু'জনের চা, বাটিতে মুড়ি আর গরম তেলেভাজা।

ডালের কত দাম হয়েছে খেয়াল আছে? এ মাসে সপ্তাহে দু' দিনের বেশি ডাল হবে না।

—দেখেছ, মেয়েটা পয়সার খোঁটা দিয়ে গেল। ওরে মেয়ে, এখনও যে কটা টাকা পেনশন পাই তা দিয়ে সপ্তাহে দু' দিন কেন, চার দিন ডাল খাওয়া চলতে পারে।

রাত্রি হেসে বৃদ্ধর মাথার চুল টেনে বলল, ঠিক আছে চার দিন, ব্যস, তার বেশি নয়, মনে থাকবে তো?

—তুমি মহারানি, যা বলবে মেনে নিয়ে আমাদের উপায় আছে?

—বেশ, তাহলে এখন যা বলছি, চুপচাপ শুনে নাও, মুড়িকটা খেয়ে ঝটপট স্নান করে এসো। বেলা হয়ে গেছে, এরপর জল চলে যাবে।

বাধ্য ছেলের মতো মুড়ি খেলেন বারীন। তারপর স্নান করতে উঠে

গেলেন।

রাত্রি মোড়া টেনে বসল দরত্ব রেখে।

এতক্ষণে ভাল করে দেখল দীপ। কেমন দেখতে জিজ্ঞেস করলে এখনও ভাল করে বলতে পারবে না। নাক-চোখ-মুখ সবই ঠিকঠাক, হাইট মাঝারি, ছোট কপালের ওপর চুল এসে পড়েছে, ঠোঁটের ওপর কয়েকফোঁটা ঘাম, স্নান করেছে সদ্য, একটা মৃদু গন্ধ ঘিরে আছে শরীর। সৌন্দর্য? বলা যাবে না। বরং স্নিগ্ধতা। স্কুলের মেয়েদের মতো ছোট পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি, আর বিবর্ণ সিঁথি। এইটুকু বাদ দিলে নিজস্ব শোক সবার সামনে লকেটের মতো ঝুলিয়ে রাখারও কোনও চেষ্টা নেই। সহজ অথচ সমাহিত।

—বাবা আপনাকে কোথায় পাকড়াল?

—আমাকে পাকড়াননি তো? এবারে অবাক হয়ে গেল দীপ।

—তাহলে, মানে আপনি এদিকে...কোনও কাজে?

উত্তর দিতে গিয়ে সময় নিল দীপ, কীসের টানে এতদূর এসেছে বিশ্বাসযোগ্য কোনও উত্তর কি আছে? অন্যকে বিশ্বাস করানো দূরস্থান, নিজের কাছেও কোনও সদুত্তর নেই দীপের। এক্ষেত্রে ছোট মিথ্যাই আশ্রয় দিতে পারে।

—এসেছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি। ফিরছিলাম, রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। গল্প করতে করতে এতদূর এসে গেলাম। নিজেই বললেন, এতদূর যখন এসেই পড়েছ, একটুক্ষণ বসে যাও। আমার মেয়ে খুব ভাল চা বানায়।

চুপ করে থাকল রাত্রি। আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াল।

—সমস্ত বুড়ো মানুষ একাই করছে। কত বলি, আমাকেও যেতে দাও, কোনও কথাই শোনে না। গোঁয়ার্তুমি বংশের ধাত। বয়েসটা তো কম হয়নি। হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে...

দীপ জবাব দিল না। একটু পরে বলল, না, শরীরের যত্ন নেন। প্রেশার মাপান নিয়ম করে। বাজারে দেখে এলাম।

—এদিকে প্রেশার মাপাচ্ছে, অন্যদিকে দিনরাত ছেলের কথা ভেবে চোখের জল ফেলছে। প্রেশারের আর দোষ কী?

—আমাকে যে বললেন, ছেলের কথা বাড়িতে ঢোকা বারণ?

—আমাদের জন্যে। আমি, ঋজু। দিনরাত লুকিয়ে চোখের জল ফেলছে, আর ভগবানকে শাপ-শাপান্ত করছে। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না।

দীপ একটু ভাবল ; তারপর বলল, খাওয়াদাওয়ারও তো অনিয়ম হচ্ছে। মাছের বাজারে ঢুকলেন না। খালি নিরামিষ তরিতরকারি। জিজ্ঞেস করলাম, বললেন মেয়েটা ঘাস-পাতা চিবোবে তার সামনে আমরা মাছ-মাংস খাই কী করে।

—আপনাকেও শিখিয়ে এনেছে? চোখের জল আড়াল করে উঠে গেল রাত্রি।

স্নান হয়ে গিয়েছিল। মাথা মুছতে মুছতে খালি গায়ে সামনে এসে বসলেন বারীন। হাত থেকে গামছাটা নিয়ে দড়িতে মেলে দিল রাত্রি।

রাত্রি রান্নাঘরে গেলে বারীন কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলেন, সেই কথাটা বলেছিলে? সেই মাছ খাওয়ার কথা?

—হ্যাঁ, আপনি শিখিয়ে এনেছেন কিনা জানতে চাইলেন।

বিমর্ষ হয়ে গেলেন বারীন। কাঁচুমাচু মুখ করে বসে রইলেন। রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়াল রাত্রি, বেলা হয়ে গেছে, একেবারে দুপুরের খাবার খেয়ে যাবেন।

—অসম্ভব, মা ওদিকে চিন্তায় আধখানা হয়ে যাবে। একটা দিনই দুপুরে বাড়িতে খাই। তাছাড়া, চোখে চোখ রাখল দীপ, মাছ ছাড়া আমি খেতেই পারি না।

ফেরত হাসিটুকু চোখে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল দীপ। সেটাই অন্ধকার আকাশে ফুটে ওঠা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে খুঁজে দেখল আজ।

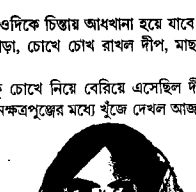

সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেরি হয় দীপের। বেশিরভাগ দিনই মা ডেকে দেয়। আজও তাই হল। তবে অধিকাংশ দিন সকাল থেকেই মা'র মুখ ব্যাজার থাকে, কারণটা আর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করা হয় না, জিজ্ঞেস করলে যে উত্তর পাবে তারও কোনও ঠিক নেই—আজ মা বেশ খুশি খুশি। তাই সাহস করে দীপ বলেই ফেলল, আজ মুডটা বেশ ভাল মনে হচ্ছে? কোনও খবর আছে নাকি?

মা মুখ ঘুরিয়ে হাসি আড়াল করল। মশারির খুঁটগুলো খুলে মশারি ভাঁজ করে রাখল। দীপকে ঠেলে তুলে বালিশটা টিপে ফুলিয়ে বিছানার চাদর টানটান করে পেতে ওপরে বেডকভার চাপা দিল। তারপর দীপকে বলল, মুখ ধুয়ে এসে চা খেতে বোস, বলছি।

দাঁত ব্রাশ করতে গিয়ে দীপ দেখল পেস্ট ফুরিয়ে গেছে। মাসের বাইশ তারিখ। মা কি দেখেছে? দেখেছে নিশ্চয়! উচ্চবাচ্য করেনি। দীপের পকেটে এখনও হাতখরচের টাকা কিছু রয়ে গেছে। পেস্টটা কিনে আনতে হবে।

চায়ের সঙ্গে দুটো বিস্কুট দিল মা। কাপের পাশে বিস্কুট সাজাচ্ছিল, হাতের আঙুলগুলোয় হঠাৎই নজর গেল দীপের। জল ঘেঁটে ঘেঁটে নখগুলো গেছে। এমনিতে কাচাকুচি মা নিজেই করে। নিজের আন্ডারওয়ার-গেঞ্জিটা স্নানের সময় শুধু দীপ কেচে দেয়। ঠিকে লোক বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে চলে যায়। রান্নারও লোক নেই। দিন শুরুই হয়নি, তবু কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে মাকে।

একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে ফেলবে? হঠাৎই ভাবনাটা এল, হায়ার পার্চেজে মাসে তিন-চারশো টাকার বেশি পড়বে না। কিন্তু হঠাৎ করে কিনে আনলে মা হয়তো ছুঁয়েও দেখবে না। আস্তে আস্তে কথাটা পাড়তে হবে। সইয়ে সইয়ে, টেলিফোনের মতন।

সামনের চেয়ারে বসল মা, পাখাটা চালিয়ে দিয়ে। আঁচল নেড়ে হাওয়া খেল, আজ যা গরম, বিকেলের দিকে ঝড়বৃষ্টি হবে ঠিক, দেখিস।

মা বলতে চাইছে, দীপ সুযোগটা করে দিল, কী ভাল খবর, বললে না?

—তিথি আজ সকালে ফোন করেছিল। তুই ওঠার আগে। আমি বললাম, তুই ঘুমোচ্ছিস। ডাকতে বারণ করল, আমার সঙ্গেই অনেক কথা হল।

এই ব্যাপার। তিথি উড বি মাদার-ইন-ল'কে সাতসকালেই ভিজিয়ে রেখেছে। মা'র মুডটা ওইজন্যেই ভেজা বেলফুলের মতো নরম, আর সুগন্ধি।

বিস্কুট চায়ে ভিজিয়ে খেতে ভালবাসে দীপ। বেশিক্ষণ ডোবানো হয়ে গিয়েছিল। গলে খানিকটা চায়ের মধ্যে পড়ে গেল। মা দেখেছিল। কৌটো খুলে আরেকটা বিস্কুট বাড়িয়ে দিল।

—কী বলল? মা'র মুখের থেকে চোখ সরিয়ে দীপ জিজ্ঞাসা করল। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মা, জানতে চাইল আমি কেমন আছি, তোর বাবার শরীর। ঠিকমতো শরীরের যত্ন নিচ্ছি কিনা। মেয়েটার সব ব্যাপারে খুব নজর। অত বড়লোক, অথচ কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায়।

দীপ চুপ করে রইল। তিথিরা যে খুব বড়লোক মা কোনও অবস্থাতেই সেটা মাথা থেকে তাড়াতে পারে না। দীপ মাঝেমাঝে ভাবে, তিথির জায়গায় খুব নিম্নবিত্ত পরিবারের কেউ যদি হত, তাকেও কি একইভাবে মেনে নিত মা?

—আসল কথাটা অবশ্য পরে ভাঙল। আজ ওর জন্মদিন। তোকে যেতে বলল। বেশি দেরি না করে। ওখানেই রাতের খাওয়া। বলল, ভেবেছিল ফোনই করবে না, তোকে নাকি আগেই জানিয়েছে। তোর মনে আছে কিনা টেস্ট করবে। তোর যা ভুলো মন, শেষ অবধি ফোন না করে পারল না।... দেরি করিস না। রাস্তিরে ও'দিকটা নির্জন হয়ে যায়।

মা উঠে গেল।

দীপ বাথরুমে যেতে যেতে ভাবল, সত্যিই তো, বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। যাক না যাক, একটা ফোন করেও উইশ না করলে মুখ হাঁড়ি হয়ে থাকত। তিথির জন্মদিন কবে সেটা জানার পর এটাই তো প্রথম জন্মদিন! সেটাও যদি ভুলে যেত! ভালই হয়েছে, মনে করিয়ে দিয়েছে।

স্কুটারটা বেগড়বাই করছে। আবার সারাতে দিতে হয়েছে। চলতে চলতে হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফল্টটা ধরা যাচ্ছে না। সেরকম হলে কোম্পানির লোককে দেখাতে হবে। স্কুটার না থাকলে আজকাল অসহায় বোধ করে দীপ। ভিড়ের বাস, জ্যাম, কন্ডাক্টরদের ব্যবহার। সময়েরও ঠিক থাকে না। মাঝে মাঝে দীপ অবাক হয়ে ভাবে, লক্ষ লক্ষ লোক যাদের নিজের কনভেয়ান্স নেই, কিভাবে দিনের পর দিন মাথা ঠাণ্ডা করে চালিয়ে যাচ্ছে কী করে?

—আস্তে খা। খাচ্ছিস তো না, গিলছিস।

—দেরি হয়ে যাবে মা, গাড়িটা সারাতে দিয়েছি।

মা উঠে গেল। জামাকাপড় চেঞ্জ করে সব গুছিয়ে নিচ্ছিল দীপ, মা এসে পেছনে দাঁড়াল, শোন, এইটা তিথিকে দিস। বলিস, মা পাঠিয়েছে।

একটা ঝিনুকের পাউডার-কৌটো। মা'র খুব শখের জিনিস। ছোটবেলায় একবার পুরী গিয়েছিল ওরা, সেখান থেকে আনা। মা সেটাই তিথিকে জন্মদিনে উপহার দিচ্ছে।

স্কুটার নেই। পকেটেই নিতে হবে, জিনিসটা তেমন বড় কিছু নয়। পকেটে ধরে যাবে।

বেরুতে বেরুতে দীপের মনে হল, তিথির জন্মদিন, তারও তো কিছু দেওয়া উচিত। পেস্ট ফুরিয়ে গেছে। কিনতে হত। হবে না। তিথির জন্যে উপহারটাই প্রায়োরিটি।

গ্রীষ্মকালটায় কম্পিউটার ঘরটা মনে হয় স্বর্গ। বাস থেকে নেমে গলদঘর্ম হয়ে অফিসে ঢুকে ঘরে ঢুকলে শরীর জুড়িয়ে যায়। যাদের বাড়িতেও এসি বসানো তাদের চেহারাগুলো কেন শীত-গ্রীষ্মে অমন চকচকে থাকে আস্তে আস্তে মালুম হচ্ছে দীপের।

কিন্তু আজ ঘরে ঢুকেই সব মনে পড়ে গেল। ঠাণ্ডাটাও যেন বেশি বেশি লাগতে লাগল।

রামধনী পোদ্দার। এলাকায় ব্যাপক পরিচিতি। সিনেমা হল থেকে নার্সিংহোম সব কিছুই পোদ্দার কনসার্ন। কালই একটা হৌচট খেল দীপ। নার্সিংহোমের জন্য আঠাশ লাখ দু' বছর আগেই লোন নিয়েছিল। আবার অ্যাপ্লাই করেছে, আরও বাইশ লাখ ; নার্সিংহোম বাড়াবে, কিন্তু কালই ডাটা সার্চ করতে গিয়ে দীপ দেখতে পেল, দু' বছর আগে নেওয়া লোনের একটা পয়সাও লোকটা শোধ দেয়নি। কাল ঘটনাটা নজরে এল যখন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সান্যালসাহেব বেরিয়ে গেছেন। আজ ব্যাপারটা জানাতে হবে।

একটু জিরিয়ে নিয়েই সান্যালের ঘরে গেল দীপ। একটা ভাউচার চেক করছিলেন সান্যাল, খুবই ভদ্র, সামনের চেয়ার দেখালেন, বসুন।

দীপ বসে গুছিয়ে নিল। সান্যাল চোখ তুলে বললেন, কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ, ওই পোদ্দার কনসার্ন-এর ব্যাপারটা।

সান্যালের ভুরুতে একটা ভাঁজ পড়ল।

—কোন ব্যাপার বলুন তো?

—আগের আঠাশ লাখ ওরা এখনও শোধ দেয়নি। আবার বাইশ লাখ চেয়েছে। কম্পিউটার দেখাচ্ছে...

—দীপনারায়ণবাবু! এরা আমাদের ভ্যালুড কাস্টমার। ওদের ফিক্সড ডিপোজিটই আছে দশ লাখের ওপর। লোন দেবার আগে সব কিছু দেখেই আমরা প্রসিড করি। ডোন্ট ওরি।

ঘরে ফিরে কী মনে হল, পোদ্দার গোষ্ঠীর ফিক্সড ডিপোজিটের অ্যামাউন্টগুলো রেকর্ড থেকে বের করে চেক করল দীপ। সাকুল্যে ছেচল্লিশ হাজার। খবরটা সান্যালকে দেবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠেও আবার বসে পড়ল। সান্যালের ভুরুর ভাঁজটার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল এক সপ্তাহ আগেই সান্যালের ঘরে রামধনীর ঘণ্টাখানেক কাটানোর কথা, বিকেলে একসঙ্গে রামধনীর গাড়িতে দু'জনের বেরিয়ে যাবার কথাও। লাভ নেই।

দুপুরে বটাদা এল, মুখ শুকনো। বটাদা যেন সেই বটাদা নেই। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে যাবে। মানস এসেই কথা শুরু করে দিল।

—খবর শুনেছ বটাদা?

—কোন খবর?

—যেদিন ভি আর এসের ফর্ম দেবে সেদিন ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড বলে বড় বড় অফিসাররা পর্যন্ত রাত থাকতে লাইন দিয়েছে। তাও তো এখন শোনা যাচ্ছে পনেরো হাজারের বেশি অ্যাপ্লাই করেছে, দেবে মাত্র পাঁচ হাজারকে।

—তোর স্ট্যাটিসটিক্সটা ভুল। মোদ্দা কথা, পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে যাদের তারাই কেবল ভি আর এসের জন্য এলিজিবল। আসলে, ব্যাঙ্কের এখন পকেট ফুটো, দেবার মতো অত টাকা নেই।

কেন নেই, ভাবল খবরটা ওদের জানিয়ে দেয়। তার পরেই নিজেকে সমঝাল, পোদ্দারের হাত অনেক লম্বা। কী দরকার ঘাঁটাঘাঁটি করে?

মানস বেরিয়ে গেলে বটাদা দীপকে বলল, একটা খারাপ খবর আছে। খুব আশা করে ছেলেটাকে কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি করেছিলাম, সব জলে গেল।

—কেন, কী হল?

টেস্ট পরীক্ষায় খুব বাজে রেজাল্ট করেছে। স্কুল থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ওদের ইচ্ছে সেন্ট আপই করবে না। হাতে-পায়ে ধরে রাজি করিয়ে নামলাম খবর নিতে। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কী সাপ বেরুলো জানিস?

বটাদা চোখ সরিয়ে বলল, ছেলে আমার কম্পিউটার অ্যাডিক্ট। প্রাইভেট টিউশন নেবে বলে বেরোয়, গিয়ে ভেড়ে কম্পিউটার শপে, আজকাল কম্পিউটারে অনেক অ্যাট্রাকশন। গেমস্, পাজল, ই-মেল, ইন্টারনেট। তার চেয়েও বেশি ই-মেলে বন্ধুত্ব, এমনকি কোনও কোনও ওয়েবসাইটে পর্নোগ্রাফি। সব জলে গেল রে আমার।

দীপ বলল, ধরা যখন পড়েছে তখন আর চিন্তা কী? সাবধান হও। ছেলেকে সরিয়ে আনো।

—একটাই সলিউশন। বাড়িতে কম্পিউটার কিনে সামনে বসে থাকা। তাও কি নিস্তার আছে? কতটুকু সময় থাকি বাড়িতে? যখন থাকব না?

বটাদা চলে গেল।

কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে আনমনে কী যেন ভাবল দীপ। তার পর কি-বোর্ডে গিয়ে খটাখট বাটন টিপে কম্পিউটারে ফিড করে রাখল, পোদ্দারের ব্যাপারটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাজটা করে দীপের যেন শান্তি হল। তিথির কাছে যেতে হবে। উপহার নিয়ে, সেটাও মনে পড়ে গেল।

দোকানে গিয়ে দিশেহারা হয়ে গেল দীপ।

একটা উপহার কিনবে এই পর্যন্ত ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু কী উপহার? উপহার যে দেবে তার নয়, যে নেবে তার পছন্দেই কেনার কথা। কিন্তু তিথির কী পছন্দ?

দীপ জানে তার নিজের সবচেয়ে পছন্দ পেন। ঝরঝরে লেখে, হালকা নয় ভারিও নয়, সরু লেখা এমন একটা কলম বুকের কাছে রেখে দিতে কী যে আনন্দ! সময় কম পায় আজকাল, তবু বই পেতেও ভাল লাগে দীপের। বিশেষ করে ভ্রমণকাহিনী আর সায়েন্স ফিকশন। ভালবেসে জামা বা প্যান্টের কাপড় কেউ দিলেও মনটা খুশিখুশি লাগে ; কিন্তু তিথি?

দীপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবতে বসল। যেটুকু দেখেছে, তিথির সবচেয়ে পছন্দ ফ্যাশন, সাজগোজ, সিনেমা, আর ক্যাসেট। ক্যাসেটের গানগুলো অবশ্য ওয়েস্টার্ন, বিট্‌ল্‌স, অ্যাবা, মাইকেল জ্যাকসন আরও কত কত নাম, তিথি বলেছিল, দীপ মনে রাখতে পারেনি। কিন্তু দীপ তো জানে না কোন ক্যাসেটটা তিথির নেই। কিনল, শেষে ডুপ্লিকেট হয়ে গেল, তখন কী হবে? কেনা ক্যাসেট কি ফেরত নেয় এরা?

শেষ অবধি ভেবেচিন্তে একটা লিপস্টিক কিনল দীপ। শেডটা তিথির পছন্দ, প্রায়ই লাগায়, লিপস্টিক ডুপ্লিকেট হবার চান্স নেই, একটা শেষ হলে অন্যটা ব্যবহার করবে। তবে দীপের ধারণা ছিল না, একটা লিপস্টিকের এত দাম? যাইহোক এক পকেটে মা'র দেওয়া পাউডারকৌটো অন্য পকেটে লিপস্টিক নিয়ে দীপনারায়ণের নিজেকে যোগ্য মনে হল। এবারে তিথির জন্মদিন অ্যাটেন্ড করা যেতেই পারে।

তিথিদের ফ্ল্যাটবাড়ির নীচে পৌঁছে দেখল তিথিদের বড় গাড়িটা নেই। সিকিওরিটির ছেলেটা, শ্যাম, চেনা হয়ে গিয়েছিল, এগিয়ে এল, —সাহেব-মেম বেরিয়ে গেছেন, দিদিমণি আছেন। বন্ধুরা এসেছে, পার্টি হচ্ছে, যান, চলে যান।

বন্ধুরা? দমে গেল দীপ। দীপ তাহলে একা নয়। কোন কোন বন্ধু? তাদের কি দীপ চেনে? কিভাবে দীপকে ইন্ট্রোডিউস করবে তিথি?

বেল বাজাতে হল না। দরজা খোলাই ছিল। বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে বাইরে।

সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকল দীপ। তিথির সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা, ড্রয়িংরুম-বেডরুমের মাঝামাঝি, দীপ! এসো এসো, ইন্ট্রোডিউস করে দিই। এ হচ্ছে দীপ, স্ট্যানচার্ট-এর ম্যানেজার; আর এরা, গোল করে হাত ঘুরিয়ে দেখাল তিথি, স্যান্ডি, সি. এ, ভিকি, জোকা থেকে ম্যানেজমেন্ট করে বেরুলো এবারেই, আর বৃন্দা, কোম্পানি-সেক্রেটারিশিপ করছে।

দীপ তিনটে জিনিস লক্ষ করল : (এক) সে আরও এক ধাপ উঠেছে। আগের দিন ছিল প্রবেশনারি অফিসার, আজ একেবারে বিদেশি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। (দুই) আগের দিন যে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, নামটা মনে নেই, সে আজ আসেনি। আজ যে তিনজন এসেছে এদের কখনও দ্যাখেনি। চুলের ক্লিপের মতো ঘন ঘন বন্ধু পালটায় তিথি। (তিন) তিথিকে এই পোশাকে প্রথম দেখল দীপ। টাইট জিনস, ওপরে টপ। টপ আর জিনসের মাঝখানে দু' ইঞ্চি খোলা পেট। টপটাও শুরু হয়েছে গলার ছ' ইঞ্চি নীচ থেকে। খুবই হেলাফেলায় টপটা চড়িয়েছে বোঝা যাচ্ছে। যেন না পরলেই ভাল হত।

—চলো চলো, কেক কাটা বাকি! দীপকে ধরে ফেলল তিথি।

একদিকে বড় টেবিলে কাকাতুয়ার মতো দেখতে একটা কেক, তার ওপর তেইশ লেখা একটা মোমবাতি। মোমবাতিটা জ্বালাল স্যান্ডি, পেছন থেকে তিথির হাতে ছুরি ধরিয়ে দিল ভিকি, আর ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে কেকের বুকে ঘ্যাঁচ করে ছুরি বসিয়ে দিল তিথি। তার পর সবাই একসঙ্গে হাততালি দিতে দিতে গোল করে তিথিকে ঘিরে নাচতে থাকল, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

দীপের খুবই একা লাগছিল। এত আনন্দ, এত উত্তেজনা যেন দীপকে স্পর্শ করছিল না। একটুকরো কেক এনে দীপের মুখে পুরে দিল তিথি,

ক্রিমমাখা আঙুলটা মুখের মধ্যে রেখে দিল পাঁচ সেকেন্ড, যাতে দীপ আঙুলটাও চেটে নেয়। তার পর হাততালি দিয়ে বলল, চলো সবাই ওঘরে যাওয়া যাক।

দীপের আশ্চর্য লাগছিল ভেবে, মেয়ের জন্মদিন, বাবা-মা সেই বার্থডে পার্টিতে নেই, গেছেন ক্লাবে না কোথায় মেয়েকে একা ফেলে রেখে। মেয়ে জন্মদিন সেলিব্রেট করছে বন্ধুদের সঙ্গে। এটাই হয়ত হওয়ার কথা, দীপের পুরনো চোখ, মানিয়ে নিতে পারছে না।

তিথির ঘরটা বেলুন আর কাগজের রিং দিয়ে সাজানো। ড্রেসিং টেবিলের নীচে ডাঁই করা রঙিন কাগজ। তখনই দীপের মনে পড়ে গেল উপহারগুলোর কথা। পকেটে হাত দিল।

স্যান্ডি ততক্ষণে এগিয়ে গেছে তিথির দিকে,— তুমি কিন্তু আমার গিফটটা নেগলেক্ট করছ টিট্, ব্রেসলেটটা পরলে তোমাকে কী গর্জিয়াস দেখাবে তুমি ভাবতেই পারছ না।

লজ্জা লজ্জা ভঙ্গি করে ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রেসলেট পরল তিথি। সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল।

—তোর দেওয়া শাড়িটা আজ কিন্তু পরতে পারব না বৃন্দা, আদুরে গলায় বলল তিথি।

বৃন্দা প্যাকেট থেকে শাড়িটা বের করল—ঠিক আছে, এক্সকিউজড; কিন্তু জিনিসটা তোর পছন্দ হয়েছে কি না বল! এই ডিজাইন এই একটাই ছিল। বলল, আঁচলটা নাকি রুপোর সুতোয় কাজ করা। ওইজন্যেই এত দাম।

ঘরের অল্প আলোতেও ঝলমল করছিল শাড়িটা। জিজ্ঞেস না করলেও দীপের মনে হল শাড়িটার দাম তার একমাসের মাইনের চেয়েও বেশি।

ভিকি ততক্ষণে তিথির কোমর পেঁচিয়ে ধরেছে, —আমারটার বেলায় কিন্তু না বলতে পারবে না; একটা তোমাকে ইউজ করতেই হবে, আমি নিজে লাগিয়ে দেব।

দীপের চোখের সামনে রেভলনের লিপস্টিকের একটা পুরো সেট খুলে ফেলল ভিকি। তারপর চুজ করে তিথির দিকে ফিরল। তিথি চোখ বন্ধ করে ঠোঁট দু'টো সামান্য ফাঁক করে দাঁড়াল। ভিকি আলতো করে তিথির ঠোঁটে ঘষে দিল। তিথি চোখ খুলে দু' ঠোঁটে ভাল করে লিপস্টিক মেখে নিয়ে লাজুক লাজুক চোখে ভিকির দিকে তাকিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইয়ু!

ভিকি বলল, ব্যস? হয়ে গেল? ওনলি থ্রাই থ্যাঙ্ক ইয়ু?

তিথি চোখ টিপল, নটি বয়!

হঠাৎই তিথির নজর গেল দীপের দিকে, কী হল দীপ, কথা বলছ না কেন? তুমি তো আমাকে জন্মদিনে উইশই করলে না এখনও? কী গিফট এনেছ আমার জন্যে, দেখি?

দীপ মাথা নামাল, সরি, এসে থেকে এমন হইহুল্লোড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, উইশ করার কথাটা মনেই ছিল না। হ্যাপি বার্থ ডে। মনে মনে অনেকবার বলেছি, এবার মুখেও জানালাম।

তারপর মাথা তুলে চোয়াল শক্ত করে বলল, জানো তিথি, এই উপহার টুপহার কাস্টমগুলো এত প্রিমিটিভ! এক ধরনের আনহেলথি কম্পিটিশন। সকলে যেন নিজের স্টেটাস দেখানোর জন্যেই গিফট দেয়। আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করেছি, কোনও অনুষ্ঠানে উপহার দেবও না, নেবও না।

বাজনাটা কি থেমে গেছে? চারখানা মুখ লম্বা দেখাচ্ছে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, জিভ ভেতরে লকলক করছে। পেছনের দরজাটা খোলা আছে দীপ দেখে নিয়েছে। পালাবে? লাফিয়ে বেরিয়ে যাবে?

জিভ ভেতরে টেনে চোয়ালে হাসি ঝুলিয়ে নেওয়ারই নাম সভ্যতা। চারটে মুখেই হাসি ফিরে এল। তিথি বলল, তুমি না,...একটা ইনকরিজিবল্। অতঃপর বাইরের ঘরে সিস্টেমে নতুন সিডি চাপিয়ে শুরু হল নাচ। ততক্ষণে হাতে হাতে গ্লাশ তুলে দিয়েছে তিথি, সেলার থেকে বেরিয়ে এসেছে বিদেশি স্কচ। মুহূর্তে গ্লাশ খালি হয়ে যাচ্ছে। কোমর দোলাতে দোলাতে স্টেপ মিলিয়ে বোতল-গ্লাশ করে যাচ্ছে তিথি। তিথিও নিয়েছে। একসময় সবার অলক্ষ্যে বেসিনে গ্লাশ খালি করে এসেছে দীপ। বাজনা ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে। নাচও। ভিকি ও স্যান্ডি পালা করে তিথির সঙ্গে নাচছে। তিথির চোখ লাল। একসময় বৃন্দা ডিভানে গড়িয়ে পড়ল। পাশে উঠে এল স্যান্ডি। ক্যাসেট বদলে দিল তিথি।

ঘড়ি দেখল দীপ। তিথিকে দেখল। ভিকিকে দেখল। খোলা দরজাও দেখতে পেল। মনে পড়ে গেল বাড়িতে তারজন্য রান্না হয়নি। কেক কাটা হয়েছিল। এখনও টেবিলে পড়ে আছে অনেকটাই। একটা বড় টুকরো মুখে ভরতে ভরতে দীপ বলল, হ্যাপি বার্থ ডে তিথি। বাজনার আওয়াজে দীপের কথা ডুবে গেল। দরজা গলে বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে এসে দেখল বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। ধুয়ে মুছে চকচকে আকাশ। রাতের ফুল ফুটেছে কাছে কোথাও, গন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে দীপ একসময় বাড়িও পৌঁছে গেল। বাইরে থেকে টানলেই ছিটকিনি খুলে যায় দরজার। অনেক রাত, তবু মা জেগেছিল; জিজ্ঞেস করল, এলি?

দীপ ছোট করে 'হ্যাঁ' বলে ঘরে যাচ্ছিল, মা আবার বলল, ওটা তিথিকে দিয়েছিস?

এতক্ষণ দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে ওইগুলোই ধরেছিল দীপ। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, ভুলে গেছি।

"প্রকৃতির নিয়মে সূর্য ওঠে অস্ত যায়, রাত্রি আসে, ঋতু পরিবর্তন হয়, দিন কাটে। তা না হইলে আমার দিন যেন কাটিত না। ক্রমশ নিজেকে সমস্ত কিছু হইতে বিযুক্ত করিয়া লইয়াছি। আমার স্বামী আমাদের শয়নকক্ষটিকেই তাঁহার সাধনকক্ষ বানাইয়া ফেলিয়াছেন। ঘরে ঢুকিতেই আমার কষ্ট হয়। দম আটকাইয়া আসে। অবশ্য যাগযজ্ঞ হোমের ধোঁয়ার কারণেও তাহা সম্ভব। মোটমাট ওই ঘরে ঢোকা আমার একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল।

তাহাতে আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না। বরং মুক্তি পাইলাম। ছোটখাট দু'য়েকটা কাজ সাধিয়া নিয়াছিলাম, যেমন আমাদের কুলবিগ্রহের পূজার জোগাড়। সেই কাজ হইতেও আস্তে আস্তে নিজেকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলাম। নূতন মা আনন্দের সহিত ওই দায়িত্বে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিলেন। বারোমাসে তেরো পার্বণ, নবান্ন, বর্ষারম্ভ, ভূমিপূজা, অক্ষয়তৃতীয়া, রথযাত্রা, দোল পূর্ণিমা, ঝুলন—কোনটা বাদ দিয়া কোনটা বলিব। আমাকে বাদ দিয়া কোনওটাই হইত না। বাবামহাশয়ের বিশেষ লক্ষ ছিল আমার প্রতি। আমাকে কোনও উৎসবে অংশগ্রহণ করিতে দেখিলে, আনন্দ পাইতে দেখিলে বাবামহাশয়ও যেন খুশিতে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন। একে একে সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিলাম।

বিবাহ-উপনয়ন-অন্নপ্রাশন বাড়িতে লাগিয়াই থাকিত। আমার যে নূতন ভাইটি জন্মাইয়াছিল তাহার অন্নপ্রাশনেও অনেক ধুম হইল। বাবামহাশয়ও বহুদিন পরে সবাইকে আদর-আপ্যায়ন করিলেন। আমি যেমন আড়ালে ছিলাম তেমনই রহিলাম।

এই কারণে কিছু কিছু কথাবার্তাও শুরু হইল। প্রথমে কানাঘুষা, পরে কৌশলে সেইগুলি আমার কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া শুরু হইল। আমি সন্তানহীনা, বন্ধ্যা। তাই অন্যের সন্তান হওয়াতে আমার নাকি অসূয়া। আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। সেইজন্যেই এইসব আনন্দ-অনুষ্ঠানে আমি অনুপস্থিত। সত্যি বলিতে কী, এই জাতীয় পরনিন্দা-পরচর্চা, যা কি না গ্রামীণ মহিলাদের বিনোদনের একমাত্র উপায়, তাহাও আমার নিজেকে গুটাইয়া নেবার অন্য এক কারণ। না বলিয়াও, আকারে ইঙ্গিতে চোখের ভাষায় আমারই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মহিলারা আমাকে বুঝাইয়া দিতেন যে আমি অক্ষম, আমি পারি নাই, আমি অসম্পূর্ণা।

এক তীব্র জ্বালায় আমার সমস্ত শরীর জ্বলিত। সেই মানুষটা ভেক ধরিয়া সকলের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইত, শুভাষিত বর্ষণ করিত, পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকে উপবীত স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিত। সে যে একটি ভণ্ড প্রতারক, ইচ্ছা করিত তাহা সর্ব-সমক্ষে চিৎকার করিয়া ঘোষণা করি। পারিতাম না, তাহার প্রথম কারণ লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে না। দ্বিতীয় কারণ, যদি বা বিশ্বাস করে, আমার দুরবস্থা দেখিয়া লোকে হাসাহাসি করিবে। বলিবে, কেমন! যেমন অহঙ্কার, ভগবান শাস্তি দিয়েছেন তো! কিছুই করিতে না পারিয়া গুমরাইয়া মরিতাম।

আমার সেই অভাগিনীর কথা মনে পড়িত। আমার স্বামীর প্রথমা পত্নী। সে মারা গিয়াছিল। পরে খোঁজ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, সে আত্মহত্যা করিয়াছিল। কেন, কী অবস্থায় সে নিজের প্রাণ হরণ করিয়াছিল ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। অনেকসময় তীব্র ইচ্ছা হইত আমিও পুকুরে ডুবিয়া মরি। পরক্ষণেই ভাবিতাম, কেন? তাহাতে এই লোকটার তো আরও সুবিধা হইবে। আজীবন বসিয়া বসিয়া বাবামহাশয়ের সম্পত্তির ভোগদখল করিবে। অসম্ভব। আমি উহাকে ছাড়িব না।

মানদামাসি কেবল আমার অবস্থা দেখিয়া ক্রমশ শুকাইয়া যাইতে লাগিল। তারপর একদিন কাহাকেও না বলিয়া এই বিশাল বাটির এক অন্ধকার গৃহকোণে তাহার শেষ দীর্ঘশ্বাসটি ত্যাগ করিয়া দায় এড়াইল।

ক'দিন খুব কাঁদিলাম। মাতৃবিয়োগ কী জিনিস আগে বুঝি নাই। এতদিনে

মাতৃহারা হইলাম। সংসারের সঙ্গে শেষ সম্পর্কও ঘুচিয়া গেল।

আমার আশ্রয় হইল চিলেকোঠা। এই ঘরটি একলা পড়িয়া ছিল, যেন আমারই জন্য। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে কত ছোট কক্ষ এমনই অনাদরে পড়িয়া থাকে কে তার খোঁজ রাখে। আমি এই চিলেকোঠার ঘরটি আবিষ্কার করিয়া যেন ধন্য হইয়া গেলাম।

ঘরটি খুব ছোট বা বড় নয়। একটি শয্যা পাতিয়াও জায়গা পড়িয়া থাকে। সুন্দর একটি বাতায়ন আছে। জানলা খুলিয়া বসিয়া থাকিলে বেশ সময় কাটিয়া যায়। এ দিকে বার-পুকুর। গ্রামের মানুষজন স্নান করিতে আসে। বাচ্চারা জল ছিটাইয়া সাঁতার কাটে। বধূরা কাপড়কাচা বাসনমাজার ছলে পুকুরঘাটে আসিয়া সংসারের গল্প বিনিময় করিয়া যায়। মাছরাঙা ঝুপ করিয়া ডুব দেয়, মুখে শিকার লইয়া উড়িয়া যায়। তালগাছের শাখার আড়াল হইতে পাকা ফল উঁকি মারে। ভাদ্র মাসে ধূপ করিয়া পড়িলে ছোটাছুটি লাগিয়া যায়। কালবৈশাখীর ঝড়ের পর আম কুড়ানোর ধুম। আমার সমস্ত বালিকাবেলা যেন সাঁতরাইয়া বহু যুগের ওপার হইতে আমার চোখের সামনে উঠিয়া আসিল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ঘরটি আস্তে আস্তে গুছাইয়া নিলাম। বাবামহাশয়কে ধরিয়া একটি খাট পাতিয়া নিলাম। মানদামাসির পুরনো টিনের তোরঙ্গটি খালি করিয়া ঘরে আনিয়া ফেলিলাম। দু'য়েক প্রস্থ জামাকাপড়। এবং একটি ডাইরি। ডাইরিটা বাবামহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন। হারাইয়া গিয়াছিল। পুরনো জিনিস ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হঠাৎ হাতে আসিয়া পড়িল। যেন জীবন ফিরিয়া পাইলাম।

যাহা মুখে বলিতে পারি না, যে অক্ষর-শব্দ-বাক্যসমূহ আমার বুকের মধ্যে গুমরাইয়া মরিয়াছে, প্রকাশের ভাষা পায় নাই, তাহাদের এই ডাইরিতে লিখিয়া যাইব। নিজেকেই শোনাইব। তাই এই ডাইরি আমার নিজের কথা।"

ডায়েরি থেকে চোখ তুলে কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল দীপ। শব্দটা কিসের? দেওয়ালঘড়ির? নিজের বুকের হওয়াও আশ্চর্য নয়। বেশি রাত হয়নি। আরও কিছুটা পড়া যায়। পাতা ওল্টাল।

"মানদামাসির মৃত্যুর পর আমার জন্য একটি দাসী বরাদ্দ হইয়াছিল, টুসি। টুসির বয়স অধিক নহে, তেরো চৌদ্দর আশপাশে। বয়েস অনুপাতে শরীর তো বটেই, মনটিও বেশ পক্ক। গ্রামের মেয়ে, পুকুরঘাটেই পাকিয়া যায়। বয়েসটাও গ্রাম হিসেবে কম নয়। কিন্তু এই মেয়েটির চোখ ও শরীরের ভাষা বিজলির মতো এদিক-ওদিক ধাওয়া করে। আমারই তাকাইয়া থাকিতে অস্বস্তি হয়।

টুসির কারণে আমার খবর আবার বাবামহাশয় অবধি পৌঁছাইল।

বেশ ছিলাম। অজ্ঞাতবাস। চিলেকোঠার ঘরে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম। আকাশ-বাতাস-গাছপালা-ফুলপাখি সঙ্গী করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। সকলের অলক্ষ্যে। শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে।

টুসি আসিয়াই লক্ষ করিল, খাওয়াদাওয়ায় আমার বিলক্ষণ অমনোযোগ। ভাত অধিকাংশ দিন অভুক্ত পড়িয়া থাকে। মাছ-মাংস প্রায় স্পর্শ করি না। সামান্য একটু দুধ, ক্বচিৎ কখনও ফল; আমার সারাদিনের আহার্য বলিতে এই। প্রায় বিধবার আহার। বিবাহ হইয়াও বিধবা যে তাহার পক্ষে ইহা খুব অনুপযুক্ত বলা যায় না। তাছাড়া চাহিদা ছোঁট করিয়া রাখিলেই ভাল থাকা যায়, ইচ্ছাগুলিকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাদের মাথা তুলিবার প্রবণতাই অঙ্কুরে নাশ করিয়া দিয়াছিলাম।

টুসি প্রথম আসিয়া বলিল, দিদি, তোমার কি শরীর খারাপ?

একটি সাময়িকীপত্র পড়িতেছিলাম। চোখ না তুলিয়াই বলিলাম, না, কেন রে?

—এই যে, সব ফেলে রেখেছ। খাওনি!

ভাবিলাম, ইহাকে সমস্ত কারণ ব্যাখ্যা করিতে গেলে আমার পণ্ডশ্রম হইবে। তা ছাড়া অন্যরকমও বুঝিতে পারে। তাই আলোচনা ছোট করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না। থালা-বাসন গুছাইয়া রাখিয়া আবার ফিরিয়া আসিল,—কি হয়েছে তোমার?

একটি উপন্যাসের ধারাবাহিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। টুসির সঙ্গে পূর্বের বাক্যালাপ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পুস্তক হইতে চোখ তুলিয়া, মনে মনে তখনও উপন্যাসের কাহিনীতে নিবিষ্ট থাকিয়া বলিলাম, কিসের কি?

—এই যে বললে শরীর খারাপ?

টুসির কথায় বাস্তবে ফিরিয়া আসিলাম; বলিলাম, গাটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। জ্বর জ্বর লাগছে, খিদে নেই। দ্রুত কাছে আসিয়া কপালে হাত রাখিল টুসি; বলিল, না তো, গা ঠাণ্ডা দেখছি। বমিটমি হয়নি তো?

বমি? অবাক হইলাম। পরক্ষণেই মেয়েটির ইঙ্গিত বুঝিয়া কান গরম হইয়া গেল। মুখ ঝামটা দিয়া উঠিলাম, তুই যাবি? দেখছিস না একটা বই পড়ছি?

টুসি গেল, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। কিছু সময় পরেই একটা আচারের বয়াম আনিয়া ঠক করিয়া সামনে রাখিল, —নাও, এটা খেতে ভাল লাগবে।

টুসি আমার ক্ষুধা না হওয়ার কথাটা বাড়িময় রাষ্ট্র করিয়া দিল। স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসু মানুষ ঘরে উঁকি মারিতে শুরু করিল। আমার একান্ত একাকিত্বের আস্বাদন গেল, ঘরের নিভৃতি চুরমার হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল টুসির দীর্ঘ চুলের গুচ্ছ ধরিয়া পিঠে খানকতক দিই। ইচ্ছাটা দমন করিলাম। কারণ তাহাতে জটিলতা আরও বাড়িবে।

আমার মা আসিলেন। আমার খোঁজ নিতে তাঁর এই প্রথম আসা। বুঝিলাম, বাবামহাশয় তাঁহাকে জোর করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার শরীরের কুশলসংবাদ তাঁহাকে পৌঁছানোই ইঁহার অভিপ্রায়।

মা সুন্দরী। সন্তান হইবার পর তাঁহার সৌন্দর্যে কিছু পরিবর্তন আসিয়াছে। আগের সৌন্দর্যে একটু খরতা ছিল, চোখা চোখা নাকচোখ, চৌকোনা চিবুক, পাতলা ঠোঁট। এখন শরীরে রসসঞ্চার হওয়ায় সৌন্দর্যের সঙ্গে মাধুর্য মিশিয়াছে। চোখের ভাষাও আগের চেয়ে কোমল।

খাটের ধারে মা বসিলেন। আমিও উঠিয়া বসিলাম। মা বলিলেন, তোমার নাকি শরীর খারাপ?

আমি জবাব দিলাম, না, তেমন কিছু নয়।

—টুসি বলছিল, কিছু খাও না, তোমার নাকি খেতে ইচ্ছে করে না।

—ও একটা পাগল। একদিন কী না কী হয়েছিল। তাই নিয়েই সাতকাহন!

—একদিন নয়। আমি খোঁজ নিয়েছি, আজকাল তোমার ঘর থেকে প্রায়ই খাবার ফেরত যায়।...স্নান করেছ কবে?

বলিলাম। শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন মা। তাঁহার আশঙ্কা অমূলক। তবু খবরটা পুরোপুরি বাবামহাশয়কে দেওয়া চাই। তাই বলিলেন, জ্বরটর হয় না তো?

—না না, জ্বরজারি কিছু নেই। বেশ আছি। আজকাল মাছমাংস বিশেষ ভাল লাগে না। দুধ, ফল-টল তো ভালই খাই। ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।

ভাবিয়াছিলাম, ঝামেলা কাটিল। কিন্তু ঝামেলা যে ক্রমশই পাকিতেছে তাহা বুঝিলাম, যেদিন বাবামহাশয় আমার ঘরে হানা দিলেন।

দ্বিপ্রহরে জানলা দিয়া বাহির দেখিতেছিলাম, মনে মনে খাঁচার পাখি আর বনের পাখির কথা ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ টুসি আসিয়া খবর দিল বাবামহাশয় আসিতেছেন। ভাল করিয়া ঘরদোর গুছাইয়া ঠিকঠাক করিতে না করিতেই বাবামহাশয় আসিয়া পড়িলেন।

বহুদিন বাবামহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে একটা মানুষ, এককোণে পড়িয়া রহিয়াছি, বাবামহাশয় যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। আমিও অভিমানবশে তাঁহার সঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া দেখাসাক্ষাৎ করি নাই।

ঘরটি অন্ধকার। বাবামহাশয় ঘরে ঢুকিয়া কিছুটা সময় নিলেন অন্ধকারের সহিত চোখকে মানাইয়া নিতে। আমি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার দিকে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টে আমাকে দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিয়া গেল। আমিই ধরিয়া তাঁহাকে খাটে বসাইলাম। আমার হাত ধরিয়া আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি শুধু বলিলেন, একি চেহারা করেছিস মা?

তারপর আর কোনও কথা না বলিয়া আমার হাত ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমিও তাঁহার পাশে বসিলাম। হাতের আঙুলের ভিতর দিয়া কতদিনের কত না-বলা কথা যেন দু'জনের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেন আমি তাঁহাকে ও তিনি আমাকে বহুদিন পরে নূতন করিয়া দেখিলাম।

একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাবামহাশয় উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ঘরটায় একলা থাকিস মা, নীচে কোনও ঘর পরিষ্কার করে দিতে বলি?

আমি বলিলাম, এই ঘরটাই আমার পছন্দ বাবা। এখানেই বেশ আছি।

—বেশ, তোমার যা ইচ্ছে, বলিয়া বাবামহাশয় নামিয়া গেলেন।

ক্রমশ আমার খাওয়া-দাওয়া ভালমন্দ লইয়া খোঁজ করিবার যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেল। বাবামহাশয়ও দিনে দুইবার আমার খোঁজখবর করিতে শুরু করিলেন।

না খাইয়া পেট শুকাইয়া গেলে যা হয়। আদরের আতিশয্যে সত্যই একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। জ্বর, সঙ্গে দাস্ত। বাবামহাশয় পাগলের মতো ছুটোছুটি আরম্ভ করিলেন। তারপর জ্বরের ঘোরেই শুনিলাম, গাড়ি যাইতেছে আদিত্য ডাক্তারকে আনিবার জন্য।

আদিত্য কর্মকার বয়েসে নবীন। কলিকাতা হইতে ডাক্তারি পাশ দিয়া কিছুদিন হইল গ্রামে প্র্যাকটিশ শুরু করিয়াছেন। অল্প দিনেই নাম হইয়াছে।

পুরনো এল এম এফ সত্যনারায়ণ ক্রমশ তামাদি হইয়া গিয়াছেন। আমাদের বাড়িতে কর্মকার প্রথম ডাক পাইলেন। তার অর্থ, সত্যনারায়ণের দিন শেষ হইল, আদিত্যর যুগের সূচনা। আমিও, নূতন ডাক্তার শুনিয়া, জ্বরের ঘোরেও নিজেকে শুছাইয়া নিলাম।

আচ্ছা, এমন কথা কেউ কখনও শুনিয়াছে? ডাক্তার আসিয়াছে রোগী দেখিতে। রোগীর হাতখানি টানিয়া নাড়ি দেখিবার জন্য ডাক্তার তাহার মণিবন্ধে দুটি আঙুল রাখিলেন। চোখ বন্ধ করিলেন। ব্যস। ওইখানেই ঘটনার শেষ। চোখ আর খোলে না, হাত হইতে আঙুল আর ওঠে না। চক্ষু মুদিত করিয়া আমারই কেমন কেমন লাগিতেছিল, ভিড়ের মধ্য হইতে কে যেন থাকিতে না পারিয়া শেষে বলিয়াই ফেলিল, কী পেলেন ডাক্তারবাবু? খারাপ কিছু?

ততক্ষণে আমিও জ্বরবিকারের মধ্য হইতে একটি চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া ডাক্তারকে দেখিয়া ফেলিয়াছি।

ও হরি! এই ডাক্তার? এর অত নামযশ? এতো দুগ্ধপোষ্য শিশু! এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, চোখে প্যাঁশনে চশমা, আর চেহারাখানি ভারিক্কি করিবার জন্য নাকের নীচে একখানা গোঁফ। তাও তো গোঁফের বয়স দশ বারো ছাড়াইয়াছে কি না সন্দেহ,—যে রকম সূক্ষ্ম আর কোমল গোঁফের আকৃতি। দেখিয়া আমার ভক্তিশ্রদ্ধা উবিয়া গেল। অসুখের কষ্ট, তীব্র শিরঃপীড়া সব কিছু সত্ত্বেও ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

কেউ একজন, টুসিই হইবে, হাততালি দিয়া উঠিল, ও মা, দিদির মুখে হাসি ফুটেচে। বড় ডাক্তার একেই বলে। নাড়ি ধরেচে কি ধরেনি, রোগীর রোগযাতনা পালিয়ে গেচে।

শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমি হাসি মুছিয়া গম্ভীর হইয়া আবার মুখে চোখে রোগের কষ্ট আনিয়া ফেলিলাম। কিন্তু চোখ বারবার বন্ধ করা যাবেনা। তাই চোখ খুলিয়া ড্যাবড্যাব করিয়া সব দেখিতে লাগিলাম।

ডাক্তারও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি হাতখানি বিছানার ওপর নামাইয়া রাখিয়া আমার মুখের ওপর চোখ রাখিয়া বলিলেন, কষ্ট?

আমি দেখিলাম, কণ্ঠস্বরটি ভারী কোমল, দুই চোখে মমতা; মনে হইল এইভাবে আমার কষ্টের খবর বহুকাল কেহ নেয় নাই; যেন ওষুধ দিবার আগেই ক্ষতস্থানে সহানুভূতির প্রলেপ লাগাইয়া মানুষটি অসুখের বারোআনা সারাইয়া দিলেন।

ঘাড় নাড়িলাম, হ্যাঁ, কষ্ট। একই সঙ্গে, কষ্টের সবটুকু দেখাইতে পারিব না বলিয়া চোখে জল আসিয়া গেল। সেটা লুকাইবার জন্য মুখ অন্যপাশে সরাইয়া নিলাম।

মানুষটি আমাকে পরীক্ষা করিলেন। প্রতিটি স্পর্শে গভীর মমতা যেন তাঁহার হাতের আঙুলগুলি হইতে আমার শরীরে সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছিল।

এর মধ্যেই খবর পাইয়া বাবামহাশয় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আসিতেই অন্যরা ঘরের বাহিরে গেল। একটি চেয়ারে ডাক্তারের সামান্য দূরে বাবামহাশয় বসিয়া উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ করিতেছিলেন।

দেখা শেষ হইলে ডাক্তার বাবামহাশয়ের দিকে ফিরিলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলেন? খারাপ কিছু নয় তো?

ডাক্তার গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, বহুদিনের অবহেলা ও অনাচার। ফল অপুষ্টি। শরীরের নিজের যুঝবার ক্ষমতা বিশেষ নেই। ওষুধ কলকাতা থেকে আনাতে হবে। এই অসুখের চিকিৎসা আগে ছিল না। এখন ইনজেকশন বেরিয়েছে। আমি নিজে এসে দিয়ে যাব। আর খাওয়াদাওয়ার দিকটা আপনারা নজর রাখবেন। সবচেয়ে বেশি দরকার সেবা। আর ভালবাসা।

শেষ কথাটা একটু থামিয়া, গলাটা হঠাৎ গম্ভীর করিয়া ডাক্তার বলিলেন। তারপর আমার দিকে না তাকাইয়া হঠাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সেই আসা শুরু হইল। নিয়ম করিয়া বিকেলের রোদ পড়িলে তিনি আসিতেন। একটি মস্ত কাচের সিরিঞ্জে ওষুধ ভরিয়া আমাকে ইঞ্জেকশন দিতেন। প্রথমে দুই বাহুতে। তারপর ব্যথায় কষ্ট হইত বলিয়া কোমরে। আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতাম। অথচ কাপড় সরাইয়া কোমরে ইঞ্জেকশন দিয়া হাত বুলাইতেন যখন, মনে হইত ইঞ্জেকশন একটা কেন, আরও দিলে হয় না?

প্রথম প্রথম বাবামহাশয় থাকিতেন। উদ্বেগ মুখে জড়ো করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন দেখছেন ডাক্তারবাবু? মেয়েটা আমার বাঁচবে তো?

ডাক্তার হাসিয়া বলিতেন, এটা বিজ্ঞান। অসুখ হয়েছে, চিকিৎসা যা তা করা হচ্ছে, বাঁচা-মরার কথা বলতে পারব না। তবে আপনার মেয়ে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। দেখছেন না, জ্বর কমে এসেছে, চোখে জ্যোতি ফিরে এসেছে, খাওয়া-দাওয়াও করছেন শুনছি। আরও দিন পনেরো না গেলে নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

আরও দিন কয় কাটিলে বাবামহাশয় আর রোজ আসিতেন না। টুসি ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া আসিত, পাশে দাঁড়াইয়া থাকিত। শেষে সেও আর পুরো সময়টা থাকিত না। ইনজেকশন দেওয়া হইলেই সে 'দিদি' আসছি বলিয়া চলিয়া যাইত। চঞ্চলা কিশোরী। বিকেলে তাহার নানা আকর্ষণ। তাহারই বা দোষ কী?

আর আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, আমিও তাহাই মনে মনে প্রার্থনা করিতাম। সেই চিলেকোঠার ঘরে যেন তিনি আর আমি ছাড়া আর কেহ না থাকে, কেহ আসিয়া বিরক্ত না করে।

জ্বরের ঘোর ক্রমশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। অন্য এক ঘোরের কবলে গিয়া পড়িলাম। সবসময় শয়নে-স্বপনে-জাগরণে যেন তাঁহাকেই দেখি, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনি, তাঁহার স্পর্শ অনুভব করি। সামান্য সময়ই তিনি থাকেন। অথচ প্রতিটি মুহূর্তে যেন তিনি আমার সঙ্গেই আছেন।

আরও কটা দিন কাটিলে, যখন ভাবনাচিন্তার শক্তি আসিল, তখন একটা দোটানায় পড়িয়া গেলাম।

এই যে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলে আমার ভিতরে এক অনাস্বাদিত আনন্দের সঞ্চার হয়, ইহা কি পাপ? তাঁহার স্পর্শে আমার প্রতিটি রোমকূপ জাগিয়া উঠে, ইহা কি পাপ? তিনি থাকিলে আমার ঘরটি যেন আলোকিত বোধ হয়, ইহা কি পাপ? তিনি না থাকিলেও, তাঁহার চিন্তাতেই আমার শরীর যেন সাড়া দেয়, ইহা কি পাপ?

পরক্ষণেই মনে হয়, বিবাহিতা আমি, স্বামীসঙ্গ কী জিনিস জানি নাই। স্বামীর স্পর্শে কী হয় কোনওদিন অনুভব করি নাই। এইভাবেই তো জীবনের কতগুলি বছর কাটিয়া গেল। যৌবন মধ্যগগনে, এবারে ঢলিয়া যাইবার পালা। একটি মানুষের প্রবঞ্চনায় আমার জীবন এইভাবে অনাস্বাদিত অস্পর্শিত কুসুমের ন্যায় একসময় শুকাইয়া জীর্ণ হইয়া বাসি হইয়া যাবে। সেক্ষেত্রে অন্য একটি মানুষের উপস্থিতি, করস্পর্শ, কণ্ঠস্বরে যদি শরীরে প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দীপ জ্বলিয়া ওঠে, তাহাতে কিসের অন্যায়, কিসের পাপ?

মাঝে মাঝে হয়তো সপ্তাহে একদিন, কি দশদিন পর, বাবামহাশয় আসিতেন। এখন আর তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হয় না, চোখে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন, আমার উন্নতি হইতেছে। আমার সঙ্গেও হাসিয়া একটি দু'টি কথা বলিয়া তিনি চেয়ার টানিয়া বসিয়া ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনি।

বাবা—এই যে রাজন্যপ্রথা বিলোপ, আপনার কী মনে হয়, এতে সাধারণ লোকের উপকার হবে?

ডাক্তার—নিশ্চয়ই!

বাবা—দুর্ভিক্ষ-খরা-বন্যা-মন্বন্তরে ধুলধাবাড়ি হয়ে যাবে। খাবে কী, যাবে কোথায়? রাজা ছিল, বিপদে-আপদে সে-ই দেখত। এখন মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেল।

ডাক্তার—ভাল হল। এবারে মানুষগুলো নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখল। তা ছাড়া হাজার হাজার বছর ধরে যারা শুষে খেয়েছিল, কিছু মনে করবেন না, আমার কথাটা হয়তো রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য হল, শুধু রাজার বাড়িতে জন্মানোর সুবাদেই একজন অন্যদের পায়ের তলায় ফেলে পিষে ফেলবে, এ অন্যায়, এ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

বাবামহাশয় চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া যাইতেন। আদরের কন্যার জীবন দিয়াছে, ওদিকে রাজ্যপাটও যায় যায়। অন্যথায় হয়তো মারিয়া ধরিয়া রাজত্বের বাহিরে নির্বাসনে পাঠাইয়া দিতেন।

আমি শুইয়া শুইয়া ভাবিতাম। ঠিকই তো। জায়গা বাছিয়া জন্মগ্রহণ করাটাই যেন আসল। রাজা হইয়া জন্মিলে তো রাজা। পুরুষ হইয়া জন্মিলে তো পুরুষ। উচ্চ কুল বাছিয়া জন্মিলে তো যা ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা হাতে আসিয়া গেল। বিবাহ করিব, দিনরাত বসিয়া বসিয়া খাইব, ভেক ধরিয়া পৃথিবীশুদ্ধ লোককে ঠকাইব, আর ঘরজামাই হইয়া শ্বশুরের সম্পত্তিতে অধিকার কায়েম করিব। আর যে নারী হইয়া জন্মাইল?

তাহার গোড়াতেই ভুল। বেঠিক জায়গায় বেঠিক জন্ম। যাহাতে তোমার কোনও হাত নাই তাহারই জন্য সমস্ত জীবনটা ধোপার গাধার মতো টানিয়া বেড়াও।

কিন্তু তাই বা কেন? এরকম কোনও লিখিত পড়িত নিয়ম আছে নাকি? রাজাদের যদি রাজত্ব যায়, এতদিন যাহারা ভোগদখল করিল, তাহাদেরই বা ভোগের শেষ হইবে না কেন? পাশার দান যদি ওল্টায়? যদি আমরাই একবার অশ্বের বল্গাটা ধারণ করি? ভাবিয়া ভাবিয়া উঠিয়া বসিতাম। আবার

হতোদ্যম হইয়া বিছানায় শুইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতাম।

ওদিকে মানুষটির সঙ্গে আমার সম্পর্কও এক জায়গায় দাঁড়াইয়া ছিল না। রোগ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমারও কণ্ঠে বাণী ফুটিল। আমিই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একদিন আলাপ শুরু করিলাম।"

আজ আর রাতে ঘুম আসবে না। ডায়েরি বন্ধ করে আলো নিভিয়ে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল দীপ। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখল। দীপের খুব অসুখ। বাবা-মা গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজেদের বদলে ফেলে দু'জনেই ফিসফিস করে কথা বলছে। শেষ অবধি ক্রমশ যখন অবস্থার অবনতি হচ্ছে, বড় ডাক্তারকে কল দেওয়া হল। অসুখের ঘোরে দীপ বুঝতে পারছে, ডাক্তারের হাত তার শরীরের কল-কব্জাগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে। অথচ ডাক্তার যেন ডাক্তার নয়। তার হাতের চলে বেড়ানোও যেন কেমন কেমন। ঘুরতে ফিরতে চুড়ির ঠুংঠাং আওয়াজ হচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে দীপ বলল, এ কী ডাক্তার নিয়ে এলে মা?

মা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিস করল, চুপচুপ, খুব নামকরা গাইনো, ওরকম করতে নেই।

গাইনো? সে তো মেয়েদের ডাক্তার। ধড়মড় করে উঠে বসল দীপ। ঘরময় রোদ্দুর, ঘুলঘুলিতে চেনা চড়াইপাখিটা কিচকিচ করছে। চোখ কচলে মনে করার চেষ্টা করল। ডাক্তারের মুখটা চেনাচেনা লাগল না?

ক'দিন খুব বৃষ্টি হল।

গরম কমে গেল, গাছের পাতার ধুলোটুলো ঝরে গিয়ে সবুজ দেখা গেল, আকাশের নীল বেরিয়ে এল, মেঘগুলো সার্ফ একসলে ধুয়ে বেশ ফুরফুরে সাদা হয়ে বেড়াতে বেরুলো। আকাশ-গাছ-মেঘ দেখার অবকাশ যাদের কম, তারা দেখল কলকাতার পাতাল মাটি ফুঁড়ে ওপরে উঠে এসেছে; থইথই করছে পাঁক, ফুটপাথের মেকশিফ্‌ট্ আবাসন গেছে, আপাতত জলের পাইপ বহুতলের বেসমেন্ট হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশন ভরসা। কোনও কোনও নিচু জায়গায় নৌকো নেমেছে খবরে লেখা।

দীপ দু'টো দিন শুয়ে-বসে কাটাল। অফিস যে পাড়ায় সেটা নাকি জলের তলায়, মানস একদিন ফোন করেছিল। যাওয়ার প্রশ্ন নেই। নেহাৎ ত্যাঁদোড় কাস্টমার না হলে জল সাঁতরে ব্যাঙ্কের দরজার তালা ধরে টানাটানি করবে না। আর একটা ফোন এসেছিল তিথির। দীপ তখন বাথরুমে। বাইরে থেকে দরজা ঠুকঠুক করে মা জিজ্ঞেস করেছিল, তিথি ফোন করেছে, কী বলব? দীপ গায়ে সাবান ঘষতে ঘষতে হাত থামিয়েছিল, একটু ভেবে বলেছিল, বলে দাও আমি পরে ফোন করব।

ডায়েরিটাও টানছিল খুব। যেন ওটার ভেতরে কেউ বসে ডাকাডাকি করছে দীপকে। দীপেরও ভীষণ ইচ্ছা করছিল। আর বেশি নেই, কয়েকটা পাতা। কিছু দিন দীপের মনটা ভাল যাচ্ছে না। ডায়েরির পাতা ওল্টালেই অন্য জগতে চলে যায়। তখন আর মন খারাপটারাপ মনে পড়ে না। তাই শেষ পাতে আমের আচারের মতো ডায়েরির শেষ পাতাগুলো বাঁচিয়ে রেখেছে দীপ। আরও বেশি বেশি মন খারাপ করলে অথবা মন ভাল হবার মতো কিছু না ঘটলে তখন বাকি পাতাগুলো পড়বে।

আজ ঝকঝকে রোদ, বৃষ্টিটাও কাল দুপুর থেকে বন্ধ। অফিসে বেরুবে মাকে জানিয়ে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিল। বাজারে যাওয়া হয়নি দু'দিন। মা তাই খিচুড়ি করেছে। বাবা দুবার ঘ্যান ঘ্যান করে গেল—খিচুড়ির সঙ্গে কয়েকটা ডালের বড়া ভেজো তো কটকটে করে, আর শুকনো আলুভাজা। বেশি পেঁয়াজ দিয়ে একপিঠ ভাজা মামলেট। কয়েকটা কাঁচালংকা ছড়িয়ে। মা সবই করল, তার মধ্যেও দু'বার চোয়াল চিবিয়ে বলল, আপদ!

বাইরে বেরিয়েই দীপের মন ভাল হয়ে গেল। ভিজে রোদ্দুর, ফর্সা ফর্সা মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে হল, আজ খুশি হবার মতো কিছু ঘটবে। ঘটবেই।

কিছুদিন হল রাত্রি ওদের ব্রাঞ্চে জয়েন করেছে। একে তো কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে চাকরি, এত তাড়াতাড়ি, তার ওপর সেম ব্রাঞ্চ, মানস বলল, ধরাকরার ভাল লোক আছে ওপরে, বুঝেছিস। একমনে মাথা নামিয়ে কাজ করে যায় মেয়েটা। প্রথমেই কাউন্টারে বসিয়ে দিয়েছে ওকে। ভিড়, লোকজন, নানারকম উড়ো মন্তব্য। কিছু করার নেই। র‍্যাগিং। সবই সময়ে সয়ে আসবে।

দীপের মাঝেমাঝে মনে হয় ওকে একটু রিলিফ দিই। পরক্ষণেই ভাবে, বেশি সিমপ্যাথি দেখালে অন্যরা আরও পেয়ে বসবে। ওর ওপর চাপ বাড়বে। দীপ তো রোজ ওকে হেল্প করতে পারবে না। কোনওদিন নিজের কাজে কম্পিউটার ঘরে আটকে গেলে মেয়েটা হিমসিম খাবে। তার থেকে যা চলছে চলুক। আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করে নেবে।

রাত্রিও দীপের 'মন ভাল নেই'-এর আর একটা কারণ। রাত্রি মানেই ব্রত, বারীন এবং ঋজু। তা ছাড়া ওর বসে থাকার ভঙ্গিটা এমন! মাথা নিচু, চোখ সবসময় লেজারে, জড়োসড়ো, কুণ্ঠিত। যেন চাকরি করতে এসে মহা অন্যায় করে ফেলেছে। ওই জন্যেই আরও খারাপ লাগে দীপের। মন খারাপ হয়ে যায়।

জল নেমে গেছে, কিন্তু রাস্তায় একটা চটচটে কাদা। মোড় থেকে ব্যাঙ্ক অবধি সরু রাস্তাটা পার হতে গা ঘিন ঘিন করতে লাগল দীপের। এই কাদায় কী নেই? আদি গঙ্গার জল তো জীবন থেকে মৃত্যু অবধি সমস্ত অবশেষই বয়ে আনে। তার সঙ্গে হাইড্র্যান্ট। প্যান্টটা গুটিয়েও কাদা লাগা আটকাতে পারল না। দীপের মনে হল কাদাওলা রাস্তায় হাঁটলে তাবড় তাবড় ধোপদুরস্ত লোকও পঙ্কিল হয়ে যেতে বাধ্য।

ঢুকে অবাক! দীপই দেরিতে। বটাদা-মানস ওরা এসে গেছে। পেছন পেছনই রাত্রি। সান্যাল ক'দিনই আসছেন না। গুজব ওনার এগেইন্‌স্টে কীসব এনকোয়ারি চলছে। ভয়ে ভয়ে আছে দীপ, ওর কম্পিউটার নিয়েও না টানাটানি পড়ে ।

বৃষ্টিতে ভিজে দেয়াল ড্যাম্প, লাইন শর্ট হয়ে আছে, সুইচ জ্বালতে গিয়ে নাকি মেইন অফ হয়ে গেছে। তাও একবার মেইনের তার পালটে চেষ্টা করা হয়েছিল, সুইচ অন করতে সেটাও গেছে। অতএব ভেতরটা অন্ধকার। এক দু'জন কাস্টমার এসেছে। দু'দিন বন্ধ ছিল, ফেরানোও যাবে না। তাদের বসতে বলা হয়েছে। কম্পিউটার রুম অন্ধকার, এসিও চলছে না। চেয়ার টেনে বাইরেই বসল দীপ।

অনেকদিন কথাবার্তা হয় না। দীপই শুরু করল, যা বৃষ্টি গেল ক'দিন। তোদের ওদিকে জল জমেছে মানস?

—নিচু এলাকাগুলোয় জমেছে। বস্তিটা ভাসছে, লোকজনকে রেসকিউ করতে হয়েছে। আত্রিকও শুরু হয়েছে।

—মরবে না। সব রক্তবীজের ঝাড়! একটা মরে তো হাজারটা জন্মায়। বাসে ওঠা যায় না। কী ভিড়! কী ভিড়! আজ কিসে এলি মানস? বটাদা গলা তুলল।

—আমি তো টার্মিনাস থেকে বসে আসি। দেরি লাগে। কিন্তু রাস্তাটা আরামে চলে আসি। কোনও কোনওদিন ঘুমিয়েও নিই কিছুটা। আজ অবশ্য ঘুম হয়নি।

শেষ কথাগুলো বলার সময় মানস আড়চোখে রাত্রির দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসল।

বটাদার নজর এড়াল না। চোখ টিপে বলল, কেন কেন? ঘুম হয়নি কেন? কাছাকাছি কেউ ছিল নাকি?

—আমি বসেছিলাম লেডিজ সিটের দিকে।

—বলিস কী? লেডিজ সিটে? তোর ওই অত বড় গোঁফ আর জুলপিশুদ্ধ? অ্যালাউ করল?

—আহ্, বলছি না, লেডিজ সিটের দিকে, দ্যাখোনি লেডিজ সিটের দিকে একটা বা দু'টো আড়াআড়ি জেন্টস সিট থাকে। জানলার ধারে বসে হাওয়া খেতে খেতে আসছি। মেয়েদের সিটের সামনে বেশ ভিড়, একটা মেয়েদের কলেজ আছে, ওরা এই বাসটাই অ্যাভেইল করে, হঠাৎ শুনি একটা গোলমাল।

রাত্রি উশখুশ করছে, উঠেও যেতে পারছে না। কারেন্ট না এলে কাউন্টার খোলা যাবে না। অন্ধকারে টাকা-পয়সার এদিক-ওদিক হতে পারে।

বটাদা বলল, গোলমালটা কিসের?

—একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল বুকের কাছে বই চেপে, অন্য হাতে ধরা ওপরের রড। ভিড়ের বাস তো, সামলাতে পারছিল না। পেছনে একটা ছেলে, অনেকক্ষণ থেকেই সুযোগ নেবার চেষ্টা করছিল। নামার সময় হয়েছে, ছেলেটা দরজার দিকে এগোচ্ছে, মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, ব্যাপারটা কিন্তু ভাল হল না।

—ছেলেটা কী বলল? বটাদার মুখ হাঁ হয়ে গেছে, ছোপধরা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ দেখা যাচ্ছে, জিভটা সামান্য নড়ছে, এগোচ্ছে পিছোচ্ছে।

মানস এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে রাত্রির দিকে তাকিয়ে বলল, ছেলেটা ততক্ষণে নেমে পড়েছে। নীচ থেকে জানলা দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে গেল, বাসে এর চেয়ে ভাল করে সম্ভব নয়।

হা হা করে হেসে উঠল বটাদা। মানসও ফুলে ফুলে হাসছে। দীপের গা

গুলিয়ে উঠল। গল্পটা পুরনো, আগেই শুনেছে দীপ। সুযোগ পেয়ে চালিয়ে দিল মানস। আসলে গল্প নয়, লক্ষ্যটা আসল। সে তখন মুখ লাল করে অন্ধকারে নখ দেখার চেষ্টা করছে। অসহায়ের মতো দীপ অন্ধকার দেখল, বটাদা মানসকে দেখল, রাত্রিকেও দেখল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারল, এই মুহূর্তে কিছু বলতে যাওয়ার অর্থ আগুনে ঘি দেওয়া। তার চেয়ে থাক্, থেমে যাবে।

থেমে কিন্তু গেল না। বটাদা বলল, এইরকম একটা ঘটনা আমারও বাসে হয়েছিল। নিজের চোখে দেখা।

—কী ঘটনা, শুনি শুনি, মানস নেচে উঠল।

—শিয়ালদা থেকে উঠেছি, তখন ডবলডেকার চলত, দশ নম্বর বাস, হাওড়া আসবে, প্রচণ্ড ভিড়। তা এক পুরুষপুঙ্গব, আটচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি, এইসা বাইসেপ, এমনভাবে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, একাই তিনজনের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন, চেনা বোধহয়। মাঝে মাঝেই তাঁর দিকে ঘুরে বাইসেপ ফুলিয়ে বলছে, বাঘের বাচ্চা, বুঝলেন, বাঘের বাচ্চা!

সবাই তাকাচ্ছে। বাইসেপ আর ছাতির দিকে তাকিয়ে কেউ কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। তা, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে বাসটা দাঁড়িয়েছে, একটা ছেলে ফুটবোর্ড থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল। সিগন্যাল দিয়েছে, যেই না বাসটা নড়েছে, ছেলেটা জানলার কাছে মুণ্ডু বাড়িয়ে বলল, ও দাদা, বাঘটা আপনার বাড়ি এসেছিল, না আপনার মা গিয়েছিল বাঘটার কাছে, সেটা তো জানা হল না? বলেই ছেলেটা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

এবারে হাসিটা আরও জোরাল। বটাদা-মানসের সঙ্গে আরও কয়েকটা গলা জুটে গেছে। সেই তীব্র অশ্লীল হাসি শেষ হলে দীপ আর থাকতে পারল না। বলল, বটাদা, কিছু মনে কোরো না, আমরা বোধহয় ভুলে যাচ্ছি, আমাদের অফিসে একজন মহিলা জয়েন করেছেন। এই জাতীয় আলোচনা তাঁর সামনে না করাটাই বোধহয় রুচির লক্ষণ।

এক ফুঁয়ে সমস্ত হাসির হররা নিভে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বটাদা বলল, এই অফিসে কেউ তো ছেলে বা মেয়ে হিসেবে চাকরি পায় না দীপনারায়ণ। এখানে সবাই কর্মী। সবাই সমান। কাজেই হাসিঠাট্টা সমানভাবে মানিয়ে নিতে হবে। না পারলে এমন ব্রাঞ্চ খুঁজতে হবে যেখানে সবাই মহিলা কর্মী। কী বলো মানস?

ঘাড় নাড়তে-নাড়তে মানস উঠে গেল। ঠিক তখনই কারেন্ট এসে গেল। বেঁচে গেল দীপ। রাত্রিও তার টেবিলে গেল।

অন্যান্য দিন ওরা একসঙ্গে বেরোয়। বটাদা আর মানস বাসে ওঠে, দীপ স্কুটার স্টার্ট করে। আজ দীপ আগেই বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের পেছনে পান বিড়ির গুমটির আড়ালে স্কুটারটাকে ঠেসিয়ে রেখেছিল। বটাদা আর মানসকে বাসে উঠে চলে যেতে দেখল। রাত্রি এল পেছন পেছন।

সাদা শাড়ি, বুকের কাছে ধরে রাখা ছোট পার্স, মাথা নিচু করে কোনওদিকে না তাকিয়ে হাঁটা—পুরোটাই স্কুলের মেয়েদের মতো। তফাতের মধ্যে স্কুল-ফেরত মেয়েগুলো যায় দল বেঁধে কারণে-অকারণে হাসির বুদবুদ ওড়াতে ওড়াতে, চঞ্চলতা ঘুড়ুরের মতো ওদের পায়ে বাঁধা থাকে। রাত্রি আসে একা, চোখে স্থির হয়ে থাকে বিষণ্ণতা। দীপের কেমন কষ্ট হয়। ইচ্ছে করে, এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এই যে মেয়ে, অত গম্ভীর হবার কিছু নেই; ওপরে তাকিয়ে দ্যাখো আকাশ নীল, সেখানে বাচ্চাবাচ্চা সাদা মেঘ; বাড়িতে অপেক্ষা করে আছে বারীনের মতো বাবা, ঝজুর মতো সন্তান। হাসো। আনন্দ করো।

দীপের পা দু'টো ক্রু দিয়ে আটকানো থাকে মাটিতে। কিছুই বলা হয় না।

আজ অন্যরকম হল। গুমটির ছেলেটাকে বলল, স্কুটারটা দেখিস, নিতে রাত হতে পারে। পাঁচটা টাকা দিল। তারপর গুটি গুটি রাত্রির পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

রাত্রি হাসল। গনগনে সূর্যকে মেঘ গিলে ফেললে মেঘের পেটের ভেতর থেকে যেমন চাপা একটা আলো বেরোয়, সেই হাসি।

—ভাল? বাড়ি চললেন? স্কুটার কোথায়?

শেষটার জবাব দিল দীপ—একটু গোলমাল করছিল, সারাতে দিয়েছি।

—ইস্‌স্! কত অসুবিধে হল বলুন তো! এখন ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বাসে চেপে ফিরতে হবে।

—আপনাকে তো রোজই ফিরতে হয়, কষ্ট হয় না?

—কষ্ট হলেই বা কী করা যাবে? অবশ্য ট্রেনে করেও যাওয়া যায়। একটু ঘুর হয়।

—আজ ট্রেনেই চলুন না, দুম করে বলে ফেলল দীপ। বলেই ঘামতে লাগল। যা গম্ভীর! যদি না করে দেয়?

হাসল রাত্রি, কেন বলুন তো?

—না, একটা কথা ছিল।

ইতস্তত করেও শেষ অবধি স্টেশনের দিকেই চলল রাত্রি। বারণ শুনল না, টিকিট দীপই করল। ট্রেন আসতে এখনও মিনিট দশেক দেরি, একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে সামান্য দূরত্ব রেখে বসল ওরা। রাত্রি বলল, বললেন না কী কথা?

দীপ মাথা নিচু করল, আমি ক্ষমা চাইছি, ওদের হয়ে।

রাত্রি মুখ ঘুরিয়ে নিল,। রোদ নরম হয়ে আসছিল। ঝোড়ো হাওয়া বইল এক ঝলক। কয়েকটা গাছের পাতা উড়িয়ে নিয়ে এল।

—ক্ষমা চাইবেন কেন? তা ছাড়া প্রতিবাদ তো আপনিই করেছেন। আপনারই বরং ক্ষতি হল। একঘরে হয়ে গেলেন। বন্ধুত্বে ফাটল ধরল। হয়তো কথা শুনতে হবে পরে।

—এরা কেউই আমার বন্ধু নয়। অফিসে আসি, যাই, সেটুকুই পরিচয়। এত রুচিহীন, এত অশ্লীল! আমার অসহ্য লাগছিল। মনে হচ্ছিল, উঠে গিয়ে গলা টিপে ধরি।

রাত্রি কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমিও কিছু বলতে পারতাম। কিন্তু কী হবে? ওদের তো বদলাতে পারব না। তা ছাড়া যেখানেই যাই, সব সমান। চাকরি তো ছাড়তে পারব না। 'আপনি তো সবই জানেন, চাকরিটা আমার দরকার।

দীপ চুপ করে রইল। রাত্রি যা বলেছে তার পুরোটাই সত্যি। দীপ সমবেদনা জানাতে পারে, কিন্তু রাত্রির যন্ত্রণায় ভাগ নিতে পারে না।

ঝমঝম করে প্ল্যাটফর্ম বাজিয়ে ট্রেন ঢুকল। রাত্রি উঠল, এলাম, কাল দেখা হবে।

যেখানটায় ওরা বসেছিল, লেডিজ কম্পার্টমেন্ট সেখান থেকে একটু এগিয়ে। রাত্রি ছোট ছোট পায়ে হেঁটে গেল। ভিড়ের মধ্যে আর দেখা যাচ্ছে না। ট্রেন থেকে দলা দলা মানুষ নামছে, ট্রেনটা আওয়াজ করল। দীপ ছুটে গিয়ে সামনের কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ল।

প্লাটফর্মে নেমে দীপকে দেখে রাত্রি অবাক, একি, আপনি এখানে?

—চলে এলাম। আপনি একা যাবেন?

—রোজই তো আমি একা যাই।

—তা যান, কিন্তু আজ ওইরকম একটা ব্যাপার হল, মন খারাপ তাই ভাবলাম...

—মন খারাপ তো কী? যদি কিছু করে বসি? খেপেছেন? অত নরমসরম মেয়ে আমি নই। তা ছাড়া ওসব কখন ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। প্ল্যাটফর্মের মোরামে জুতোর শব্দ হচ্ছিল। এখনও মোরামের নীচে জল, একদিনের রোদে পুরোটা শুকোয়নি। স্টেশন পার হয়ে রাস্তাতে নেমেও দেখল একদিকে জল কাদা হয়ে আছে।

—বাসে এলেই ভাল করতেন, জলকাদায় পড়তে হত না।

—সে তো এখান থেকে রিক্সাও নিয়ে নেওয়া যায়।

দীপের চোখ কি পড়তে পারল রাত্রি? রিক্সার দিকে না গিয়ে লেভেলক্রসিং পেরিয়ে হাঁটতে লাগল।

নরম চাঁদ উঠেছে মাখনের ডেলার মতো। গোটা নয়, ভাঙা। একটা পাশ কেউ খুবলে খেয়ে নিয়েছে। এখনও দিনের আলো আছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দীপের মনে হচ্ছিল, রাস্তাটা চেনা, আগেও এসেছে, মানুষটাই নতুন এই যা।

রাত্রি বলল, এতটাই এলেন যখন বাড়ি অবধি চলুন। হালুয়া রান্না করেছি। কিসমিস আর কাজু দিয়ে। ওরা খুব পছন্দ করে। ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিলাম সকালে।

দীপ জবাব দিল না। পা মিলিয়ে হাঁটল। ওদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে, সেই অবধি এসে থামল।

—কী হল?

—আজ থাক।

রাত্রি তাকিয়েছিল। দৃষ্টিতে আমন্ত্রণ ছিল না, অনুনয়ও। অনুরোধ ছিল। যেন একটু ভাললাগাও।

দীপও তাকিয়েছিল। নিরুচ্চার দীপ যেন বলছিল, বলেছিলাম না, নিরামিষ খেতে ভালবাসি না। কাজু-কিসমিস-হালুয়ার নেমন্তন্ন? আজ থাক। যেদিন ছায়াটা সরে যাবে, তেমনি করে ডাকবেন, আসব বইকি, না এসে যাব কোথায়?

দীপ ঘুরল। ফিরে যাবে। রাত্রি যেতে গিয়েও একটু দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল। একবারও পেছনে না তাকিয়েও দীপ রাত্রির দৃষ্টি ছুঁতে পারছে, তার সমস্ত শরীরে। সারাটা রাস্তা রাত্রি দীপের সঙ্গে হাঁটল।

"মাঝে অনেকদিন ডাইরি লেখার সুযোগ হয় নাই। বেশ কিছু ঘটনা

আমাদের সংসারে দ্রুত ঘটিয়া গেল। তাহারই প্রভাবে আমাদের সব কিছুতেই বেশ ওলোটপালোট। তাছাড়া আমার ভিতরেও ঢেউ উঠিতেছিল। সেই ঢেউ আমি নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করি নাই। স্রোত যেন আমাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া মোহানার দিকে ভাসাইয়া নিয়া যাইতেছিল। প্রশ্ন হইল, কোথায় সেই মোহানা? ইহার শেষ কোথায়?

আগের দিন ডাইরি যেখানে থামাইয়া ছিলাম, সেখানে লিখিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত আমার প্রথম বাক্যালাপের কথা। বিস্তারিত লিখিবার আগেই ঘরে কে যেন আসিয়া গিয়াছিল, ডাইরি বন্ধ করিয়া বালিশের তলায় গুঁজিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ প্রথমে তাহাই লিখি।

কথা বলিবার ইচ্ছাটা তো বহুদিনের, কিন্তু কী দিয়া শুরু করিব? অত গম্ভীর মানুষ। যদি কিছু ভাবিয়া বসেন? তাই স্থির করিলাম, আমি রোগী, রোগীর মতোই কথা বলি।

সেদিন উনি বেশ প্রসন্ন ছিলেন। আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিয়া ইনজেকশন দিলেন। টুসি ওইটুকু সময়েই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল; আমার অনুমতি লইয়া নীচে নামিয়া গেল। তিনি জিনিসপত্র গুছাইয়া উঠিতেছিলেন, আমি তাঁহার দিকে ফিরিলাম।

বলিলাম, আমি কি এখন ভাল হয়ে গেছি?

ওঠা হইল না। বসিয়া পড়িলেন। আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, পুরো নয়, তবে অনেকটা। এই যে কথা বলতে পারছেন, ভাল না হলে কি পারতেন?

আমি হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম। কথা ক'টি বলিয়া নয় কিন্তু। বুকের মধ্যে হাপরের আওয়াজ শুনিতেছিলাম। হামানদিস্তার গুমগুম শব্দ। কোনওরকমে নিজেকে সামলাইয়া নিলাম। তাঁহার সামনে নিজের উত্তেজনা প্রকাশ করা উচিত হইবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কথা বলা বারণ নয় তো?

তিনি স্মিত হাসিলেন; বলিলেন, বারণ কেন হবে? কথা বলা তো ভাল, মন হালকা হবে। বলুন কার সঙ্গে কথা বলবেন, তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এইবার আমি একটু প্রগলভতা করিলাম। বলিলাম, আপনি যে বাবামশাইকে বললেন, যেদিন গরিব মানুষ নিজেরটা বুঝে নিতে শিখবে, সেদিনই আসল স্বাধীনতা, সেটা কি ঠিক?

মনের মতো বিষয় পাইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও যেন দূরে তাকাইয়া বলিলেন—এ স্বাধীনতা মিথ্যে, এ ঝুটা আজাদি আমরা চাই না। এ কাদের স্বাধীনতা? বৃটিশ তাদের রাজত্ব বিক্রি করে গেছে কিছু ব্যবসায়ীর হাতে। দেশের মালিকানা কয়েকটা পরিবারের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। সত্যিকারের স্বাধীনতা সেই দিন আসবে, যেদিন ক্ষমতা থাকবে শোষিত মানুষের হাতে। সেই অবস্থাকে বলা হয় জনগণতন্ত্র। বিপ্লব ছাড়া তেমন স্বাধীনতা সম্ভব নয়।

উত্তেজনার বশে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়া লজ্জা পাইলেন বোধহয়। আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, এ সব কথা আপনি বুঝবেন না। না বুঝিলেও প্রতিটা শব্দ আমার মনের ভিতরে গাঁথিয়া নিলাম। জানিতে চাহিলাম, তার মানে কুমোর-কামার-চাষী-তাঁতী ওরাই দেশ শাসন করবে?

—আলবৎ। দেশটা তো আসলে ওরাই চালায়।

—পারবে?

—কেন পারবে না? সোভিয়েত রাশিয়া বলে একটা দেশ আছে, সেখানে আপনাদের মতো রাজা-বাদশাদের বেশিরভাগকে সাধারণ মানুষ মেরে ফেলেছে, কেউ কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

—কী সাংঘাতিক। আপনি কি আমাকেও মেরে ফেলতে চান? তাহলে আর কষ্ট করে বাঁচালেন কেন?

এবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন তিনি। পরক্ষণেই কে কী মনে করিবে ভাবিয়া হাসি সংবরণ করিলেন। আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, আপনাকে কেউ কিছু করবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার শেষ কথাগুলি আমার মনের মধ্যে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিলাম। আমাকে কেহ কিছু করিবে না। কেন? আমিও তো শত্রুপক্ষ। তাহলে? তিনি বারণ করিবেন? কেন? আমি তাঁহার রোগী বলিয়া? আমি নারী বলিয়া? আমি সুন্দরী বলিয়া? আমাকে তিনি মনে মনে ভালবাসেন বলিয়া? শেষ প্রশ্নটায় হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ জবাব দিতে দিতে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বাড়িতে এর মধ্যে কিছু গুরুতর গোলযোগ দেখা দিল। পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল দূরে। ছেলেটি কৃতী, কলিকাতায় পড়াশুনা করিতেছিল, দু'তিনটি পাশও দিয়াছে। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। খবর পাওয়া যায় দেরিতে। পার্বতীর শ্বশুরকুল সমস্ত কিছুর জন্য পার্বতীকেই দায়ী করে। তাহারই কপাল দোষে নাকি স্বামীর অকালমৃত্যু হইয়াছে। অত্যাচারও শুরু হয়। যথাসময়ে বাবামশায়ের কানে সে খবর পৌঁছায় এবং তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া বাবামহাশয়, তাহাকে বাড়িতে আনাইয়া নেন।

পার্বতীর বৈধব্য বাবামহাশয়কে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। আমার যন্ত্রণা তিনি বুঝিতে পারিতেন। বাবার চোখ, ফাঁকিটা ঠিকই ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সেজন্য নিজেকে কখনো ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু পার্বতীর যেন ভগবানের মার। সবকিছু বিচার-বিবেচনা করিয়া বিবাহ দিয়াও এতখানি শোক পাইবেন, স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

জমিদারিতেও বিভিন্ন স্থানে গোলযোগ দেখা দিতে লাগল। বাবামহাশয় বুঝিতে পারিলেন, একা আর সামলানো যাইবে না। পুত্রসন্তানটি নিতান্তই বালক। তাহার ওপর ভরসা করা যায় না। এমতাবস্থায় যাহা করা উচিত তাহাই করিলেন। আমার স্বামীকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন।

সেদিন তিনি আর একটি জীবনের শিক্ষালাভ করিলেন,—পরকে আদর দিয়া মাথায় তুলিয়া নাচিলেও সে কখনো অপন হয় না। আমার স্বামীর মতন মানুষ হইলে তো কথাই নাই। আমার স্বামী বাবামহাশয়কে সাহায্য করা তো দূরস্থান, প্রথমেই সম্পত্তির ভাগ চাহিলেন।

বাবামহাশয় স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তবু আমার মুখ চাহিয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি তো পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকো, সম্পত্তির ভাগ নিয়ে কী করবে?

স্বামী জবাব দিলেন, পূজার্চনাতেই দিন কাটাব। সম্পত্তি ঈশ্বরের ভোগে লাগবে।

এতোবড় সম্পত্তি বাবামহাশয় একা একা এমনি সামলাইতেন না। চোখ ও কান ভালরকম খোলা। ঈশ্বর যে আসলে গুরুর বেশে মর্ত্যে আসিয়াছেন, বাবামহাশয় সে তথ্য বিলক্ষণ জানিতেন।

স্বামী প্রস্তাব দিলেন, আপনি অর্দ্ধেক সম্পত্তি বিগ্রহের নামে দেবোত্তর করে আমাকে সেবাইত করে দিন।

বাবামহাশয় প্রশ্ন করিলেন, আমরা বৈষ্ণব, তুমি শাক্ত; আমাদের বিগ্রহের নিয়মিত পূজা-অর্চনা তুমি করবে কী করে?

স্বামী অস্বস্তিতে পড়িয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আলোচনা ওইখানেই শেষ হইল। তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লোকমুখে ঘুরিয়া টুসি মারফত আমার কানে পৌঁছাইল।

বাবামহাশয় কিন্তু থমকাইয়া গেলেন। কালসাপকে চিনিতে ভুল করিলেন না। রাতারাতি নদীর ওপাড়ে কালীমন্দির নির্মাণ করাইয়া বিগ্রহের নামে দেবত্র হিসাবে কিছু সম্পত্তি স্থানান্তর করিলেন, এবং আমার স্বামীকে তাহার সেবাইত নিযুক্ত করিলেন। তারপর স্বামী কিছু বুঝিয়া উঠিবার আগেই লোক দিয়া তাঁহাকে মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। কার্যত এ বাড়িতে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

আমার যেন মুক্তি হইল। কোনও সম্পর্ক ছিল না। শারীরিক সম্পর্ক দূরস্থান, এক ঘর এক শয্যাও ছিল না। মুখ দেখাদেখিও বহুদিন বন্ধ হইয়াছিল। তবু তো একই বাড়ি। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতাম, হোম-যজ্ঞের আয়োজন লক্ষ করিতাম, গৈরিক বসনের প্রান্তভাগ কখনো ছাদে শুকাইতে তাহাও চোখ এড়াইত না। মানুষটা যে আছে, নিকটেই, আমার সমস্ত জাগতিক অধিকার মুঠোয় ধারণ করিয়া সেই চিন্তাতেই আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত। যেদিন খবর পাইলাম, তিনি বাড়ি হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, আমার যেন পূর্ণ আরোগ্য হইল। প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল, আমার নিজস্ব কক্ষ, যে কক্ষে আমার শৈশব হইতে যৌবন অবধি অতিবাহিত হইয়াছে, যে কক্ষের সহিত আমার নাড়ির টান, তথাপি যে কক্ষ সাধ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া এই চিলেকোঠায় উঠিয়া আসিয়াছিলাম, একটিবার চোখের দেখা দেখিয়া আসি।

ইচ্ছাটা দমন করিলাম। এই কারণে যে এইসব করিতে গিয়া চিলেকোঠাও যদি হারাইয়া বসি। এখন চিলেকোঠাই যে আমার সব। চিলেকোঠাতেই যে তাঁহাকে একান্তে পাইব।

এর মধ্যে টুসি-মারফত তাঁহার সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

তাঁহাদের আদিনিবাস গঙ্গার ওই দিকে। তাঁহার পিতা মাপজোকের কাজ করিতেন, সরকারি চাকুরি, সেই সূত্রেই এদিকে আসা। তেমন বড়সড় কিছু নয়, সাধারণ চাকুরি। তিনি যখন কলিকাতায় ডাক্তারি পাঠরত, সেই সময় হঠাৎ সর্পাঘাতে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পাশ করিয়া তিনি আর উচ্চশিক্ষার চেষ্টা না করিয়া গ্রামে আসিয়া প্র্যাকটিস শুরু করেন। শোনা যায়, তিনি নাকি বলিয়া থাকেন, যে গ্রামে বিনা চিকিৎসায় আমার বাবার মৃত্যু ঘটেছে সেখানেই চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া আমার ব্রত। তাঁর বিধবা মায়েরও নাকি সেই রূপই ইচ্ছা ছিল। তবে গ্রামে সব কিছুতেই সত্য মিথ্যার

আধাআধি মিশেল থাকে। কেউ সামান্য ভাল হইলেই যেমন তাহাকে দেবতার আসনে বসাইবার প্রবণতা থাকে, কারও সামান্য ত্রুটি লইয়াও মানুষ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দেয়। নিস্তরঙ্গ গ্রামে এইগুলিই বাঁচিয়া থাকিবার রসদ।

তিনি মাতৃ-অন্ত প্রাণ। মায়ের প্রতি অতি বিশ্বস্ত। মায়ের প্রতিটি ইচ্ছাই তাঁহার কাছে আদেশ। কিন্তু শোনা যায় ইদানীং সেই মাও অসুস্থ। সন্ন্যাস রোগে তাঁহার মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে অসাড় হইয়া যাইতেছে। পুত্রের ভাল-মন্দের প্রতি আর তিনি নজর রাখিতে পারেন না। কার্যত তিনি নিজেই নিজের অভিভাবক।

ঘটনাটা কতদূর সত্য তাহা একদিন আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিতেছিলেন, দেখিলাম তাঁহার বেনিয়ানের একটি বোতাম ছেঁড়া, বস্ত্রখণ্ড আলগা হইয়া ঝুলিতেছে। বুকের মধ্যে কী যেন হইতে লাগিল। তীব্র ইচ্ছা হইল উঠিয়া সেলাই করিয়া দিই। অতি কষ্টে দমন করিলাম।

পরদিন আবার পুরানো আলোচনা শুরু করিলাম। তিনি তাড়ায় ছিলেন, হয়ত কোনও জরুরি ডাক আছে, যাইতে হইবে। বলিলাম, আজ কি খুব ব্যস্ত আছেন?

—না, বলুন, অন্যমনস্ক হইয়াই জবাব দিলেন তিনি। আমি বলিলাম, আপনি সত্য বলিলেন না, আজ থাক, পরে বলব।

এবারে হাসিয়া ফেলিলেন। চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, না, একজনের আসার কথা আছে, তাই তাড়াহুড়ো করছিলাম। চিন্তা নেই, সে এসে বসে থাকবে। বলুন আপনার কথা।

—আপনার বন্ধু কেউ? বলিয়াই মনে হইল অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করিতেছি।

তিনি গম্ভীর গলায় বলিলেন, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। আমরা যারা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী, এক পথের পথিক তারা বন্ধু তো নিশ্চয়ই। তবে আমরা নিজেরা নিজেদের বলি কমরেড। কমরেড কাকে বলে জানেন?

আমার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, অপাত্রে দান করিয়া ফেলিয়াছেন। তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, বলুন কি বলছিলেন?

আমি তাঁহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিলাম। জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইলাম। তারপর মনে জোর আনিয়া বলিলাম, এই যে আপনি সবল-দুর্বল, রাজা-প্রজা, শোষক-শোষিত এইসব কথা বলেন, আপনার কী কখনো মনে হয় না, একই বাড়ি একই ছাদের তলায়ও শোষক ও শোষিত পাশাপাশি থাকতে পারে?

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর খুব গাঢ় স্বরে বলিলেন, হয়তো ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমাদের তো একটা জায়গায় শুরু করতে হবে।

জোর পাইলাম। বলিলাম, আমরা স্কুলে পড়েছিলাম চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। বাড়িতে চারদেয়ালের মধ্যে যে মেয়েরা রয়েছে তারাও তো কত যুগ ধরে একই রকম শোষিত, তাদের শোষণের চেহারাটাও আপনারা ভাল করে জানেন না, তাদের জন্যে আপনাদের কি কিছুই করার নেই?

হাঁপাইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অবাক হইয়া আমাকে দেখিলেন। আমার মুখে ইংরিজি শুনিয়া বোধহয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কিছু না বলিয়াই হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন আসিয়াই ক্ষমা চাহিলেন, কাল আমি ওইভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ায় লজ্জিত। গিয়ে সারারাত চিন্তা করেছি। আপনার প্রতিটি কথাই যথার্থ। আমরা বাড়িতে মা-বোনেদেরই যদি মুক্ত করতে না পারলাম তাহলে কিসের সংগ্রাম কিসের বিপ্লব?

আমি ক্লান্ত স্বরে বলিলাম, ও কথা থাক। কাল উত্তেজনার বশে বলে ফেলেছি। অপরাধ নেবেন না।

তিনি জোরে জোরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, তা কেন? আপনি তো ঠিকই বলেছেন। কিন্তু মেয়েদের মুক্তির উপায় তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতায়। আর সেটা নির্ভর করছে শিক্ষার ওপর। বিদ্যাসাগর ঠিকই ভেবেছিলেন, আসল হচ্ছে স্ত্রীশিক্ষা। শিক্ষা হলেই আসবে চাকরির সুযোগ, আর তখনই...

—আচ্ছা, আমি কি একটু হাঁটতে পারি?

তাঁহার বক্তৃতা আমি মাঝপথে থামাইয়া দিলাম। তিনি হঠাৎ বাধা পাইয়া কিছুক্ষণ থমকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই, তবে প্রথমেই বেশি নয়। অল্প অল্প, দু'-চারপা। সয়ে গেলে আর একটু বেশি, ধরুন ছাদ পর্যন্ত।

আবার তাঁহার কথার মাঝখানে বাধা দিলাম, আমি কি একটু হাঁটব? আপনার সামনে, এখনই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হাঁটুন না, আমি দেখছি।

তাঁহার জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই আমি ততক্ষণে বিছানার ওপর উঠিয়া বসিয়াছি। তারপর খাট হইতে দু'টি পা নীচে নামাইয়া মাটিতে রাখিয়াছি। পা দু'টি নামানোর সময় পায়ের গোছ হইতে বেশ কিছুটা উপর পর্যন্ত শাড়ি উঠিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি শাড়ি ঠিক করিলাম। করিতে করিতেই আড়চোখে দেখিলাম তিনি আমার ফর্সা পায়ের দিকে তৃষিতের মতো চাহিয়া আছেন।

পা মাটিতে ফেলিয়া শরীরটা বিছানা হইতে তুলিয়া হাঁটিবার চেষ্টা করিতেই সমস্ত পৃথিবী যেন দুলিয়া উঠিল। অতদিনের অনভ্যাস, হাঁটু দু'টিতে জোর নাই। তাছাড়াও আরও কী কী কারণ সব খুলিয়া বলা যাবে না। যাই হোক, টলিয়া পড়িয়া যাইতেছি, দেওয়ালটা ক্রমশঃ মাথার কাছাকাছি আসিতেছে, এইবার ধাক্কাটা লাগিবে, চোখ বুঁজিয়া ফেলিয়াছি; হঠাৎ কে যেন আমাকে ধরিয়া ফেলিল। নিজেকে সামলাইয়া চোখ খুলিয়া দেখিলাম, আমার মাথা তাঁহার বুকের মধ্যে, দু' বাহুতে শক্ত করিয়া আমার শরীর ধারণ করিয়া আছেন তিনি। তাঁহার স্বেদ ও পৌরুষ মিশ্রিত ঘ্রাণ আমার শরীরে ছড়াইয়া যাইতেছে। মনে হইল, দ্বিতীয়বার আমি জ্ঞান হারাইব। হাঁটু দুটি ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, জিভ শুকাইয়া গিয়াছে, বুকের মধ্যে পাথর ভাঙার শব্দ।

কানের কাছে তিনি ফিসফিস করিলেন, কোনও ভয় নেই। আপনি পড়ে যাননি। চলুন, আপনাকে শুইয়ে দিই। আজ থাক, অন্য দিন হাঁটবেন।

ধীরে ধীরে আমাকে বিছানায় শোয়াইয়া তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন, এখন ভাল লাগছে?

ঘাড় নাড়িলাম। মিথ্যা মিথ্যা, ভাল এখন আর লাগিতেছে না।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, একটু জল খাবেন?

জবাবের অপেক্ষা না করিয়া আমার মাথার কাছে রাখা জলের গ্লাশ হইতে একটু জল আমার মুখে ঢালিয়া দিলেন। জল খাওয়াইবার সময় তাঁহার অন্য হাতের চারটি আঙুল আমার গালে রাখিলেন। জল খাওয়ানো শেষ হইলে যেন আমার অনুমতি নেবার জন্য বলিলেন, এবার আমি আসি?

আমি হ্যাঁ বলিলে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি দরজার বাহিরে নিক্রান্ত হইলেই ভাবনা আমাকে গ্রাস করিয়া নিল। আমি পড়ি নাই? পড়ার আর কতটুকু বাকি আছে? এখন আমি অণাধ জলে। পাড়ে উঠিয়া আসিবার সামান্য সাঁতারটুকুও আমার জানা নাই।

আমি তাঁহার কথা ভাবিতেছিলাম। তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া আমি তাঁহার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনিয়াছি। হৃদ্‌যন্ত্র অত দ্রুত ছুটিতেছিল কেন? তিনি কি যতটুকু সময় আমাকে ধরিয়া রাখিলেই চলিত তাহা অপেক্ষাও বেশি সময় আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ছিলেন না? আমার কপালে যে হাতটি রাখিয়াছিলেন, তাহার আঙুলগুলি কি কাঁপিতেছিল? জল খাওয়াইবার সময় আমার গালে তো হাত রাখিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু কেন তিনি আমার কপোল স্পর্শ করিলেন? এবং যাইবার সময় ওই অনুমতি? ওই গলার স্বর?

তবে কি তিনিও? হ্যাঁ তিনিও। মনে মনে ইহাই বারবার আবৃত্তি করিয়া রাত জাগিয়া কাটাইয়া দিলাম।

—কাকু, তুমি গাভাসকরের খেলা দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, গাভাসকর বড় না শচীন বড়?

—দু'জনেই খুব বড় ব্যাটসম্যান।

—না, তা হবে না। একজনকে যদি সবচেয়ে বড় বলতে হয়, তাহলে কি তুমি দু'জনের নাম করবে?

দীপ একটু ভাবল, তার পর বলল, দু'জনের মধ্যে আমার মতে শচীনই বড়।

—গুড্, আমার সঙ্গে সেম সেম। তুমি আমার দলে। দাদু বলে গাভাসকর বড়, আর আমার সঙ্গে রোজ ঝগড়া হয়।

—আসলে বেশিরভাগ ব্যাটসম্যানই যখন ব্যাট করে, তখন মনে হয় ব্যাটটা হাতে আছে বল আটকানোর জন্যে। শচীনের হাতে ব্যাট থাকলে মনে হয় ব্যাটের কাজ বলটাকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়া। তাই শচীনই দ্য গ্রেটেস্ট। এই জিনিসটা আর ছিল ভিভ রিচার্ডস-এর মধ্যে।

এই অবধি বলে দীপ থেমে গেল। ঋজু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফ্যালফ্যাল করে। দীপ প্রসঙ্গ বদলাল।

—তুমি ফুটবল খেলতে ভালবাস না ক্রিকেট?

—ক্রিকেট।

—কার সঙ্গে খেল?

—দাদু। দাদু বল করে, আমি ব্যাট করি। দাদু একদম ব্যাট করতে পারে না। খালি বল করে। তাও আস্তে আস্তে। আমি এমন জোরে মারি। দাদু বলটা খুঁজেই পায় না। ...তুমি ব্যাট করতে পার?

—আমিও খালি বলই করতে পারি। ...আচ্ছা ঋজু, বাবার সঙ্গে খেলতে না তুমি?

—বাবা? বাবার তো ফিরতেই সেই সন্ধে। ততক্ষণে আমাদের খেলা শেষ। বাবার সঙ্গে শনিবার-রোববার বেড়াতে যেতাম। বাবা-মা আর আমি। নিক্কো পার্ক, সায়েন্স সিটি।

অনেকেই খেলছে কাছে-দূরে। সকলেই ঋজুর চেয়ে বড়। ঋজুর বয়েসি দু'-তিনজন মেয়ে নিজেদের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। ঋজুটা সত্যিই একা। আজ দীপ বারীনকে রিলিফ দিয়েছে। ঋজুকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে মাঠে। ক'দিন বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠ শুকনো। ফুটবলই খেলছে বেশির ভাগ। ঋজু শুধু ক্রিকেট ব্যাট হাতে বেরিয়েছে। দীপের কিনে দেওয়া নতুন ব্যাট। দীপের হাতে ক্যাম্বিস বল।

—আচ্ছা কাকু, ডায়নোসরটা কি আসল?

দীপ অন্যমনস্ক ছিল। ঋজুর কথায় মাথা ঘোরাল।

—সায়েন্স সিটিতে যে ডায়নোসরটা আছে সেটা কি আসল?

—তোমার কী মনে হয়?

—ঠিক বুঝতে পারি না। মা বলেছে আসল। আমি কথা না শুনলে ওটা নাকি যে কোনও সময় চলে আসতে পারে। দাদু অবশ্য বলেছে ডায়নোসর এখন আর বেঁচে নেই। অনেকদিন আগেই পৃথিবী থেকে চলে গেছে।... আচ্ছা কাকু, বেঁচে না থাকলে কেউ তো আর ফিরে আসতে পারে না, না?

দীপ ছোট করে বলে, হুঁ।

ঋজু ব্যাট দিয়ে একটা ছোট পাথরকুচিকে ঠুকে দূরে ঠেলে দেয়, —তাই সম্বিত বলছিল।

—সম্বিত?

—আমার বেস্টফ্রেন্ড। আমরা এক সেকশনে পড়ি। সম্বিত সেনগুপ্ত। দাদু তো বলে, বাবা নাকি আকাশ থেকে আমাকে দেখছে। যেদিন আমি খুব ভাল রেজাল্ট করব স্কুল থেকে ফার্স্ট হয়ে বেরুবো, সেদিন বাবা নেমে আসবে; সম্বিত বলেছে ও সব বাজে কথা, কেউ মরে গেলে আর ফিরে আসে না। ডায়নোসরের মতো। ঠিক কিনা?

দীপ বলল, সন্ধে হয়ে আসছে, চলো এবার ফিরে যাই।

বাড়িতে ঢুকতেই ঋজু দাঁড়িয়ে পড়ল। গন্ধটা দীপও পেয়েছিল। দীপের হাতটা শক্ত মুঠোয় ধরে ঋজু বলল, লুচি।

ততক্ষণে রাত্রি বেরিয়ে এসেছে রান্নাঘর থেকে, —হ্যাঁ, লুচি। কেক কাটা হয়েছে, খাওয়াও হয়ে গেছে। নতুন ব্যাট নিয়ে কাকুর সঙ্গে মাঠ থেকে ঘুরে আসাও হয়েছে। এবার লুচি। জন্মদিন, তাই সাতখুন মাপ। লুচিও হবে। কিন্তু তার আগে কাল ক্লাশ টেস্ট। দাদু ভেতরে অপেক্ষা করছে। যাও, পড়াটা শেষ কর, তারপর লুচি।

ঋজু গুটি গুটি হাত-পা ধুয়ে ভেতরে ঢুকল। বারীনের গলা পাওয়া গেল। আরে দাদুভাই, কখন এলে? টেরই পাইনি।

—কানটা একদম গেছে। কিছুই শুনতে পায় না আজকাল। আমাদের কথাবার্তা, কিছুই কানে যায়নি।

বলতে বলতে রান্নাঘরে ঢুকল, লুচিকটা ভেজে ফেলি। পড়া হয়ে গেলেই তো ছুটতে ছুটতে আসবে, মা খেতে দাও। তখন যদি বলি দাঁড়া, ভেজে ভেজে দিচ্ছি, অনর্থ করবে। একদম বাবার ধাত।

শেষ কথাগুলো বলেই কেমন চুপ করে গেল রাত্রি। দীপের মনে পড়ল, এ বাড়িতে ব্রতর নাম করা বারণ। বারীন ফতোয়া দিয়ে দিয়েছেন। আবার রাত্রি বলে উনিই দিনরাত ছেলের স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে আছেন।

ক'দিন টানা বৃষ্টির পর দিন দুই হল রোদ উঠেছে। কেমন ভ্যাপসা গরম। আজকালের মধ্যেই আবার ঢালবে। আকাশটাও ঝকঝকে নয়, কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া। তারাগুলোও যেন গরমে ধুঁকছে।

হাত মুছতে মুছতে রাত্রি বেরুলো। শেষ। এতক্ষণে একটু হাঁপ ছাড়ার সময় পেলাম। বলুন, অফিস থেকে আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলেন?

—বেশি নয়, মিনিট পনেরো। আপনি যাননি, অফিসও শান্ত ছিল।

—আমি গেলেই কি সব অশান্ত হয়ে যায়?

—কী যে হয়! যেন একটা চাপা ক্ষোভ। নিজের নিজের চেহারাগুলো বদলে ফেলে। ...বাদ দিন, ব্রতও কি লুচি খেতে ভালবাসত।

মলিন হাসল রাত্রি, লুচি বলে নয়, যেকোনও কিছু। তর সইত না। এখখুনি দিতে হবে। খিদে সহ্য করতে পারত না। চেহারাটাও বড়সড় ছিল। খেলত না এককালে।

—দেখেছেন ব্রতর খেলা?

—বাঃ দেখব না? ধরে ধরে খেলা দেখাতে নিয়ে যেত। আমি অবশ্য তেমন বুঝতাম না। ওকেই দেখতাম। সবাই বলত ভাল খেলে। আমিও তাই বলতাম।

—মন রাখতে?

—তা বলতে পারেন। তখন আমি ভাল বললে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। খুশি হত।

—আর পরে?

—আমিই বলা বন্ধ করেছিলাম। ঋজু হয়েছে তখন, ছোট। ভাল ভাল করলে টেনে মাঠে নিয়ে যাবে। কে দেখবে ছেলেটাকে? তার চেয়ে ভাল না বলে চুপ করে থেকে দেখলাম, ওর উৎসাহ কমে গেল। আর টানাটানি করত না। আমিও বেঁচে গেলাম।

—খারাপ লাগত না? ওর কম্প্যানি থেকে তো বঞ্চিত হতেন।

রাত্রি উঠল। ভেতরে গিয়ে ঠুকঠাক করল কীসব। এসে আবার পা ছড়িয়ে বসল।

—ওর কম্প্যানি? খেলার মাঠে গেলেও ওই রাস্তাটুকু। তাও অনেক সময় ফেরার পথে আলাদা হয়ে যেতাম। বন্ধুবান্ধব হয়ত টেনে নিয়ে গেল ভিকট্রি সেলিব্রেট করতে। সেখানে আমি কোথায়? একা একাই ফিরে আসতাম।

—বলতেন না ওকে?

—বলতাম, গোড়ার দিকে। পরে দেখেছি, মানুষটা আলগা, সংসারী নয়। যেন পরের সংসার করছে। আসে যায়, টাকা পয়সা রোজগার করে, কাজ বললে করে দেয়। কিন্তু মনে মনে খুব জড়িয়ে থাকত তা নয়।

—ঋজুকে? ওকে তো খুব ভালবাসত?

—নিজের মতো করে। সময় কম দিত। উইকএন্ডে বেড়াতে নিয়ে যেত। আমিও যেতাম। সেটাও মনে হত, না নিয়ে গেলে বাবা যদি কিছু বলে, সেই ভয়ে।

—বাবাকে ভয় করত?

—ভয় ঠিক নয়, সমীহ করত। মানত। ওইরকম বাবা, না মেনে যাবে কোথায়?

আশ্চর্য মানুষ উনি, না?

খানিকক্ষণ সামনে তাকিয়ে রইল রাত্রি। কথা খুঁজল। তার পর বলল, মাঝে মাঝে মনে হত বিয়েটা ওর সঙ্গে হয়নি, ওর বাবার ছেলের সঙ্গে হয়েছে। জড়িয়ে আছি যে সংসারটার সঙ্গে, সেখানে আসল লোক বাবা। আর ও, ঋজু সকলে যেন পরে এসেছে, পেছন পেছন।

—এই যে, ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, সংসারের মধ্যেই ঢেলে দিয়েছিলেন, এখন মনে হয় না ঠিক করেননি? দুঃখ হয় না? দিনগুলো ফিরে পেতে ইচ্ছে করে না?

রাত্রির মুখ থেকে একটু আগের উজ্জ্বলতা যেন মুছে গেল। বিষণ্ণতা জড় হল চোখের কালোয়। গলা নামিয়ে বলল, হয়। এখন হয়। তখন হত না। তখন রাগ হত। মানুষটাকে স্বার্থপর মনে হত। মনে হত নিজেকে ছাড়া আর কিছু ভাবে না। বাবার সঙ্গেই দিনের বেশিটা কাটত। ঋজুও সময় নিয়ে নিত। ওর পড়াশুনা। অবশ্য সেটা ও দাদুর সঙ্গে করতেই পছন্দ করে। আজই দেখুন না, আমার কাছে পড়বে না, আগেই বলে রেখেছে।

রাত্রি থামল। বড় করে নিঃশ্বাস নিল। বলল, মানুষটাকে পেলাম যেন ও চলে যাবার পর। এইভাবে চলে যাবে, কোনও নোটিশ না দিয়ে, হঠাৎ কল্পনাও করতে পারিনি। এমনিতে তো খেলাধূলা করত, এখনও প্র্যাকটিসে যেত সুযোগ পেলেই, বাড়িতেও এক্সারসাইজ করত, ভাবতাম খুব শক্তপোক্ত বোধহয়। প্রেশার ধরা পড়েছিল। জিজ্ঞেস করলে বলত, ও তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন ভাবি, আমারই তো উচিত ছিল চেক-আপ করানো, লক্ষ রাখা ওষুধপত্র ঠিকঠাক খাচ্ছে কি না। মনে হয়, ও নয়, স্বার্থপর আমিই। নিজেরটাই দেখেছি। ওর কথা কোনওদিন সেইভাবে ভাবিনি।

দীপের মনে হল রাত্রিকে থামিয়ে দেওয়া দরকার। দীপই ভুলটা করেছে। রুল ব্রেক করেছে। ব্রতকে টেনে এনেছে এই চার দেওয়ালের মধ্যে। ব্রত কিংবা ব্রতর স্মৃতি দু'টোই সমান অস্বাস্থ্যকর।

দীপ বলল, মানুষ নিজে সাবধান না হলে, অন্যে কী করবে? ও চিরকালই একটু ডেয়ারডেভিল। একবার পাড়ার ছেলেরা দুর্গাপুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিল ব্যাঙ্কে। মারপিট শুরু করে দেয় আর কি। বলেছিল, ইয়ার্কি হচ্ছে, আমরা পাড়ার বাসিন্দা, যে দুর্গাপুজোয় চাঁদা দেব।

—ও যে ওইরকম সেটা তো গোপন করেনি। ও-ও না, বাবাও না।

বাবাই বরং বলত, ওকে সামলে রেখো মা। আমার ছেলেটা রগচটা আছে। আমার সঙ্গে কোনও কিছুতে খিটিমিটির লাগলে আড়ালে আদর করে বাবা বলত, ভাগ্যিস আমার মা-টা এমন ঠাণ্ডা আর লক্ষ্মী। নইলে কী যে হত! আমিই পারিনি। আমারই দোষ।

মাথা নিচু করে নিজের নখ দেখছিল রাত্রি। চোখ আড়াল করে। দেখতে না পেলেও দীপ জানে সেইখানে টলটল করছে দু'ফোঁটা অশ্রু। ভেতরে জমা ছিল। দীপের জন্যেই তার মুক্তি হল। দীপের মনে হল, চলে গিয়েই যেন ব্রত আরও গভীরভাবে সব কিছুর মধ্যে মিশে আছে। রাত্রির ভেতরেও। দীপেরও কষ্ট হল, অন্যরকম। মনে হল অন্যায়ভাবে জিতে যাচ্ছে ব্রত, অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছে, যেগুলো ওর পাওয়ার কথা নয়।

—কোথায় আমার লুচি কোথায়? শিগগির লুচি নিয়ে এসো, ভীষণ খিদে। লাফাতে লাফাতে ঋজু বেরুল। পেছন পেছন বারীন।

বারীন মাথা চুলকোচ্ছিলেন। ঘরের ভেতরটা নিশ্চয়ই গরম। মাথা ঘেমে গেছে। কানের পাশ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে নামছে।

দীপের দিকে তাকালেন, আজকাল কী যে পড়ার চাপ! আমাদের যদি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হত এতদিনে ছেড়েছুড়ে বিবাগী হয়ে যেতাম। আমার মনে আছে, পাঠশালায় খালি অ আ আর শতকিয়া। শ্লেট-পেনসিল আর ভিজে ন্যাকড়া। একটু করে লিখি আর মুছি। এই করতে করতেই পাঠশালা পার হয়ে এলাই স্কুল। হঠাৎ একলাফে অনেকখানি। তখন ক্লাসের হিসাব হত উল্টোদিকে —ফোর্থ ক্লাস, থার্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। ট্রেনের মতো। ট্রেনে অবশ্য তখন আর একটা মজার ক্লাশ ছিল। ইন্টার ক্লাশ। তোমরা বোধহয় দেখনি।

অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন বারীন। আজ বারীনকে কথায় পেয়েছে। ঋজু কোলের কাছে গুটিশুটি হয়ে বসে বার বার রান্নাঘরের দিকে তাকাচ্ছিল।

বারীন বলে চললেন, কী নেই? ক্লাস-টু'র ইংরিজি, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। স্পেলিং দিয়েছে মিষ্টি, অটাম, রেইনবো, জেনারেল নলেজ— পাহাড়, নদী, চাঁদ, সূর্য, মহাবিশ্ব; বাংলাটাই বরং সহজ, রবীন্দ্রনাথ, আমাদের ছোট নদী। চেনা জিনিস।

—আর ম্যাথস্? ম্যাথ্সটা বললে না?

—তাই তো, ভুল হয়ে গেছে দাদুভাই। তবে অঙ্কে মনে হয় আমাদেরটাই ভাল ছিল। নামতা মুখস্থ করতে হত। দুলে দুলে, ছড়ার মত। কথায় বলে আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরিয়সী। আগে মুখস্থ পরে বোঝা। এদের টেবল শেখায়, ওয়ান টু নাইন, মুখস্থ করায় না। তিন নয়ে সাতাশ কড় গুনে গুনে বলে। অঙ্কটায় তেমন সুবিধার নয়।

—ওঃ মা-টা যে কী করছে? অত করে বললাম। রেডি করে রাখো। ...দাদুভাই, ততক্ষণ তুমি গল্পটা শুরু করে দাও।

—কোন গল্পটা বলব?

—কেন, কাল তো গল্পটা শেষ হয়নি। সেই যে হারুন অল রশিদ ফল বিক্রি করছিল। করতে করতে দেখল পার্ক থেকে ছেলেটাকে জোর করে দুষ্টু লোকরা ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। হারুন অল রশিদ তাড়াতাড়ি মোবাইল ফোন বের করে...

দীপ অবাক হয়ে যায়। থাকতে না পেরে বলে, কোন হারুন অল রশিদ?

প্রসন্ন দৃষ্টিতে বারীন দীপের দিকে তাকান, —খলিফা হারুন-অল-রশিদ। হিস্টরিক্যাল ক্যারেক্টার। রাত্তিরে ঘুরে ঘুরে দেশের অবস্থা দেখতেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ। এই খলিফাও কিন্তু মানুষের ভোটেই নির্বাচিত হতেন, জানো তো! কী সুন্দর ব্যবস্থা! একি আমাদের নেতাদের মতো? কালো গাড়ির কাচের আড়াল থেকে অথবা হেলিকপ্টারের দূরত্ব থেকে দেশ দেখা?

দীপ ঘাড় নাড়ল, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু ওই মোবাইল ফোন?

হাহা করে ঘর ফাটিয়ে হাসলেন বারীন, হারুন অল রশিদের মডার্ন সংস্করণ। হারুন অল রশিদ আজও আমাদের মধ্যে থাকলে কী করতেন তাই নিয়েই না গল্প।

—হারুন অল রশিদ আর নেই?

—কে বলেছে নেই দাদুভাই?

বারীন ঋজুকে কোলে টেনে নেন, —আমি জানি আর তুমি জানো। বিশ্বাস করলে আছে, না করলে নেই। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।

—কী গল্প হচ্ছে ঋজুবাবুর?

স্টিলের থালায় তিনজনের জন্যেই লুচি সাজিয়ে নিয়ে এসেছে রাত্রি। লুচি, বেগুন ভাজা, আর ছোলার ডাল। তিনজনেরই পাতে বড় বড় ফুলকো লুচি, ধোঁয়া উঠছে।

মাটিতে আসন পেতে বসেছিল ওরা। দাদুর কোল থেকে ছুটে গিয়ে আসনে বসে পড়ে লুচির মাথায় আঙুল দিয়ে একটা ফুটো করল ঋজু, আর তার পরেই 'উঃ' বলে আঙুলটা মুখে পুরে চুষতে লাগল, —তোমাকে বলেছি না, আমাকে অত গরম লুচি দেবে না।

—তাই কি হয় বাবা? লুচি গরম গরমই খেতে হয়। ওদের জন্য গরম ক'খানা ভাজলাম, তোমাকেও তাই গরম আর ফুলকো দেখে দিয়েছি। ঠিক আছে, ক'টা লুচি আগেই ভেজে রেখেছি, তা থেকে দু'টো এনে দিচ্ছি। খেতে থাক্, তার মধ্যে এগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাত্রি আবার রান্নাঘরে গেল। ঋজু নাক কোঁচকাল, —সত্যি, মা-টা যে কি করে না? একে তো এত দেরি করে আনল তাও কিনা এই রকম গরম। ওদিকে খিদেয় আমার পেট চুঁই চুঁই করছে।

হাত গুটিয়ে বসেছিলেন বারীন। দীপও।

ছোলার ডালের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে চোখে অতীত এনে ফেললেন বারীন।

—নারকেল দেওয়া ছোলার ডাল। ওর বাবার কী যে প্রিয় ছিল! ওর মা তখন বেঁচে। একবার একবাটি ছোলার ডাল সরিয়ে রেখেছে মিটসেফের ভেতরে। তখন তো ফ্রিজটিজ ছিল না। আরশোলা মুখ দেবে ভয়ে মিটসেফেই খাবার রাখা থাকত। শীতের সময়, এখনও মনে আছে। রাত্তিরে ডাল তুলে রেখেছে, সকালে লুচির সঙ্গে ছেলেকে দেবে বলে। সকালে মিটসেফ খুলে দেখে বাটি খালি, কে যেন চেঁছেপুঁছে খেয়ে রেখেছে! কে খেল কে খেল? খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল ছেলে ততক্ষণে পেট চেপে ধরে এপাশ ওপাশ। অতখানি ডাল ওইটুকু পেটে সয়? দুপুর থেকেই দাস্ত সব ডাল পেট থেকে বেরোয়, তবে ছেলে সুস্থ হয়।

তন্ময় হয়ে বলে যাচ্ছিলেন বারীন। হঠাৎ সামনে তাকিয়েই থেমে গেলেন। কে যেন রেকর্ড প্লেয়ার থেকে কাঁটা সরিয়ে নিল। থালা থেকে হাত তুলে দু হাত জড়ো করলেন, কানে হাত দিলেন, —এই কান মলছি মা, ভুল হয়ে গেছে, আর ভুল হবে না। আর একবারও ওসব মুখে আনব না।

রাত্রি ততক্ষণে ঋজুর পাতে ঠাণ্ডা লুচি দু'খানা নামিয়ে রেখে আবার রান্নাঘরে ফিরে গেছে।

বারীন লুচি ভাঙতে ভাঙতে গল্পে নামিয়ে দীপকে বললেন, শর্ত করে রেখেছিল, আজ একবারও সেই হারামজাদাটার কথা মুখে আনব না। ভুল হয়ে গেছে। মনে থাকে, বলো?

মাথা নিচু করে তিনজনেই খেয়ে যাচ্ছিল। ডালে ডুবিয়ে লুচি খেল ঋজু। ডাল খেল বাটিতে ঠোঁট লাগিয়ে। তার পরেও চেটে চেটে বাটি খালি করল। থালায় পড়ে থাকা লুচির গুঁড়োগুলোও শেষ করে আঙুল চুষতে লাগল। বারীনেরও শেষ হয়ে গিয়েছিল। বরং আস্তে খাচ্ছিল দীপ। বেগুন ভাজার খোসাটা পাতের পাশে ঠেলে দেখল ততনও আধখানা লুচি বাকি। ঋজু তাকিয়ে রয়েছে সেই দিকে।

তিনজনে পাশাপাশি বসে, কিন্তু কেউই কথা বলছে না। রান্নাঘরের দিকে একঝলক দেখল ঋজু। বারীনও দেখলেন। দীপ মাথা নামিয়ে পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে।

রাত্রি এল। একটা বড় জামবাটি ভর্তি মাংস এনে রাখল তিনজনের মাঝখানে। একটা করে ছোট কাঁসার বাটি সাজিয়ে দিল তিনজনের থালার পাশে। দেখে দেখে মাংস তুলে দিতে লাগল বাটিতে। তিন-চার টুকরো মাংস, একটা আলু। ঋজুর বাটিতে খুঁজে খুঁজে বের করা একটা মেটে। তার পর দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, আর একটা ছিল, বোধহয় গলে গেছে। খুঁজে পেলে আপনাকে দেব।

দীপ মিথ্যে বলল, আমি মেটে খেতে ভালবাসি না।

থালার পাশে কাঁসার বাটিতে মাংস। ধোঁয়া উঠছে। গন্ধও। আরও লুচি এনেছে রাত্রি। দু'টো করে তুলে দিল প্রত্যেকের প্লেটে।

তবু হাত গুটিয়ে বসে আছে ওরা তিনজন।

রাত্রি তিনজনের দিকে তাকাল। বলল, কী হল, হাত গুটিয়ে বসে কেন খাও? ...আপনিই আগে শুরু করুন। শেষ কথাগুলো দীপকে উদ্দেশ করে বলা।

পাশ থেকে ঋজু বলল, তুমি আগে খাও, তার পর আমরা খাব।

—ভীষণ পেকেছ তুমি, লাল হয়ে গেল রাত্রি, তোমাকে খেতে বলছি খাও।

বারীনও হাত গুটিয়ে ছিলেন। নরমস্বরে বললেন, ওকে বোকো না মা, আমরা ঠিক করেছি, তুমি না খেলে আমরা খাব না।

—আশ্চর্য! আমি কি খাবো না বলেছি? তোমাদের খাওয়া হোক, বসে তুলে আমি যখন খেতে বসব তখনই না খাব আমি?

বারীন তবু শুরু করেন না।

রাত্রি তখন দীপের দিকে ফেরে, —আপনি শুরু করুন তো। ওরা দু'জনে মিলে প্ল্যান্ট করেছে। আপনি খেলেই ওরা খাবে।

দীপ কী করে বলে ষড়যন্ত্রটার সেও একজন অংশীদার? তাই বলল, আমরাও তো খাব না বলিনি। হাত বাড়িয়েই আছি। আপনি এক টুকরো মাংস মুখে দিন, ব্যস, আমরাও খাওয়া শুরু করে দেব।

অসহায় দেখাল রাত্রিকে। ঠোঁট কামড়াল। মাথা নামিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল। দূরে দেখল। তারপর মাংসের বাটিতে হাতা নামিয়ে খুঁজে খুঁজে ছোট্ট একটা মাংসের টুকরো বের করে দু' আঙুলে তুলে মুখে পুরে বলল, হল তো?

খজু বলল, খাও, খাও আগে।

দাঁতের ফাঁকে মাংস ছিন্ন করতে করতে তিনজনের দিকে তাকিয়েছিল রাত্রি। যেন তিনজন প্রতিপক্ষ। যেন এই মাত্র হার স্বীকার করতে বাধ্য করেছে তাকে। রাত্রির দৃষ্টিতে অশ্রু ছিল না। আনন্দ তো নয়ই। উঠে গিয়েছিল রাত্রি। কথা না বলে খাওয়া শেষ করেছিল ওরা তিনজন।

এগিয়ে দিতে এসেছিলেন বারীন।

—তোমার অনেক দেরি হয়ে গেল বাবা। ফিরতে অসুবিধা হবে। না-ই বা গেলে আজ। বাড়িতে একটা ফোন করে দাও না হয়।

—মা চিন্তা করবে। আজ থাক। আর কলকাতা শহরে সাড়ে ন'টা একটা রাত হল। ঠিক চলে যাব।

বারীন চুপ করেছিলেন। দীপই বলল, আর আসতে হবে না, রাস্তা অন্ধকার, এবার আপনি ফিরে যান।

বারীন দু হাতে দীপের হাত ধরলেন, তুমি আজ কী যে অসাধ্য সাধন করলে বাবা!

বারীন মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

বারীনের হাত ছাড়িয়ে দীপ এগিয়ে যাচ্ছিল। যেতে গিয়েও একবার ঘুরে দেখল। চলে গিয়েও একজন ছায়াটা ফেলে রেখে গিয়েছিল। সেটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সমস্ত কিছু। ছায়াটা সরে গেছে। ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় বাড়িটা যেন অন্ধকার থেকে ফুটে বেরিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে দীপ প্রশ্ন করল, নিজেকেই, আজ কি পূর্ণিমা?

"কথায় বলে শনির দশা। সংসারে যেন শনির দশা চলিতেছে। প্রথমে জানা যায় নাই, পরে প্রকাশ পাইল, পারুর স্বামী যখন মারা যায় তখন পারু গর্ভবতী ছিল। চার মাস। সময়টা গর্ভ নষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট দেরি। তাও মহিলারা কেহ কেহ পরামর্শ দিয়াছিল, পারু কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ করিল। বাবামহাশয়ও বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, যে আসছে সে আসুক। এত বড় বাড়ি, এতগুলো মানুষ, তাদের যদি দু'মুঠো জোটে, ওরও জুটবে। আর জারজ সন্তান তো নয়। আমার মেয়ে কুল ডোবায়নি। সতী-সাবিত্রীর মতো সংসার করেছে, সেই স্বামীরই ভালবাসার ফল বয়ে নিয়ে এসেছে। ও থাকবে।

বাবামহাশয়ের এই রূপ আমরা দেখি নাই। বাহিরের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের স্নেহপ্রবণ পিতার রূপটা হঠাৎ সকলের গোচরে আসিয়া পড়িল। পারু কাঁদিল। সব শুনিয়া আমিও একটু চোখের জল ফেলিলাম।

পারুর অত সাধের সন্তান কিন্তু বাঁচিল না। আট মাসেই গর্ভযন্ত্রণা দেখা দিল। ধাই আসিয়া প্রস্তুতি নিতে নিতেই পক্ষীশাবকের ন্যায় শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইল। তাহাকে সেঁক দিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা হইল। কয়েক ঘণ্টাও কাটিল না, শিশুটি মারা গেল।

পারুর বুকফাটা কান্নায় আমরাও পাথর হইয়া গেলাম। সেইভাবে ভাবিতে গেলে অবলম্বন বলিতে পারুর আর কিছু রহিল না। বাবামহাশয়ের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া তাকানো যায় না। বাবামহাশয় বলিতে লাগিলেন, সব তাঁহার পাপ। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে তাঁহার কন্যারা।

পাপ নয়, কিন্তু সিদ্ধান্তে কিছু গলদ ছিল। পারিবারিক নিয়ম মানিয়া পারুর গর্ভাবস্থার দেখাশুনা বাড়িতেই চলিতেছিল। বাড়িতেই সন্তানের জন্ম হইবে, এমন প্রস্তুতিই করা ছিল। সেটাই ভুল। পারুর শরীর ও মনের কথা ভাবিয়া তাহাকে আরও আগেই কলিকাতা পাঠানো উচিত ছিল। বাবামহাশয় সেটা বুঝিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন তখন আর কিছু করিবার নাই।

আমাদের ছোট ভাইটি, বাবামহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান সেও ভাল হইল না।

খারাপ বলিতে নেশাভাঙ করে তা নয়। পড়াশুনায় মনোযোগ নাই, বাবার সন্তান বলিয়াই মাস্টারমহাশয় ক্লাশের গণ্ডী পার করাইয়া দেন। বিদ্যাভ্যাস বাদে অন্যান্য কর্মে তুমুল উৎসাহ। গান গায়, তাহাতে বাবামহাশয়ও আপত্তি করেন নাই, বাড়িতেই গান শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এ গান সে গান নহে। লঘু চটুল বায়োস্কোপের গানেই তাহার উৎসাহ। বন্ধু জুটাইয়া গ্রামে থিয়েটারও করিল। লোকে বাহ্ বাহ্ করিল, কিন্তু বাবামহাশয় গণ্ডীর হইয়া গেলেন।

নতুন মা ছেলেকে চোখে হারাইতেন। তিনিই আস্কারা দিয়া ছেলেকে মাথায় তুলিয়াছিলেন। একদিন বাবার সহিত ছেলের ব্যাপারেই কথা কাটাকাটি এমন পর্যায়ে পৌঁছিল, মা তিনদিন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া না খাইয়া পড়িয়া রহিলেন। এদিকে খবর পাওয়া গেল, ছেলে বন্ধু জুটাইয়া কলিকাতায় থিয়েটার না বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়াছে। শেষে বাবামহাশয়ই ছেলেকে ফেরত আনিয়া মার সামনে হাজির করিলে গোলযোগ মিটিল। অন্তত তখনকার মতো।

সবকিছুরই প্রভাব পড়িতেছিল বাবামহাশয়ের উপর। পঞ্চাশ বৎসর পার হইয়াই তাঁহাকে সত্তর বছরের বৃদ্ধের ন্যায় দেখাইত। চুল পাকিয়া গেল, শরীর দড়ির মতো পাকাইয়া গেল, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়া গেল, অমন যে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গাত্রবর্ণ তাহাও যেন ঝলসাইয়া তামার মতো হইয়া গেল। অকালবৃদ্ধ মানুষটি প্রেতের মতো বিশাল বাড়ির ভিতর ঘুরিয়া বেড়ান আর আমাদের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমাদেরও বুকের মধ্যে কেমন করিতে থাকে।

তৃতীয় যে বড় ঘটনাটি ঘটিল, সেটি দুর্ঘটনা কি না সঠিক বলিতে পারিব না। বাড়িশুদ্ধ সকলে, পাড়া-প্রতিবেশি ও আত্মীয়স্বজন হায় হায় করিল, আমার দুর্ভাগ্য নিয়া পা ছড়াইয়া ভাবিতে বসিল, কিন্তু আমার চিন্তা বহিতেছিল অন্য খাতে।

হঠাৎ এক দিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম নদীর ধারে মন্দিরে গোলমাল হইয়াছে। বাবামহাশয় প্রত্যূষে উঠিয়াই গাড়ি জুতিয়া বাহির হইয়া গেছেন। বাবামহাশয়ের ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আগেই আভাস-ইঙ্গিতে শুনিতেছিলাম, তিনি আমাকে ডাকিয়া যাহা বিবৃত করিলেন তাহাতে বুঝিলাম সংবাদটা সঠিক।

আমার স্বামী তাঁহার গুরুকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে বাস করিতেন। উল্টো বলিলাম, তাঁহার গুরু তাঁহার ঘাড়ে চড়িয়া মন্দিরের সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতেন। মন্দির লইয়া অনেকরকম কথা গ্রামে শোনা যাইত। তাহার কিছু কিছু বাতাসে উড়িতে উড়িতে আমার কান অবধিও পৌঁছাইত। মন্দিরে কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা। সেখানে বলি হয়, তন্ত্রসাধনা হয়। তন্ত্রসাধনার অনেক নিয়মকানুন। শবদেহ লাগে। তাছাড়াও গ্রামের অনেক মহিলার মন্দিরে আনাগোনা। তাঁহাদেরও কারওকে নাকি গুরুদেব তন্ত্রসাধনার সঙ্গিনী করিয়াছেন। কথায় বুঝিতাম, মন্দির সম্বন্ধে গ্রামের মানুষের ক্ষোভ ভালই দানা বাঁধিতেছিল। তাহার সিংহভাগটাই গিয়া পড়িয়াছিল গুরুদেবের উপর। আমার স্বামী, বাবামহাশয়ের জামাতা বলিয়াই হয়তো, মানুষের রোষদৃষ্টির বাহিরে ছিলেন। কাল কী সব পূজা ছিল, অনেক রাত অবধি হোম-যজ্ঞ চলিয়াছে; গ্রামের মানুষ ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ ঊষায় মন্দিরের দরজা খুলিয়া ফুল দেয় যে মেয়েটি সে প্রথম দেখিতে পায় মায়ের বিশ্বহের সামনে গুরুদেব শায়িত, তাঁহার মুণ্ডটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন। একটু দূরে আমার স্বামীও পড়িয়া আছেন, অচেতন, তখনও তাঁহার মুঠিতে দেবীর খড়্গ।

আমার স্বামীকেই পুলিশ ধরিয়া শহরে চালান করিয়াছে। বাবামহাশয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারে নাই। সকালেও স্বামীর পুরোপুরি জ্ঞান আসে নাই, কথাবার্তা অসংলগ্ন। পুলিশের তো বটেই, বাবামহাশয়েরও প্রশ্নের জবাবে যে সব কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উপর হইতে সন্দেহের ছায়া সরে নাই। তাছাড়া রাতে মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল, তিনি ও গুরুদেব ব্যতীত কেউ ছিলেনও না। প্রত্যক্ষদর্শীরাও তাঁহার হাতেই হত্যার অস্ত্র দেখিয়াছে।

বাবামহাশয়ের ভগ্ন স্বর ব্যথিত দৃষ্টি দেখিয়া অনুমান করিলাম, পরিস্থিতি মোটেও সুবিধার নয়। সমস্ত কিছু বিচার করিলে আর কাহাকেও হত্যাকারী সন্দেহ করা মুশকিল। এক্ষেত্রে জামিনের প্রশ্ন নাই। বিচারেও ফাঁসি না হইলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনিবার্য।

খবরটি শুনিয়া আমি চিলেকোঠায় উঠিয়া আসিলাম। আমার চিলেকোঠা। যেখানে আমি একা। যেখানে আমি বসন-ভূষণ-আবরণ সমস্ত খোলস ছাড়িয়া একেবারেই উলঙ্গ। যেখানে বাবামহাশয় নাই, সহানুভূতির মুখোশ পরা আত্মীয়-পরিজন নাই; কেবল ঝিরঝিরে বাতাস, পাতার শব্দ আর পাখির ডাক আছে।

আমার ডাক ছাড়িয়া হাসিতে ইচ্ছা করিল। অট্টহাস্য। মুক্তি! এতদিনে পায়ের বেড়ি খুলিয়া গিয়াছে। বহুদিন তিনি চোখের আড়ালে। তাঁহার

চেহারাটাও ভুলিতে বসিয়াছি। তবু লোকজন আসিয়া গল্পচ্ছলে তাঁহার কথা শুনাইয়া যাইত। আমার দুঃখে তাহাদের চোখের জল যেন বাধা মানিত না। এতদিনে সব কিছুর শেষ। কিছুদিনের জন্য শোক-দুঃখ উথলাইয়া উঠিবে। জনে জনে আমার কাছে শোকজ্ঞাপন করিতে আসিবে। আমার হাত ধরিয়া ইনাইয়া বিনাইয়া কত কথাই না বলিবে। আমিও ভান করিব যেন শোকে পাথর হইয়া গিয়াছি। বাক্যস্ফুট হইতেছে না। তার পর যেদিন খবর পাইব তাঁহার ফাঁসি হইয়াছে, শাঁখা-পলা ভাঙিয়া, কপালের সিন্দুর মুছিয়া আবার আগের বাসন্তী হইয়া যাইব।

আচ্ছা, যদি ফাঁসি না হয়? যাবজ্জীবন? সে নাকি চৌদ্দ বৎসর মোটে। তাও নাকি লাগে না, আট-দশ বছরেই অনেকের মেয়াদ পুরিয়া যায়। আবার যদি ফিরিয়া আসে মানুষটা? দাবি করে? আমার অধিকার? সম্পত্তি?

ভগবান! যাবজ্জীবন নয়, ফাঁসিই হয় যেন লোকটার। এমন আকুল হইয়া ভগবানকে কখনও ডাকি নাই। সারারাত স্বামীর মৃত্যু কামনায় প্রার্থনা করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। ভোররাতে হঠাৎ পারুর কথা মনে পড়িয়া গেল। ওর স্বামী মারা গিয়াছে! ও বিধবা। আমার স্বামী যদি মারা যান, যদি কেন, নিশ্চয়ই যাইবেন, এত করিয়া ডাকিয়াছি ভগবানকে, আগে তো কখনও ডাকি নাই, সাড়া না দিয়া তিনি যাবেন কোথায়, তাহা হইলে আমিও বিধবা হইব। দুই বিধবা, এই বিশাল বাড়িতে যক্ষের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কী অপরূপ দৃশ্য।

কিন্তু পারুর বৈধব্য আর আমার বৈধব্য তো এক নয়। বিধবা হইয়া পারুর সমস্ত গিয়াছে। বিধবা হইলে আমি সমস্ত ফিরিয়া পাইব। আমার অতীত এবং আমার ভবিষ্যৎ। বর্তমানকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া। কে বলিয়াছে বৈধব্য মানে বৈরাগ্য? জীবনের এই তো শুরু।

সকালে উঠিয়া মনটা দমিয়া গেল। খবর পাইলাম অনেক অর্থব্যয় করিয়া বাবামহাশয় ভাল উকিল নিয়োগ করিয়াছেন।

আমার শরীর এখন অনেকটা ভাল। ওপর-নীচ করিতে পারি। ক্ষুধাও ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রিয় খাদ্য, যেমন আম, রাবড়ি, সজনে ফুলের বড়া দেখিলে জিভে জল আসে। একটির স্থলে দুইটি খাইয়া ফেলি।

বিপদ হইল, ক্ষুধা ফিরিল শরীর জুড়িয়া। আমার যৌবন প্রস্ফুটিত হইবার আগেই নিষ্পেষিত। এক পুরুষত্বহীন বৃদ্ধ তাহা দুই পায়ে মত্ত হস্তীর ন্যায় দলন করিয়াছিল। আমিও নিজে তাহাকে কুলঙ্গীতে তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

এখন এই এত বৎসর পর, সুযোগ পাইয়া তাহা যেন তুমুল বিক্রমে ফিরিয়া আসিল। প্রবল ঝড়ের পর ভূলুণ্ঠিত বনস্পতির ফাঁক হইতে যেমন চারাগাছটি মাথা চাড়া দেয় সেইভাবে আমার শরীর শরীরে ফিরিয়া আসিল।

সমস্ত প্রকৃতি ফুলে ফুলে নিজেকে সাজাইয়া একটি ভ্রমরের পথ চাহিয়া অপেক্ষা করে, দেখিলাম। বার পুকুরে হংসীর পিছনে ধাবমান হংসের কামনার উচ্ছ্বাস চিলেকোঠার জানলা দিয়া আমার কাছ অবধি পৌঁছাইয়া গেল। গাভী রূপা ইচ্ছামতী হইয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সকলকে জড়ো করিয়া বুঝাইয়া দিল তাহার পুরুষের কাছে যাইবার সময় হইয়াছে। শুনিলাম রাতের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া কোকিল তাহার সঙ্গিনীকে আকুল স্বরে আহ্বান করিয়াই যায়।

সকলে মিলিয়া আবরণ উন্মোচন করিয়া যেন আমাকে দেখাইতে লাগিল, এটাই নিয়ম। মুখচোরাদের জন্য পৃথিবী নহে। তোমার নিজের কামনা-বাসনা-ইচ্ছা মুখ ফুটিয়া সকলকে জানাইতে না পারিলে তাহা তোমারই অক্ষমতা। সেজন্য যতটুকু ক্ষতি, যাহা অপ্রাপ্ত, তাহার দায় তোমাকেই বহন করিতে হইবে। তখন কাঁদিয়া নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দেওয়া মূর্খামির লক্ষণ। অতএব, এই সুযোগ। নিজেরটা বুঝিয়া নিতে পার যদি পাইবে, নইলে বিধাতা যে সুযোগ যাচিয়া আনিয়া দিয়াছেন তাহাও আলগা মুঠি হইতে ফসকাইয়া পড়িয়া যাইবে।

বুক বাঁধিলাম। ইতিকর্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিলাম। তিনি এখন আর নিয়মিত আসেন না। সুচবেঁধানো বন্ধ হইয়াছে। এখন খাবার ওষুধ চলিতেছে। পনেরো-বিশ দিন পর পর আসেন। ওপর ওপর পরীক্ষা করেন। কুশলসংবাদ নেন। চলিয়া যান।

সেদিন আমি বহুদিন পর আলাপ করিলাম।

—একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?

—না না, মনে করব কেন?

—আপনি যেসব কথা বলেন, এই যে শোষিত সর্বহারাদের কথা, রাশিয়ার বিপ্লবের কথা, ওই বিষয়ে বাংলায় কোনও বই আছে? আমাকে দেবেন? একটু পড়তে ইচ্ছা হয়।

খুশি হইলেন। আবার কপালে দু'টি চিন্তার ভাঁজও পড়িল। বলিলেন, বাংলা বই? আচ্ছা দেখি। জোগাড় করতে পারলে এনে দেব।

হপ্তা দুই পর সত্যসত্যই একখানা বই আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বেশ মোটা বাঁধানো বই। নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিলাম। বলিলাম, বাব্বা, এত মোটা? এ কি পড়ে শেষ করতে পারব?

—তাড়াহুড়ো নেই, তিনি আশ্বস্ত করিলেন, ওটা আপনার জন্যেই আনিয়েছি। আস্তে আস্তে পড়ুন। আপনার কাছেই রেখে দেবেন। আমার প্রয়োজন নেই।

তাঁহার না থাকিতে পারে, আমার যে ভীষণ প্রয়োজন! বইটা তাঁহাকে ফেরত দিবার জন্যই তো চাহিয়াছি। এখন ফেরত না নিলে?

প্রমাদ গনিলাম। বলিলাম, না, এই বই আমাদের বাড়িতে থাকলে কে কোথায় ফেলে দেবে, নষ্ট হবে। তার চেয়ে পড়ে আপনাকেই ফেরত দেব। আরও বই চেয়ে নিয়ে পড়তে পারব।

তিনি রাজি হইয়া ফিরিয়া গেলেন। আমার বুকের শব্দ আমি নিজেই শুনিতে পাইলাম। এইবার আমার সাহিত্য প্রতিভা! এতদিন শুধু ডাইরি লিখিয়াছি। এইবার লিখিব আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র। কিন্তু কী লিখিব? প্রাণেশ্বর! আমাকে গ্রহণ করুন! তিনি সম্ভাষণটুকু পড়িয়াই চিঠি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। তাহলে? কী লিখিব? কেমন করিয়া লিখিব?

ভাবিয়া ভাবিয়া আমার একটি চুল সাদাও করিয়া ফেলিলাম। টুসি চুল আঁচড়াইবার সময় তাহা দেখিতে পাইয়া তুলিয়া দিল। আমার চিন্তা আরও বাড়িল। পাকা চুল। তার অর্থ বার্ধক্য। চুল পাকিবে, দাঁত নড়িবে। চামড়া কুঁচকাইয়া যাইবে। দেরি নাই। ঘণ্টা বাজিয়াছে। এখনই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। অনেক ভাবিয়া একটি চিঠির মুসাবিদা করিলাম। ডাইরিতেই প্রথম লিখিলাম।

মাননীয়েষু,

প্রথমেই আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনি জ্ঞানীগুণী বড় মানুষ। পড়িবার আগেই দয়া করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন না, এইটুকুই আপনার কাছে নিবেদন।

এই চিঠি লিখিবার কারণ এই যে, চিঠিতে যাহা লেখা যায় মুখে তাহা বলা যায় না। আপনার সামনে বসিয়া নিজের মুখে কথাগুলি কোনওমতেই আমি উচ্চারণ করিতে পারিব না। তাই এই চিঠি।

যে কথা মুখে বলা যায় না, তাহা কেন লিখিতে বসিলাম? আপনি বঞ্চিত শোষিতদের কথা ভাবেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি নারীজাতির কথা তুলিয়াছিলাম। আপনি সায় দিয়াছিলেন। সেই ভরসাতেই আজ লিখিতে বসিয়াছি। একটি নারীর কাহিনী। এক অভাগিনী নারীর ইতিহাস।

আমার নিতান্ত বালিকা বয়সেই বিবাহ হয়। বাবামহাশয় পাত্র নির্বাচনে কুলকেই অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। ফলে আমার যাহার সঙ্গে বিবাহ হইল তিনি বয়েসে প্রবীণ, আমার চেয়ে ত্রিশ বৎসরেরও বেশি বৃদ্ধ। তাও মনে মনে তাঁহাকেই স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। ভুল ভাঙিল বিবাহের পর।

বিবাহের পর হইতে একদিনের জন্যও আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় কোনওরূপ সম্পর্ক হয় নাই। তিনি প্রথমে সাধন-ভজন ইত্যাদির বাহানা দেন। পরে এক রাতে আমাকে বলপূর্বক তাঁহার গুরুর নিকট প্রেরণে উদ্যত হইলে আমি বাধা দিই। তখন প্রকাশ পায় তিনি পুরুষত্বহীন, নপুংসক। সেই থেকে আমাদের পৃথক কক্ষ। পরে বাবামহাশয় তাঁহাকে দূরে মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রেরণ করেন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, হত্যার অপরাধে তাঁহাকে পুলিশ ধরিয়াছে, বিচার চলিতেছে। প্রমাণ হইলে ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, কী অপরাধে আমি এইরূপ সাজা পাইতেছি? আমার জীবন-যৌবন সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেল যে মানুষটার জন্য তাহার যোগ্য শাস্তি কী? আমি কেন সারাটা জীবন তাহারই পরিচয় বহন করিয়া বেড়াইব? আমার কি মুক্তি নাই?

শেষে আবার অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

ইতি
বিনীতা
বাসন্তী

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, বহুবার মুসাবিদা করিয়া শেষ অবধি এইরূপ চিঠি খাড়া করিলাম। চিঠিতে আমার মনের ভাব গোপন করিয়া গেলাম। তাঁহার প্রতি আমার দুর্বলতা প্রকাশ করিলাম না। শুধু আমার প্রকৃত অবস্থাটা তাঁহার গোচরে আনিলাম। যেন এক বন্দিনী অহল্যার কাতর মুক্তি প্রার্থনা। শেষে স্বামীর পদবিটাও বর্জন করিলাম। ওই নাম ও তাহার সহিত সংশ্রব আমার আর সহ্য হইতেছিল না।

চিঠিটা বইয়ের ভিতর গুঁজিয়া তাঁহার হাতে ক'দিন পরেই অর্পণ করিয়া

বলিলাম, বইটা ভীষণ কঠিন। এর চেয়ে সহজ ভাষায় লেখা বই কি আপনার কাছে কিছু আছে?

তিনি চিন্তিত হইলেন। বইটি আমার হাত হইতে ফেরত লইয়া বলিলেন, সহজ? আচ্ছা দেখি।

দিন দশ পরে তিনি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতনু অন্য একটি বই হাতে করিয়া আসিলেন। মুখচোখ দেখিয়া খুব একটা পরিবর্তন বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি চিঠিটা বই হইতে পড়িয়া গিয়াছে? সর্বনাশ? অন্য কারও হাতে পড়িলে তো অনর্থ হইবে?

অল্প কুশলসংবাদের পরই তিনি বিদায় নিলেন। দ্রুত উপরে চিলেকোঠার ঘরে ঢুকিয়া কাঁপা কাঁপা হাতে বইটি খুলিলাম। খুলিতেই খামে ভরা একটি চিঠি মাটিতে পড়িয়া গেল। দ্রুত মাটি হইতে চিঠিটা তুলিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। পাইয়াছি। আমার প্রেমিক আমার চিঠির জবাব দিয়াছেন। আমার জীবনের প্রথম পাওয়া প্রেমপত্র।

খুলিবার আগে বহুক্ষণ বুকের মধ্যে চিঠিটি ধরিয়া রাখিলাম। যেন তাঁহার স্পর্শ আমার সমস্ত শরীরে। যেন তাঁহার আলিঙ্গন। উল্টাইয়া দেখিলাম, কোনও নাম লেখা নাই। আঘ্রাণ নিলাম, যেন তাঁহার শরীরের গন্ধ লাগিয়া আছে। তার পর কোনওমতে আঙুলের কম্পন থামাইয়া লেফাফার মাথার দিকটি ছিঁড়িয়া চিঠিটা বাহির করিলাম। সুন্দর সাদা কাগজে কালো কালিতে টানা হাতের লেখা চিঠি।

কল্যানীয়াসু,

আপনার চিঠি পাইয়া যথেষ্ট বিস্মিত হইলাম। তবে রাগ করি নাই। আপনাকে বাহির হইতে দেখিয়াছি। সব সময়েই চিকিৎসক হিসাবে আমার অনুমান ছিল, আপনার অসুখের চৌদ্দ আনাই মনের। সে অনুমানই আজ সঠিক বলিয়া প্রমাণ হইল। আপনার মতো নারী বাংলার ঘরে ঘরে। তাহাদের ক্রন্দন গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যেই গুমরাইয়া মরে, বাহির হইবার পথ পায় না। আপনি ব্যতিক্রমী। আপনি নিজ দুঃখের কাহিনী গোপন না করিয়া অন্তত একজনকেও বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমাকেই বাছিয়া লইয়াছেন বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনার দুঃখ লাঘব করিতে কিভাবে আমি কাজে লাগিতে পারি অনেক ভাবিয়াও তাহার কিনারা করিতে পারিলাম না।

ভাল থাকুন। আপনার ও আপনার স্বামীর শুভকামনা করিয়া,

ইতি

চিঠিতে নাম স্বাক্ষর করেন নাই, কোথাও আমারও নাম নাই। ভাষাও খুব আন্তরিক বলা যায় না, বেশ দূরত্ব রাখিয়াই লিখিয়াছেন। তবুও আমি যে খুব ভাঙিয়া পড়িলাম তাহা নহে। আমার প্রত্যাশা এইরকমই ছিল। কল্পনায় যাহাই ভাবিয়া থাকি, স্বপ্নে আমূল সিক্ত হইয়া যতই জাগিয়া উঠিয়া শিহরিত হই, বাস্তবের মাটিতে পা রাখিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু আশা করা অন্যায়। তার চেয়েও বেশি, তিনি আমার বই পড়িবার অছিলা ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি অন্য একটি বই সঙ্গে আনিয়াছেন। তাহারই মধ্যে গোঁজা এই চিঠি। আমাকে চিঠি পৌঁছাইবার জন্যই তো তাঁহার বইসহ আসা।

আবার চিঠি লিখিতে বসিলাম। এবার আর ঢাকাঢুকি নয়, যা বলার স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি। নিজেকে তাঁহার কাছে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠি—

আপনার চিঠি পাইয়া ভীষণ খুশি হইয়াছি। আপনার মতো একজন মানুষ আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নারীর দুঃখের কাহিনী শুনিয়া বিচলিত হইয়াছে, তাহার চিঠির উত্তর দিয়াছে এ আমার কাছে কতখানি তাহা যদি দেখাইতে পারিতাম।

প্রথমেই আপনাকে বলি, যে সব নারীর বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না আমি সেই দলের নহি। আমি স্পষ্ট ভাষায় আমার ইচ্ছার কথা, আমার অধিকারের কথা, আমার কামনা-বাসনার কথা জানাইতে চাই। আমি রক্তমাংসের মানুষ, দেবী নই। আমি স্বামী চাই, যে স্বামী আমাকে ভালবাসিবে, আদর করিবে; কাগজে-কলমের স্বামী নহে, পুরুষত্বহীন ক্লীব লোকদেখানো স্বামী নহে। আমি সন্তান কামনা করি, যে সন্তান আমার দুগ্ধ পান করিবে, যে সন্তান আমাকে মা বলিয়া ডাকিবে, আমার ও আমার প্রেমিকের ভালবাসার ফল যে সন্তান।

আমার এই ইচ্ছা কি পাপ? আমার এই বাসনা প্রকাশ করা কি অন্যায়? যদি পাপ হয়, অন্যায় হয় তাহা হইলে কোন বিচারে তাহা পাপ আমাকে বুঝাইয়া দিন।

আর আপনি কে? আপনি কিভাবে আমার দুঃখ লাঘব করিতে পারেন? নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করুন। এ প্রশ্নের জবাব আপনার নিজের কাছেই আছে।

উত্তর প্রত্যাশী,

আপনারই বাসন্তী।

চিঠি পৌঁছাইয়া দিয়াছি। বইটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিবার সময় আমার হাত কাঁপিয়াছিল। শরীরের সব রক্ত আসিয়া ভিড় করিয়াছিল মুখমন্ডলে। তিনিও আমার চোখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিলেন না। দ্রুত বইটি হস্তগত করিয়া একটি অর্দ্ধস্ফুট কুশল প্রশ্ন করিয়াই তিনি বিদায় নিলেন। এবার আমার প্রতীক্ষা।"

রাত হয়েছে অনেক। দূরে বড় রাস্তায় অনেকক্ষণ পর পর গাড়ি যাওয়ার আওয়াজ ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। অথচ নেশায় পেয়েছে দীপকে। কিছুতেই ডায়েরি ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

পাতা উল্টে দেখল, এ অবধি লেখা ঠিক ডায়েরি নয়, আত্মজীবনীর ঢঙে। নিজের কথা, নিজের সঙ্গে। এর পর থেকেই সত্যিকারের ডায়েরি। ছেঁড়াছেঁড়া, কাটাকাটা। কিছুটা লেখা। লিখতে লিখতে উঠে যাওয়া। আবার যেন এসে বসা।

দীপ শুরু করল।

"তীর ছুঁড়িয়া দিয়াছি। আর কিছু বাকি নাই। এবারে অপেক্ষা। কী অসহ্য এ প্রতীক্ষা! কী ভাবিলেন? কী করিবেন? উত্তর দিবেন তো? যদি মুখ ফিরাইয়া নেন? কুলটা স্বৈরিণী ভাবিয়া ঘৃণা করেন? আর কখনও সাক্ষাৎ না করেন?

পারিব না। তাঁহাকে আর দেখিতেও পাইব না এ চিন্তাতেই অর্ধমৃতা হইয়া গেলাম। কী নিয়া থাকিব? কেমন করিয়া বাঁচিব? এর চেয়ে না-ই লিখিতাম। তাঁহার সঙ্গে ন' মাসে ছ'মাসে হইলেও দেখা তো হইত! বাকি সময়টা তাঁহার ভাবনাতেই ডুবিয়া থাকিতাম। তিনি আমার সঙ্গী থাকিতেন, স্বপ্নে ও জাগরণে, প্রতিটি মুহূর্তে। এ কী করিলাম?

আবার ভাবিলাম। ঠিকই তো করিয়াছি। ভাবনা? ভাবনা নিয়া মানুষ বাঁচে? আমি ঈশ্বর নই। রক্তমাংসের এক নারী। কতটুকু বয়স আমার? সমস্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে।

ভাবনা আর চিন্তা আর স্বপ্ন আর কল্পনা এই নিয়াই বাকি জীবন কাটিয়া যাইবে? কিছুই পাইব না? না স্বামী, না সন্তান, না সংসার?

অসম্ভব। ঠিকই করিয়াছি। যদি তিনি মত দেন! যদি তিনি আমার দিকে হাত বাড়াইয়া দেন! যদি আমাকে উদ্ধার করেন।

তাঁহারও দুর্বলতা আছে, আমি জানি। তাঁহার চোখের দৃষ্টি আমি দেখিয়াছি। তিনি আমাকে কামনা করেন। বাধা যেটুকু তাহা বাহিরের। পারিব না? ওইটুকু বাধা দূর করিয়া তাঁহাকে আমার কাছে আনিতে পারিব না? লোকে বলে আমি সুন্দরী। আমার দিকে তাকাইলে চোখ ফেরানো যায় না। একটি মানুষকেই যদি জয় করিতে না পারিলাম, কিসের সুন্দরী আমি? রূপ কি ধুইয়া জল খাইবার জিনিস?

কী করি? কোথায় যাই?

রাতের ঘুম চলিয়া গেল। কাহারও সঙ্গে ঠিকমত কথা বলি না। পাগলের মতো ঘুরিয়া বেড়াই। এত দেরি? কী করিতেছেন তিনি? কেন এখনও জবাব আসিতেছে না? তাঁহার কাছে নিজেই চলিয়া যাইব? যদি জানাজানি হয়?"

ডায়েরির দু'-তিনটে পাতা খালি। আবার লেখা—

"চাঁদ উঠিয়াছে। মৃদু বাতাস বহিতেছে। চিলেকোঠার ঘর হইতে ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। গাছের পাতার মৃদু কম্পন ছাড়া কোথাও কোনও অলোড়ন নাই। পৃথিবী শান্ত; যেন পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছে।

আমারও ভিতর অসীম প্রশান্তি। ঝড় থামিয়া গিয়াছে। চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিটিয়া গিয়াছে। বহুদিন পর আজ রাতে ঘুমাইব।

তাঁহার আসিবার খবর টুসি আসিয়া দিল। তাহাকে বলিলাম, শরীরটা ভাল লাগছে না, আমি চিলেকোঠায় আছি, ওনাকে ওপরে পাঠিয়ে দে। টুসি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া চিলেকোঠার দরজা অবধি পৌঁছাইয়া চলিয়া গেল।

আমি খাটের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলাম। তিনি দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নত মুখ, যেন চোখ চাহিয়া আমার দিকে তাকাইতেও ভয়।

আমিই কথা শুরু করিলাম, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন! দ্বিধার সঙ্গে পায়ে পায়ে তিনি চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। বসিলেন, কিন্তু ওই পর্যন্ত। তাঁহার কণ্ঠ হইতে সমস্ত স্বর কে যেন শুষিয়া বাহির করিয়া নিয়াছে। দেখিলাম, আমি কথা না শুরু করিলে তিনি কিছু বলিবেন না। বলিলাম, আমার চিঠি পেয়েছেন?

তিনি ঘাড় নাড়িলেন।

কয়েক মুহূর্ত জানলা দিয়া বাহিরে পাখির ওড়াউড়ি দেখিলাম। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। কোনওরকমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিলাম, পড়া হয়েছে?

এবারে তিনি চোখ তুলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখিলেন। তার পর বলিলেন, আপনি আমাকে কেন এই চিঠি লিখলেন? আমার কাছে আপনি

কী প্রত্যাশা করেন?

খাট হইতে নামিলাম। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইলে সিঁড়ি এবং ছাদ পরিষ্কার দেখা যায়। কেহ আসিলে নজর পড়িবে। তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া বলিলাম, বুঝতে পারেন না? সব খুলে বলতে হবে?

দেখিলাম তাঁহার মুখ টকটকে লাল, হাত কাঁপিতেছে, দুই চোখ বিস্ফারিত। আত্মসংবরণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তিনি।

অনেক চেষ্টা করিয়া বলিলেন, এ অন্যায়, এ পাপ।

উঠিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিতে করিতে মনে মনে বলিলাম, এ পাপ নয়, এ আমার অধিকার। আর পাপ হলে সে পাপে আমরা দু'জনেই ডুবে মরি।

তারপর আমাদের সমস্ত পার্থিব কথা বন্ধ হইয়া গেল। বহুক্ষণ পর, কতক্ষণ বলিতে পারিব না, তিনি নিজেকে গুছাইয়া নিয়া দ্রুত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি শুইয়া রহিলাম, নিশ্চল। উঠিয়া দরজা বন্ধ করিবার শক্তিটুকুও যেন আমার আর নাই।"

ডায়েরির শেষ অংশে এসে পড়ল দীপ। আর তিন-চার পাতা, চোখ জ্বালা করছে। রাতের পাখি প্রহর ডেকে গেল। ভোর হয়ে এল কি? তবু শেষ না করে উঠতে পারছে না দীপ।

"এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আশায় আশায় অপেক্ষা করি, তিনি আসিবেন। সেদিনের ঘটনার পর তাঁহার হয়তো অনুতাপ হইয়াছে। তাঁহাকে বুঝাইয়া ভুল কাটাইয়া দিবার দায়িত্ব তো আমার। কিন্তু আসিলে তবে না। প্রশান্তি কাটিয়া ক্রমশ উদ্বেগ আসিয়া মনের দখল নিতে শুরু করিল।

এর মধ্যে খবর পাইলাম, বাবামহাশয় যে দামি উকিল লাগাইয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুটা সিদ্ধকাম হইয়াছেন। এসব ক্ষেত্রে যা হয় না, তাহাই হইতে চলিয়াছে। আমার স্বামী জামিনে খালাস পাইবেন, বিচার চলিতে থাকিবে, হয়তো রায় বাহির হইতে তাঁহার জীবদ্দশা পার হইয়া যাইবে। বুঝিলাম অর্থ থাকিলে খুনের আসামীও পার পাইয়া যায়।

কিন্তু আমার কী হইবে? তিনি আসিয়া উদয় হইলে আর কি মন্দিরে ফিরিয়া যাইবেন? আবার তো দখল লইবেন সেই নীচের ঘর। দিনরাত তাঁহার উপস্থিতি আমাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবে, তোমার স্বামী জীবিত, তথাপি তুমি পরপুরুষগামিনী। তুমি স্বৈরিণী। কী করিব, কোথায় যাইব?

আর তখনই টের পাইলাম, একটি বিপদ বাধাইয়া বসিয়া আছি। দিন পার হইয়া গিয়াছিল। এরকম মাঝেমাঝেই হয়। দু'-চার দিনের এদিক ওদিক স্বাভাবিক ঘটনা, গা করি নাই। কিন্তু যেদিন সকালে উঠিয়া সমস্ত শরীর মুড়াইয়া কলঘরে ছুটিলাম, সেদিনই খেয়াল হইল আমার ঋতুদর্শনের দিন প্রায় দু' সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়াছে। মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

টুসিকে ডাকিয়া দরোয়ান দশরথকে খবর দিলাম। বলিলাম শরীর খারাপ, তাঁহাকে যেন খবর দেয়। টুসি আসিয়া জানাইল, দশরথ দেখিয়া আসিয়াছে তিনি গৃহে নাই। প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে, তিনি নাকি বৃদ্ধা মাতাসহ দুই সপ্তাহ পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতস্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

পাগল হইয়া গেলাম। নদীতে স্নানে যাইব ছল করিয়া একদিন পালকি করিয়া বাহির হইলাম। স্নান সারিয়া পালকি ঘুরাইয়া তাঁহার বাসস্থানের নিকটে পৌঁছিলাম। বেহারাদের বলিয়া কহিয়া তাঁহার খবর নিতে পাঠাইলাম। তাহারাও একই সংবাদ দিল। থাকিতে না পারিয়া বাবামহাশয়ের কাছেও একদিন বিনা ভূমিকায় চলিয়া গেলাম। তিনি প্রীত হইলেন। আমার স্বামীর সংবাদ দিলেন। ভাবিলেন, আমি খুশি হইব। শরীরস্বাস্থ্যের খবর করিলেন। সুযোগ পাইয়া আমি বলিলাম, ভালই সেরে উঠছিলাম, দু' তিন দিন হল আবার দুর্বল লাগছে। ডাক্তারবাবুকে একটু খবর দিতে হবে।

বাবামহাশয় চিন্তিত হইলেন; বলিলেন মুশকিলে ফেললি মা। তোর ডাক্তারের ক'দিন হল কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ কাউকে না বলে কয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। সঙ্গে থাকতেন বৃদ্ধা মা, তাঁকেও নিয়ে গেছে। কোথায় গেল, কেনই বা হুট করে চলে গেল, কেউই কোনও খোঁজ দিতে পারছে না। বড় ভাল ছেলে। ডাক্তার, অথচ সবার সঙ্গে মিশত। সকলেই সুখ্যাতি করত। অল্পবয়সেই পসার জমিয়েছিল। আমারও ইচ্ছা ছিল কিছু দিই। তোর অতো বড় অসুখ, সারিয়ে তো দিল! ভেবেছিলাম একটা ভাল ডিসপেনসারি বানিয়ে দেব। সুযোগই পাওয়া গেল না।...কে জানে, হয়তো বিদেশ যাবার সুযোগ পেয়ে গেছে।

পা কাঁপিতেছিল। চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, বাবামহাশয়ের শেষের কথাগুলি কিছুই কানে যাইতেছিল না। কোনও রকমে তাঁহার সমুখ হইতে আসিয়া আশ্রয় নিলাম চিলেকোঠায়। সেই চিলেকোঠা, আমার দুঃখ-বেদনার সঙ্গী। আবার প্রেমের সার্থকতারও সাক্ষী। তখনও সেন শয্যায় তাঁহার স্পর্শ, তাহাই হাত দিয়া দিয়া অনুভব করিলাম। তারপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিলাম। কান্না থামিলে ভাবিতে বসিলাম।

কী করি? কাকে বলি? যাহাকেই বলিব সে ছিছি করিবে। বাবামহাশয়ের কানে ঠিক পৌঁছাইবে। লোকে যাচিয়া আসিয়া বাবামহাশয়কে শুনাইয়া যাইবে। আড়ালে উপহাস করিবে। কী দুঃখটাই না পাইল মানুষটা? এইটুকুই বুঝি বাকি ছিল। শোকে-দুঃখে-নিন্দায়-অপবাদে পাথর হইয়া যাইবে। পারিবে সহ্য করিতে? আমাকে যে বড় ভালবাসে!

আর সেই জন? পলায়ন করিল? ভয়ে? কিসের ভয়? দুর্নাম? এইটুকুও পারিল না? শোষিত বঞ্চিতদের জন্য দরদ! খেটেখাওয়া মানুষের জন্য ভালবাসা! সমস্ত বইপড়া বিদ্যে। নিজের জীবনেই যদি প্রয়োগ করিতে না পারিল, কিসের তত্ত্ব? একটি মানুষকেই উদ্ধার করিতে পারিল না তো দেশ!

কিন্তু তাঁহার ভালবাসা তো মিথ্যা নয়? নিজের চোখকে আমি কী করিয়া অবিশ্বাস করি? তাঁহার স্পর্শ? তাঁহার আবেগ? সবই কি ক্ষণিকের? প্রেম নয়, কাম? না না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি কি আমার এতকালের সঞ্চিত ভালবাসা অপাত্রে অর্পণ করিলাম? তাহা হইলে আমার তো আর কিছুই পড়িয়া থাকে না। শেষ অবধি হারিয়াই গেলাম!

আবার ভাবি, যাইবার আগে একবার যদি আসিয়া দাঁড়াইতেন। গোপনে খবরটুকুও দিতেন। আমিও না হয় যাইতাম তাঁহার সঙ্গে। দূরে। এই রাজবাড়ি হইতে বহুদূরে, যেখানে আমাদের কেহ চিনিত না। ততদিনে আমাদের সঙ্গ দিতে আবির্ভূত হইয়াছে আমাদের ভালবাসার ফল। হাতে হাত রাখিয়া বাকি জীবনটুকু উপভোগ করিয়াই না হয় কাটাইয়া দিতাম!

এখনও স্বপ্ন? গালে চড় মারিয়া নিজেকে বাস্তবে ফিরাইয়া আনি। তিনি নাই, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আর আসিবেন না। ইহাই সত্য। তাহলে আমি কে? আমি কোথায়?

আমি বাসন্তী চক্রবর্তী। আমার স্বামী জীবিত। আমার গর্ভে সন্তান, যে সন্তান তাঁহার নহে। তিনি তো ফিরিয়া আসিয়াই জানিতে পারিবেন। সন্তান যে তাঁহার নয় তাহা তো দিনের আলোর মতো সত্য। তাঁহার বাবা হইবার ক্ষমতা আছে কি নেই সে প্রশ্নই কেহ তুলিবে না, কারণ তিনি তো ছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। তাহলে এই সন্তানের পরিচয়? সে জারজ সন্তান। সে অবৈধ। আমার স্বামীকে আমি চিনি। সর্বসমক্ষে এই সত্য ঘোষণা করিতেও তাঁহার বাধিবে না।

পেটে হাত রাখিলাম। কী হতভাগ্য রে তুই। বিনা দোষে তোর বিচার হইয়া গেল। সারাটা জীবন এই কলঙ্কের দাগ তোর পিঠে জন্মচিহ্নের ন্যায় লাগিয়া থাকিবে। সমস্ত পৃথিবী আঙুল তুলিয়া বলিবে, ওই যে, ওর কোনও পিতৃপরিচয় নাই।

চিলেকোঠার জানলা হইতে বাহিরে দেখিলাম। ছোট পৃথিবী, বারপুকুরের ওপাশে বাঁশঝাড়, সেখানেই শেষ হইয়া যায়। বাহিরে নামিলে পৃথিবী বিশাল। বাঁশঝাড়ের পরে মাঠ, তারও পরে নদী, তারপর ধানখেত। পার হইলে পথ, সে পথ দিগন্ত পার হইয়াও কতদূর বিস্তৃত! সেখানে জায়গা মিলিবে না একটি নারীর, যে ভালবাসিয়াছিল, যে তাহার ভালবাসাকে গলা টিপিয়া মারে নাই, রক্তমাংসের মানুষের ন্যায় তাহার ভালবাসার দাবি প্রিয় মানুষটির কাছে পেশ করিয়াছিল, ভালবাসার অধিকার সেই মানুষটির কাছ হইতে আদায় করিয়া নিয়াছিল? জায়গা হইবে না একটি নবজাতকের, যে আকাশ-বাতাস-নদী-শিশিরের মতোই শুদ্ধ, যে জীবনের সবচেয়ে যা সুন্দর সেই ভালবাসার উপাদানেই বিন্দু বিন্দু করিয়া সৃষ্টি?

কিন্তু শুধু স্থানই যে নয়? আশ্রয় না হয় মিলিল কিন্তু কেমন করিয়া বাঁচিবে সেই শিশু? কী খাওয়াইব? কেমন করিয়া বড় করিব? একা নারী আমি যে ভীষণই অসহায়!"

ডায়েরি শেষ। পরের সাদা পাতাগুলো আনমনে উলটে গেল দীপ। লেখাগুলো ছুঁয়ে দেখল। মনে হল একটা অক্ষরও মৃত নয়; বহুযুগ ঘুমিয়ে থেকে দীপের আঙুলের নীচে চলেফিরে বেড়াচ্ছে। পরম মমতায় দীপ তাদের শরীরে হাত বুলিয়ে দিল।

—কী ব্যাপার বল তো? ক'দিন ধরেই তিথি ফোন করছে, তুই নাকি ওদের বাড়ি যাস না, ফোনও করিস না। কিছু হয়েছে?

—কী আবার হবে? ক'দিন ব্যস্ত ছিলাম, খোঁজখবর নিতে পারিনি।

দেখি, সময় পেলে আজ যাব।

মা খাবার বাড়ছিল। ডালসেদ্ধ আলুসেদ্ধ ডিমসেদ্ধ। এমনিতে সেদ্ধভাত খেতে খারাপ লাগে না দীপের। মারই বরং সব সেদ্ধ সাজিয়ে দিতে বাধো বাধো লাগে।

দীপ জিজ্ঞেস করল, বাবা নেই?

—থাকবে না কেন, ভালরকমই আছে। এখন তো আর বাইরে বেরুতে ইচ্ছে করে না। দেখো গিয়ে বসে বসে সুইচ টিপছে। আমার হয়েছে মরণ! ঘরে আঁশ বলতে কিছু নেই, ভাল একটা তরকারি পর্যন্ত নেই। বললাম, একবার বাজার থেকে ঘুরে এসো, মুখ ফিরিয়ে টিভি দেখতে লাগল।

দোষটা দীপেরই। ভেবেচিন্তে টিভিটাই কিনে ফেলল। কাজার। তবে রিমোট নিলে অনর্থক হাজারখানেক বেশি লাগবে বলে রিমোট ছাড়াই নিয়েছে। অসুবিধের মধ্যে চ্যানেল চেঞ্জ করতে হলে উঠে গিয়ে বোতাম টিপতে হয়। তাতে অবশ্য বাবার কোনও তাপোত্তাপ নেই। যখন খুশি গিয়ে টপাটপ চ্যানেল পাল্টে আসে। কেবল্ নেবার ব্যাপারে দ্বিধা ছিল। কেবল্-এর ছেলেটা এমন লোভ দেখাল, একশো পঁচিশ টাকার জন্য এত বড় চ্যানটা ছেড়ে দেবেন? এক বছর পরই ওয়ার্ল্ড কাপ, এখন ইউরো চলছে। ফিগো, মাইকেল ওয়েন। ঘরে বসে বোতাম টিপুন আর দেখুন। নিয়ে নিল। কেবল্ কানেকশন নেওয়া মানেই প্যাভোরার বাক্স খুলে দেওয়া। ছোটবেলায় পড়েছিল অন্ধকারে 'চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড'। চ্যানেল সার্ফিং করতে করতে একশো চব্বিশটা নরকের কুণ্ড দেখা হয়ে যায় দীপের।

দেখা শেষ হয় না বাবার। চোখেও ভাল দেখে না। চশমা লাগায়। চশমা খোলে। কিন্তু চোখ সরে না। মাঝে মাঝে মুণ্ডু বাড়িয়ে দীপ দেখেছে। কোনওটাই বাদ দেয় না। খবর, খেলা, জন্তুজানোয়ার থেকে নাচ-গান। মা অবশ্য বলে, দিনরাত নাচ-গানই দেখে বাবা। 'ল্যাংটা মেয়েছেলের নাচ'। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। নাচ-গান ভালই দেখে বাবা। কী দেখে? ওই টিভির বাক্সটা কি বাবার জলসাঘর? বাবা কি মনে মনে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে গড়গড়ার নলটা মুখে টেনে নেয়? তবলার তালে ঠেকা দিতে দিতে হঠাৎ খুশিতে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে কেয়াবাত্? শুদ্ধ-অশুরি তামাকের গন্ধে, ঘর ভরে ওঠে! চিকের আড়াল থেকে একজোড়া ভ্রমরকালো চোখ বাবাকে লক্ষ করে! সারেঙ্গি বেজে ওঠে, ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যায়!

অফিসে আজকাল তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় দীপ। ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি কম্পিউটার থেকে ই-মেলটা বের করে ছিঁড়ে ফেলে। মেমারি থেকে মুছে ফেলে। অর্ধেক দিন পড়েও দেখে না। আজ, দেখে নিশ্চিন্ত হল, কোনও ই-মেল আসেনি।

দীপ নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন এরকম করছে দীপ? আচরণটা অদ্ভুত নয়?

টিভিটা দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথমে প্ল্যান ছিল ওয়াশিং মেশিন। মাকে ম্যানেজ করতে সময় লাগবে। তাই প্ল্যান চেঞ্জ করে ঠিক করল কম্পিউটার কিনবে। অনেকদিনের শখ। তাছাড়া কাজেরও। আজকাল নিজের কম্পিউটার থাকলে অনেক অড্ জব করা যায়। চাই কি পাড়ার ছেলেদের শিখিয়েও দু' চার পয়সা রোজগার। কিন্তু শেষ অবধি কিনল টিভি। যুক্তিটা ছিল, টিভির দাম কম। তাছাড়া বাবা-মা'র বয়েস হচ্ছে, সারাদিন একলা থাকে, ওদেরও তো রিক্রিয়েশন বলে একটা ব্যাপার আছে, কম্পিউটার ওরা হ্যান্ডল্ করতে পারবে না।

দীপ জানে, কারণটা অন্য। ফোন বাজলে ইচ্ছে করলে নাও ধরা যায়। এমনকী ধরলেও পছন্দ না হলে কুট করে কেটে দেওয়া যায়। পরে বলা যায় কথা বলতে বলতে কেটে গেল। কিন্তু কম্পিউটারে তা বলা যাবে না। ই-মেল নাম্বার জানা থাকলে যে কেউ ঢুকতে পারবে এবং তাকে আর বের করা যাবে না।

কিন্তু যে কেউটা তো তিথি। তিথিকে অ্যাকসেস দিতে এতো আপত্তি কেন দীপের? তিথি কি দীপের কোনও ক্ষতি করেছে?

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে —'না'। তিথি তার অবস্থান থেকে একটুও সরেনি। সম্পর্কের শুরু থেকেই দীপ জানত, তিথিরা বড়লোক, ওদের গাড়ি-ফ্ল্যাট-ক্লাব। তিথির অনেক বন্ধু। তিথির জন্মদিন, দীপকে নিমন্ত্রণ করেছে। তিথিদের বাড়িতে, তিথিদের মতন যারা তাদের বাড়িতে, যেভাবে জন্মদিন উদ্‌যাপন হওয়া উচিত সেভাবেই ওর জন্মদিন পালিত হয়েছে, কেক কাটা হয়েছে, দীপের জন্য অপেক্ষাও করেছে তিথি। গান হয়েছে, গানের সঙ্গে নাচ এ তো আদিকাল থেকেই চলে আসছে। নাচতে নাচতে কাছাকাছি আসতেই পারে মানুষ। তাও তিথির মধ্যে কোনওরকম বেচাল দেখে নি দীপ। তিথির জন্মদিনে এসেছে যারা, তিথির গেস্ট, তাদের মধ্যে কেউ যদি বাড়াবাড়ি করেও থাকে সে জন্য তিথিকে কি দোষ দেওয়া যায়?

অথচ অদ্ভুত ব্যবহার করছে দীপ। যেন তিথি তার কেউ নয়। যেন তিথি বলে কোনও মেয়েকে চেনেই না দীপ।

দীপ কেন এরকম করছে?

অনেক ভেবেছে দীপ। ভাবতে ভাবতে উত্তরটাও একসময় পেয়ে গেছে।

একটা তুলনা, জেগে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে, এমনকী স্বপ্নেও, দীপ করে চলেছে। তিথি আগুনের মতো, কাছে টানে, তার আতপ্ত আলিঙ্গনে শরীর-মনে যা নিয়ে আসে তা প্রদাহ। দীপ অস্থির হয়ে পড়ে। দীপ পারে না। ছুটে ছুটে যায়। ঝাঁপ দিয়ে তৃপ্ত হতে চায়। তৃষ্ণা বাড়ে।

রাত্রি ঠাণ্ডা। রাত্রি গভীর। রাত্রি ডাকে না, দীপই পাশে বসে যেন সন্তর্পণে পা বাড়িয়ে দেয়। যেন জল, দীপ আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকে। উঠে আসতে পারে না।

তিথি যেন দীপের লজ্জা। তিথিকে কিছুতেই রাত্রির সামনে দাঁড় করিয়ে দীপ বলতে পারে না, এই মেয়েটাকে আমি ভালবাসি।

দীপ যদি তিথির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা রাত্রিকে বলে, রাত্রি কি রাগ করবে? দুঃখ পাবে? দীপ জানে, কোনওটাই নয়। গভীর চোখে দীপের দিকে তাকিয়ে বলবে, তাই? একটু আলাপ করিয়ে দেবেন?

তবু দীপ যে পারে না, তার কারণটা দীপের নিজেরই অজানা। আর এইসব ভাবতে ভাবতেই দীপ একসময় বুঝতে পারে, তিথির ভাবনা তাকে কোথাও পৌঁছে দেয় না। তিথি তার ভেতরে এক অস্থিরতা আনে। দৈবাৎ তিথি তার স্বপ্নে পৌঁছয়, আশরীর জেগে উঠে দীপ তার শরীরের শেষ স্বেদবিন্দুর সঙ্গে সহযাস করে। রাত্রি তাকে শান্ত করে। খুব একা লাগে যখন, অথবা খুব দুঃখী, রাত্রিকে মনে মনে কাছে বসিয়ে দীপ ভাবে, এই যে মেয়েটা, কত ছোট, অথচ তার চেয়েও একা, আর তার চেয়েও দুঃখী। দুঃখে দুঃখে একাকিত্বে রাত্রিকে খুব কাছের, খুব নিজের মনে হয়।

এইভাবেই দীপ নিজের ভেতর একটা পাঁচিল তৈরি করে নেয়। তিথির সেই পাঁচিল ডিঙিয়ে আসা বারণ। সেইখানে দীপ থাকে, আর থাকে একটা দুঃখী মেয়ে।

অনেকক্ষণ পর কম্পিউটার স্ক্রিনে তাকিয়ে দীপ দেখল, এসে থেকে সে কোনও কাজ করেনি। সব কাজ জমে আছে। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজ তুলতে তুলতে মনে পড়ল, মা বলে দিয়েছে আজ একবার তিথির খোঁজ নিতে। ফেরার সময় কি তিথির বাড়ি হয়ে যাবে?

আবার লোডশেডিং। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। দু'টো বেজে গেছে। এত বেলা হয়ে গেছে। উলটোপালটা ভাবনায় আজ আর কোনও কাজ হল না, খারাপ লাগল দীপের। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যে দৃশ্যটা দেখল, তাতে মনে হল, ভাগ্যিস লোডশেডিংটা হয়েছিল, ভেতরে বসে থাকলে কি আর দীপের দেখা হত?

হাঁ করে আছে মানস, জলহস্তীর হাঁ। আলুর তরকারি রুটি দিয়ে মুড়ে সেই হাঁয়ের ভেতর তিন আঙুল দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে রাত্রি। মানসের চোখ বোঁজা। চিবোচ্ছে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ও শিগগির চোখ খুলবে না।

সেই মানস। এবং বটাদা। মেয়েরা পারেও। মেয়েরাই পারে, অন্তত রাত্রি যে পারে সেটা তো চোখের সামনেই দেখতে পেল দীপ।

শুরুটা বটাদাকে দিয়ে। সিগারেট-জর্দা-নস্যি সব একটার পর একটা চালু করেছিল ইদানীং। বারণ করেছে সকলে। শোনেনি। হঠাৎ একদিন বাজারে বুক চেপে বসে পড়ল। পাড়ার লোকজন দিয়ে এল নার্সিংহোমে। হপ্তা না ফুরোতেই বুঝে গেল ওটা নার্সিংহোম নয় সাকশন হোম। পিষে পিষে অর্থ নিষ্কাশন করা হয়। অতএব ভরসা সরকারি হাসপাতাল। কিন্তু ভর্তি? সে নাকি সোজা পথে হয় না।

বটাদা নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়া থেকেই রাত্রি বড়ি ফেলে দিয়েছিল। বটাবৌদি না রাত্রি, বটাদা চলে গেলে কার বেশি ক্ষতি সেটা দীপরাই মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলত। ওষুধরে হরলিক্সরে মোসাম্বিরে, রাত্রি যেন নিজের সংসারেও তালা মেরে চলে এসেছে। যখন বোঝা গেল বটাদার এবার ভাঁড়ে মা ভবানী, বটাবৌদির গয়নাগুলোয় টান পড়বে, তখন অপশন্ ছিল দুটো। পি.এফ ভাঙানো। ইউনিয়ন অবশ্য দাঁড়াত। কিছু সফট্ লোন মিলে যেত। কিন্তু সরকারি হাসপাতাল হলে দু'টো দিকই সাশ্রয়।

এবার ফিল্ড-এ নামলেন বারীন, মরা হাতি এখনও যে লাখ টাকা, সেটা তখন বোঝা গেল। বারীনের হাতে তৈরি জিনিস এখন বাজারে করে খাচ্ছে। বারীন যে নিজে কিছুই গুছিয়ে নেননি, তাদের ঝড়তি-পড়তি বিবেকেও সেটা মাঝে মাঝে খোঁচা মারে। তাই বারীন গিয়ে দাঁড়াতে তারা অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা ফোন, ঠিক লোককে বলে দেওয়া। দীপরা দেখল ম্যাজিকের মতো অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে স্ট্রেচার-সুদ্ধ বটাদা সোজা ঢুকে গেল সবচেয়ে নামী হাসপাতালের সাদা ধবধবে বিছানায়। ভর্তি হতে না হতেই বটাদাকে ঘিরে ফেলল ডাক্তার এবং নার্সের

দল। সে যাই হোক, ওদিকে বটাদার বুকের ব্যথা এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে কমছে, আর এদিকে অফিসে রাত্রির পজিশন এক ফুট এক ফুট করে উঁচু হচ্ছে।

দীপের তাতে কোনও দুঃখ নেই। দীপ লক্ষ করে, রাত্রিকে সকলে এখন সম্মান দিয়ে কথা বলে, তার সামনে সিগারেট ধরায় না, অশ্লীল কথাবার্তার তো সিনই নেই। তবু রাত্রি কিন্তু নিজেকে বদলায়নি। একই রকম বিনীত, সেই স্কুলের মেয়েটি।

তা ছাড়াও ছোটখাট জিনিস, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, হয়তো রাত্রি কোনও কিছু ভেবে করে না, তবু সেগুলোই রাত্রিকে আরও আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। অফিসে পিকনিক হবে, দূরে নয়, কাছেই কোথাও, রাত্রিই সব আয়োজন করে। দারোয়ান ভগীরথ, নতুন এসেছে, দেহাতি ছেলে, ওর জন্যে হঠাৎ একটা জামা কিনে নিয়ে এল রাত্রি। সেদিনই ওরা খেয়াল করল, সত্যিই তো ছেঁড়া জামা পরে ঘুরত ছেলেটা, ওদের কেন মনে পড়েনি? মানসের বউ দ্বিতীয়বার মা হবার জন্যে বাপের বাড়ি, বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসতে পারে না মানস, দু'টো রুটি বেশি আনে রাত্রি, ভাগ করে খায়।

দীপ দ্যাখে। দেখতে দেখতে দীপের বুক ভরে যায়। অহঙ্কার হয়। আবার নিজেকে সমঝায়, তোমার কিসের অহঙ্কার হে? রাত্রি তোমার কে?

এই প্রশ্নটা কতবার কতভাবে যে দীপ নিজেকে করেছে! খুঁড়তে খুঁড়তে দীপ একসময় আবিষ্কার করেছে, ব্রতর মৃত্যুর দিন থেকেই কিছু একটা হয়েছে। সেই যে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ব্রতর বাড়ি গিয়ে উদয় হল, সেটারও আসলে সাবকনশাস্-এ ছিল রাত্রিই। ভাবতে গেলেই ভারী লজ্জা হয় দীপের। যেন নিষিদ্ধ কিছু। লুকিয়ে রাখতে হয়।

অফিস ছুটির পর আজকাল রাত্রিকে এগিয়ে দেয় দীপ। সবাই জেনে গেছে। ওদেরই উৎসাহ বেশি। মানসই একদিন বলেছিল, উনি হেঁটে হেঁটে স্টেশন অবধি একা যাবেন কেন? তোর তো স্কুটার রয়েছে। একটু এগিয়ে দে না।

সেই থেকে দীপের পেছনে পিলিয়নে উঠে বসে রাত্রি। আলগা করে। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। দীপও সাবধানে, যেন কাচের গেলাস, আস্তে আস্তে চালিয়ে রাত্রিকে স্টেশন অবধি নিয়ে যায়। ট্রেনের দেরি থাকলে একটু দাঁড়ায়। একটা দু'টো কথা বলে। সবই কাজের কথা। ট্রেন এলে রাত্রি উঠে চলে যায়। ফিরে আসে দীপ।

বেরিয়ে দেখল কখন একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব, শরৎ এসে গেছে। বিকেলের রোদ এখন নরম, বৃষ্টিধোয়া হয়ে চেকনাই এসেছে। মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। দীপের আরও কম মনে হয়। স্কুটারে স্টার্ট করতে না করতেই পৌঁছে যায়। একটা বুকস্টল চেনা হয়ে গেছে, ওখান থেকে মাঝে মাঝে ম্যাগাজিন কেনে। স্টোর সামনে স্কুটারটা স্ট্যান্ড করায়। নেমে প্রত্যেক দিন এক কথা বলে রাত্রি, আজ আর দাঁড়াতে হবে না, আমি ঠিক চলে যাব। দীপ জবাব দেয় না। রাত্রি অপেক্ষা করে। দীপ ঘুরলে ও প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে। মান্থলি টিকিট কেটে রাখে আজকাল, টিকিট কাটার হ্যাপাটা থাকে না। দীপও প্ল্যাটফর্মে ঢোকে, ঢোকার সময় গেটে দাঁড়ানো কালো কোটকে বলে যায়। মুখ চিনে গেছে, ফেরার সময় আটকায় না।

আজ প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে ঢুকতেই অ্যানাউন্সমেন্ট হল, ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ না থাকার জন্য আপ ট্রেন আসতে বিলম্ব হবে। এরা বেশ শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে, ভাবতে ভাবতে রাত্রির পেছনে হেঁটে যায় দীপ। এদিকেও বৃষ্টি হয়েছে। ঘাসের নীচে জল। বসার বেঞ্চিগুলো ভিজে। এগিয়ে যায় রাত্রি। প্ল্যাটফর্মের শেষদিকে একটা ঝাঁকড়া গাছ। গাছ চেনে না দীপ, হলদে হলদে ঠাসবুনোট ফুল, মাতাল-মাতাল গন্ধ। গাছের নীচে বেঞ্চিটা শুকনো। ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে রাত্রি বসল। দীপও বসল, দূরত্ব রেখে।

—ছেলেদের বউ না থাকলে বেশ অসুবিধা হয়।

কথাটা ধরতে পারছিল না। ভুরু উঁচু করল দীপ। রাত্রি তাকাল, মানসদার খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হয় না। একা ছেলেদের খুব অসুবিধে।

দীপ ভাবছিল। বটাদা, মানসদা, সকলকেই দাদা করে নিয়েছে রাত্রি। দীপকে কখনও দাদা বলে না। আড়ালে বলে কি? দীপ নিজেকে বোঝায়, না, দীপকে আড়ালেও দাদা বলে না রাত্রি।

—বটাদাকে পরশু ছেড়ে দেবে। দু' সপ্তাহ পর একবার চেকআপে যেতে হবে। তারপর জয়েন করতে পারবে।

দীপ ক'দিন খোঁজ নিতে পারেনি। বলল, পেসমেকার বসাতে হল নাকি?

—এটা পেসমেকারের কেস নয়। পরে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করতে হবে।

দীপ ভাবল, রাত্রি বেশ খবর রাখে। অথবা শুনে শুনে জেনে গেছে। ইন্টারেস্ট নিলেই জানা যায়। অনেকে ওষুধপত্রের ডোজ পর্যন্ত এমন বলে দেয় মনে হয় আগের জন্মে ডাক্তার ছিল।

—অনেকগুলো ছুটি চলে গেল বটাদার।

—প্রাণটা ফিরে পেল এই ঢের। ছুটি তো জমেই ছিল।

প্ল্যাটফর্মে ভিড় বাড়ছে। রোদ্দুর মরে যেতেই ঝুপঝুপ করে সন্ধ্যা নামছে। আলোগুলো জ্বেলে দিয়েছে। বাম্বের পাশে পোকা উড়ছে গোল হয়ে।

—ঋজু বায়না ধরেছে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাবে।

—ভালই তো। কোথায় যাওয়া হবে ঠিক হয়েছে?

—দূরে কোথাও যেতে হলে অনেক টাকার ধাক্কা। বাবা বলছিল পুরী। পুরীতে আমাদের অফিসের একটা হলিডে হোম আছে না?

—হ্যাঁ। কিন্তু পুজোয় রাশ থাকে। প্ল্যান থাকলে এখনই বুকিং করে রাখা ভাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রাত্রি। বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি তুলল প্ল্যাটফর্ম থেকে। তারপর বলল, ঋজুর খুব ইচ্ছে ওর কাকুও সঙ্গে যায়।

দীপের বুকের মধ্যে একটা রক্তের দলা জমাট বেঁধে আবার গলে গেল।

—বাবাও ঋজুর কথায় নেচেছে। কী দিয়ে যে বশ করেছেন সকলকে!

দীপের খুব মনে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, সকলের মধ্যে কে কে পড়ে। শুধু ঋজুর আর ঋজুর দাদুভাইয়েরই ইচ্ছা, নাকি ঋজুর মাও চায় দীপ ওদের সঙ্গে যায়?

মাথা নীচু করে কিশোরীর মতো বসেছিল রাত্রি। সেই স্কুলের ছাত্রীটির মতো জড়সড় ভঙ্গি। দীপের থেকে অনেকখানি দূরত্ব। চুল উড়ছে হাওয়ায়। গন্ধও। দীপ অবধি পৌঁছচ্ছে না। মাঝামাঝি এসেই থমকে যাচ্ছে।

কী যেন বলতে গেল দীপ। বলা হল না। ট্রেন আসছে। পেছনে একঝলক তাকিয়ে দীপকে দেখার ভানটুকু করে উঠে চলে গেল রাত্রি। লেডিজ কম্পার্টমেন্টটা দূরে। ভিড়ের মধ্যে আর দেখা গেল না রাত্রিকে।

হালকা লাগছিল। যেন পাখির ডানায় ভর করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে স্কুটার অবধি পৌঁছল দীপ। স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে বসতে বসতে মনে পড়ল, বেরুবার সময় মাকে বলে এসেছে, আজ তিথির কাছে যাবে।

তিথির কথা ভাবতেই দীপের মনে হল, রাত্রিকে একদিন তিথির কথা বলবে।

কিন্তু কেন?

এই কেনটার উত্তর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেল না দীপ। পরে ভাববে বলে তুলে রেখে তিথির বাড়ি পৌঁছে গেল।

লিফটে উঠে তিথিদের ফ্লোরে পৌঁছে করিডোর দিয়ে একটুখানি হেঁটে যেতে হয়। ওইটুকু যেতেই হল্লা শুনতে পেল দীপ। মেয়েদের গলা।

দরজার কাছে গিয়ে দেখল, খোলা, ভেতরে নরম আলো। আবছা কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকল দীপ।

—কে?

—আমি দীপ।

—অ। তিথি তো বাড়িতে নেই।

কী করবে? তিথির মা, সঙ্গে তিন বন্ধু, একই বয়েসি, হাতে গ্লাস, টেবিলে খোলা বোতল। বন্ধ ঘরে গন্ধ ভাসছে। ফিরে যাবে? এতদূর এসে? ভদ্রমহিলা যে অবস্থায় আছেন, দীপ যে এসেছিল, তিথিকে সেটা বলার কথাও মনে থাকবে না। তাছাড়া আসতে তো হবেই। আজ না হলে অন্য কোনওদিন। কেমন-রোখ চেপে গেল দীপের। দরজা খোলা রেখে বন্ধুদের নিয়ে ভরসন্ধেয় মাল খেতে পার, চিৎকার করে পাড়াসুদ্ধ জানাতে পার, আমি দীপ ভেতরে তিথির ঘরে একটুক্ষণ অপেক্ষা করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

—কখন ফিরবে?

—অতশত খবর রাখি না বাপু। তিথি এলে বলবখন, তোমাকে ফোন করতে।

—তার চেয়ে আমি বরং তিথির ঘরেই ওয়েট করছি।

বলে, জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে গটগট করে ভেতরে ঢুকে গেল দীপ। যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারল হতভম্ব চারজোড়া চোখ তাকে লক্ষ করছে।

ঘরে ঢুকে আলতো করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। নিশ্চিন্ত। গন্ধ এবং আওয়াজ, দু'টোকেই ঘরে ঢুকতে থমকাতে হবে।

তিথিদের ব্যালকনিটা দীপের খুব পছন্দ। পেছনের দরজা খুলে বাইরে গেল। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়াতে এখনও পুরনো বৃষ্টির জল। নীচে অতটা বোঝা যায় না। হাওয়া কি যত ওপরে ওঠে জোরে বয়?

অন্ধকার হয়ে গেছে। নীচের বস্তি, জলা, কাঠের পুল কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির মতো আলোগুলো বলে দেয় ওইখানে দূরে এক একটা প্রাণের পুঞ্জ পরিবার নামক অভ্যাস পালন করছে। ওইখানেই

জন্ম। ওইখানেই মৃত্যু। মাঝখানে একটা ড্যাশ, সেটাকে ঘিরে একটু আলোর ফুলকি। তার চেয়ে ওপরে তাকানো ভাল। কুণ্ঠার সঙ্গে একটা তারা আকাশে আলো ফোটাচ্ছে। বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে। ওরা সকলে হয়তো বেঁচেও নেই। আকাশটাও কি জীবন্ত পুরাতত্ত্ব?

ক্লান্ত লাগছিল। ক'দিন ধরেই হাঁটু দু'টো ব্যথা ব্যথা করে। বাত নাকি? বুড়ো হয়ে যাচ্ছে? ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল সন্ধ্যাটা ভেতরে গেলেই ফুরিয়ে যাবে। মনে হচ্ছিল এইখান থেকে আকাশ-তারা-হাওয়াসুদ্ধ সন্ধ্যাটা লম্বা হতে হতে স্টেশন পর্যন্ত চলে গেছে। যেখানে চাঁপা না কি একটা গাছের তলায় বসে কী সব বলে একটা মেয়ে ট্রেনে উঠে চলে গেছে।

হঠাৎ দীপের মনে পড়ল, কম্পিউটার।

বিংশ শতাব্দীর এই এক আশ্চর্য আবিষ্কার, একটা যন্ত্র যে মানুষকে কতখানি সাহচর্য দিতে পারে, সভ্যতা আগে কখনও দেখেনি।

মনে পড়তেই দীপের পা কে যেন ভেতরদিকে টানতে লাগল। ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে ঢুকল দীপ।

তিথির কম্পিউটারটা ঘরের এক কোণে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। তিথি কি এখনও কম্পিউটার নিয়ে বসে? কোনও খেলনাই বেশিদিন টেনে রাখতে পারে না তিথিকে। কী নিয়ে আছে এখন তিথি?

কম্পিউটার আসার পর সেই প্রথমদিন চালিয়ে দেখিয়েছিল তিথি। প্লাস্টিকটা তুলে সামনের টেবিলে বসে মাউসে হাত রাখল দীপ। বোতাম টিপল।

এদিক ওদিক ঘোরাতে ঘোরাতে কী মনে হল, তিথির নামে কী ই-মেল এসেছে নামাতে লাগল স্ক্রিনে। অন্যমনস্ক হয়ে ঘোরাচ্ছিল। অনিন্দিতা নামে একটা মেয়ে। সিটি ব্যাঙ্ক থেকে একটা মেসেজ। এলোমেলো আরও দু'য়েকটা। তারপরেই থমকে গেল দীপ। নিশ্বাস আটকে গেল।

একটুখানি পড়েই নীচে দেখে নিল। পুরো নাম নেই। শুধু 'জে'। জ্যাক? জয়? জন? দীপ কি দেখেছে কখনও? চোখ ওপরে তুলল। ওপর থেকে নীচ পড়ে ফেলল একটু একটু করে। তিথির সঙ্গে জে কী কী করেছে, কেমন করে করেছে, তার কী মনে হয়েছে, কতখানি ভাল লেগেছে তার ভিভিড ডেসক্রিপশন। নীচে আক্ষেপ করেছে, ঘরে লোক না এসে পড়লে আরও কী কী করতে পারত। জানতে চেয়েছে তিথিরও কতখানি ভাল লেগেছে, এবং কত তাড়াতাড়ি ওরা আবার ওইসব করতে পারবে।

প্রথম যৌবনে ক্লাসে নিষিদ্ধ বই আসত। কাড়াকাড়ি করে পড়ত বন্ধুরা। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটত। কিন্তু সে বর্ণনায় একটা নৈর্ব্যক্তিকতা ছিল। অন্য কারও, চেনা কেউ নয়। কিন্তু এ যে তিথি। দীপের মনে হল, তিথিকে কেউ যেন দিনের আলোয় চৌরঙ্গিতে উলঙ্গ করে ডিসপ্লে করছে।

তাড়াতাড়ি কম্পিউটার বন্ধ করে ঢেকে দিল ভাল করে। সুইচ-টুইচও অফ করে দিল। দেখে নিল, সে যে কম্পিউটারে হাত দিয়েছে কোনওভাবেও তিথি যেন টের না পায়। তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুল, তিথি আসার আগেই ফিরে যাবে বলে। ড্রয়িংরুমে পা দিতেই দেখতে পেল, বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জুতো খুলছে তিথি। দীপকে দেখেই তিথি হাত তুলল, হাই দীপ! প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! দীপ হাসি টানল মুখে। তিথি ভুলে গেছে, দীপ পছন্দ করে না বলে, দীপকে দেখে হাই বলত না তিথি।

—দারুণ দিনে এসেছ। একটা দুর্দান্ত খবর আছে। নিউজটা তোমার কাছেই ফার্স্ট ব্রেক করব। এক সেকেন্ড ওয়েট করো। ভীষণ স্টাফি লাগছে। একটু চেঞ্জ করে আসি।

ব্লু জিনস্ আর পিঙ্ক টপে এতক্ষণ জ্বলছিল তিথি। দীপকে বসিয়ে অ্যাটাচড্ বাথে ঢুকল ফ্রেশ হতে। চেয়ারে বসে ভয়ে ভয়ে কম্পিউটারটার দিকে তাকাল দীপ। তিথি যদি কখনও ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেক করে?

—শোন, গুড নিউজটা হচ্ছে, আমি ছ' মাসের জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছি। টেনিওরটা বাড়তেও পারে। আসলে বাবা যাচ্ছে কোম্পানির একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে; নতুন ইউনিট স্টার্ট করবে, বাবাই সেটার ওভারঅল ইনচার্জ। ইনিশিয়েট করে দিয়ে বাবা চলে আসবে। ওদের একজন কম্পিউটার-জানা লোক চাই। লিগাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে তো কথাই নেই। বাবা রিলেশনটা ডিসক্লোজ না করেই আমার সিভি দিয়েছিল, কোম্পানি সেটা অ্যাকসেপ্ট করেছে। ছ' মাসের কনট্রাক্ট। বাবা তো বলছে পার্মানেন্টই হয়ে যাবে।

পার্পল ম্যাক্সি আর ঝোলা দুলে তিথি যেন একটা প্রজাপতি। আর পারছে না। পোর্টিকোয় প্লেনটা এসে দাঁড়ালে চেঞ্জ করারও সময় পাবে না। ছুঁয়ে দেবার দূরত্বে এসে তিথি বলল, দাঁড়াও, সেলিব্রেট করি। তারপর ফ্রিজ থেকে দুটো বড় বড় চাঙ্ক আইসক্রিম নিয়ে মুখোমুখি বসল দীপের, ফ্রুরিজ-এর, কাল বাবা নিয়ে এসেছে। ভীষণ ভাল, খেয়ে দেখো।

কলকল করে কথা বলে যাচ্ছিল তিথি। দেখে যাচ্ছিল দীপ। এত সহজ? যেন ম্যাঞ্জিতে লেগে থাকা মাকড়সার ঝুল। টোকা দিলেই পড়ে যায়। জে। কিংবা দীপ। অথবা ভিকি। অথবা সিঙ্গাপুর। এবং কম্পিউটার।

অনেকক্ষণ পর বাইরে আসতে পেরেছিল দীপ। সন্ধ্যা ততক্ষণে রাত্রিকে জায়গা করে দিয়ে সরে গেছে। ঝিঁঝির ডাক। ব্যাঙের আওয়াজ। স্টারে স্টার্ট দিতে দিতে ওপরে তাকাল একবার। আর কি কখনও আসবে?

চলতে শুরু করেই একটা গন্ধ পেল। চুলের, ঘামের অথবা অন্য কিছুর। সেই বিকেলবেলা ছেড়ে গিয়েছিল দীপকে। ফিরে এসেছে।

দীপ দেখল তার আর কোনও কষ্ট নেই।

—দেখিস বাপু, দেখেশুনে পা ফেলিস। জায়গাটা যা অন্ধকার। আর সিঁড়িগুলোও তেমনি! আধমানুষ সমান উঁচু উঁচু। পা ফসকে পড়ে হাড়গোড় ভাঙলে তোর মা আর আমাকে আস্ত রাখবে না।

মন দিয়ে শুনলে বোঝা যায়, পিসি 'দেখিস' বলে না, বলে দেকিস'। তেমনি 'দেখেশুনে' নয়, 'দেকেশুনে'। বাবাকেও এমনিই বলতে শুনেছে দীপ। 'করেছি' 'বলেছি'-র জায়গায় 'করিচি' 'বলিচি'।

—আমার মাকে তুমি দেখেছ পিসি? আলাপ আছে?

—নেই আবার? খুব আছে। সেইজন্যেই তো ভয় পাই। পরের ছেলে, বিপদ ঘটলে শেষে হাতে হাতকড়া না পড়ে।

—খালি পরপর কর কেন গো? আমি কি তোমার পর?

—পরই তো। শত্তুর শত্তুর। কেন যে মরতে ছুটে ছুটে আসিস। এই জায়গাটাই তোকে গুণ করেছে।

—জায়গাটা... কিছুটা। তুমিও। তোমার কাছে এলে আর যেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে থেকে যাই। থেকে যাই পিসি? তখন আবার তাড়িয়ে দেবে না তো?

—বালাই ষাট! কোন অধিকারে তাড়াব বাবা? তোমাদেরই তো সব! কেন যে বাবামশাই ঘাড়ের ওপর এই গন্ধমাদন পর্বত চাপিয়ে গেলেন...। এখন মরলে হাড় জুড়োয়।

কান খাড়া করল দীপ। বাবামশাই। শব্দটা চেনা চেনা। পিসি কী যেন একটা শুরু করেছিল। শুরু করেও থেমে গেল। ঘড়েল মাল। ঝট করে কিছু ছাড়ে না। দীপও আজ ঠিক করেই এসেছে। পিসির স্টক খালি না করে ফিরছে না।

দোতলায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল পিসি। হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, আর পারি না। এই সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা। একদিন এই করতে করতেই মরে যাব। বয়েস কম ছিল, পারতুম। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতাম, ছুটে ছুটে নামতাম। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আর হয়?

—তবু যে পারছ, টাটকা দুধ ঘি-ফল খেয়েছ বলেই না। আমাদের আর দেখতে হবে না। যে রেটে ভেজাল শরীরে ঢুকছে, পঞ্চাশ পেরোলেই অক্কা।

পিসি জবাব দিল না। হাতড়ে হাতড়ে বারান্দার আলোগুলো জ্বালল। মজার জিনিস। ঝাড়লণ্ঠন, ভেতরে বাল্ব ফিট করা। পুরনো বোতলে নতুন মদ। এফেক্টটা দুর্দান্ত। লম্বা বারান্দাটা ঝকঝকে আলোয় যেন ঝলমল করে উঠল।

পিসি আছে সামনে সামনে। পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে দীপ ভাবল, সত্যি, এই বয়েসেও কী তেজ! দুপুরে হট্টগোল শুনে নীচে নেমে গিয়েছিল। গিয়ে দ্যাখে পিসি তড়পাচ্ছে,—বেচে দেব। সমস্ত বেচে দেব। চাই না আমার অমন সম্পত্তি। ধান হবে ভাগ পাব না, সর্ষে হবে তেল পাব না, গাছের ফল শুনব ঝড়ে উড়ে গেছে, কী পেয়েছ আমাকে,— গাধা? ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? সোজাসাপটা বলে দিচ্ছি, মন দিয়ে শুনে নাও, এ বছর ঠিক ঠিক ভাগ বুঝিয়ে না দিলে সামনের অঘ্রাণেই আমি এক লপ্তে সব জমি বেচে দেব। বেচে টাকা ব্যাঙ্কে রাখব, সুদে বাড়বে, সেও আচ্ছা, কিন্তু তোমাদের মুখ দেখার জন্যে জমি আমি বারোভূতের ভোগে লাগাতে পারব না, এই আমার শেষ কথা।

শুনতে শুনতে হাসি পেয়ে গেল দীপের। ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে পিসি! ইনটারেস্ট কমতে কমতে এমন জায়গায় এসেছে, এর পরে ব্যাঙ্ক বলবে, টাকা রাখতে হলে টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ, ভল্ট ভাড়া নেবার মতো! বাড়িতে টাকা রাখলে চোর-ডাকাত নিয়ে যেত। সেফ্ কাস্টডিতে টাকা রাখতে দিচ্ছি,

দরকার হলে টাকা তুলতে পারছ, এই কত। আবার সুদ?

গনগনে মুখ নিয়ে দীপকে লক্ষ না করেই হাঁই হাঁই করে চলে গেল পিসি। তখনই দীপের মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, জমিদার হো তো অ্যায়সা। সবাইকে পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে দেয়।

—আচ্ছা পিসি, এই যে জমিদারনী হয়ে আছ, তোমার ভাল লাগে?

—জমিদারনী আবার কীরে? জমাদারের বউ জমাদারনী হয়, এও কি সেইরকম?

—ভুল হয়ে গেছে,—জমিদারগিন্নি।

—আবার ভুল করলি, আমি কোনও জমিদারের বউ নই, জমিদারগিন্নি মানে জমিদারের গিন্নি। আমি জমিদারের মেয়ে জমিদার।

—বেশ, তাই না হয় মেনে নিলাম, মেয়ে জমিদার। এখন অবশ্য বুড়ি জমিদার। তা জমিদারিটা তোমার কেমন লাগে?

পিসি সোজা জবাব দিল না, ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, তোর কী মনে হয়?

—আমার মনে হয় ভালই লাগে, বেশ চুটিয়ে এনজয় করো। আই অ্যাম দ্য মনার্ক অব অল আই সার্ভে।

—কী যে তোরা আজকাল ফটরফটর ইংরিজি বলিস। বাংলাটাই ভাল করে বলতে শিখলি না, আবার ইংরিজি।

—বাঃ বাঃ, দারুণ ডায়ালগ দিয়েছ একখানা, হাততালি দিয়ে ওঠে দীপ, আজকাল বাংলা ভাষা নিয়ে অনেকেই প্রচুর ঘাম ঝরাচ্ছে। তোমার নামটা ওদের দিয়ে দেব। তোমার মতো একখানা স্যাম্পল্ পেলে ওদেরও দলে একটা ভ্যারাইটি আসবে। রজনীগন্ধার মালায় শালুক ফুল।

—শালুক ফুল দেখেছিস? ফোটে যখন পদ্মফুলকে হার মানিয়ে দেয়। শালুক ফুল মোটেও ফেলনা নয়। দিস তোর বাংলা ভাষার ঠিকানা। আমি চাঁদা পাঠিয়ে মেম্বার হয়ে যাব। ইংরিজি শুনে শুনে কানের পোকা বেরিয়ে গেল!

শিকল খুলে ঘরে ঢুকল পিসি। আসবাবের বাহুল্য নেই, ঘরে ঢুকলেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হল ঘর-জোড়া একখানা খাট। খাট বলে বলে অভ্যেস, নাহলে বলত পালঙ্ক। অন্তত পাঁচজন আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে পাশাপাশি শুতে পারে। সেগুন বা মেহগনি ওইরকম কোনও কাঠের হবে, এত বছর ধুলোময়লা হজম করেও চকচক করছে যেন কালই পালিশ করা হয়েছে। যেমন বড় তেমনই উঁচু। খাটের নীচেও পিসির হাজার টুকিটাকি জিনিস। যেন আর একটা গেরস্থালি।

সামনে একটা জলচৌকি পাতা, সেটাতেই বসল দীপ। পিসি নীচু হয়ে খাটের তলা থেকে কী একটা বের করতে করতে বলল, উঃ, আর পারি না বাবু। কোমর আর হাঁটু। এই দু'টোই সবচেয়ে কাবু করে ফেলল।

দীপ জবাব দিল, এ আর সমস্যা কী? বল তো কালই ঠিক করে ফেলি। হাঁটু আর কোমর বদলানো যাচ্ছে। পছন্দমত লাগিয়ে নিলেই হল। তবে খরচা আছে। সেটা অবশ্য তোমার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়।

পান। টেনেটুনে একটা রুপোর বাটা বের করেছে পিসি। ভেতরে সব সরঞ্জাম, —পান, সুপুরি, দোক্তা, খয়ের। রুপোর জাঁতি অবধি।

জাঁতি দেখেই খনা-মিহিরের গল্প মনে পড়ে গেল দীপের। বলল, তোমাদের খনা নাকি জাঁতি দিয়েই জিভ কেটে ফেলেছিল?

—গিরি বলেছে না? বড় তেজী মেয়ে ছিল খনা। খনা-মিহিরের ঢিবি দেখেছিস?

—হ্যাঁ, সবই ঘুরে ঘুরে দেখা হয়েছে, তবে উনি যেমন বললেন, হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সময়ের সভ্যতা, সেটা বাড়াবাড়ি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি।

পিসি জাঁতি থামিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, রাখাল বাঁড়ুজ্যের নাম শুনেছিস?

দীপ বুঝতে পারল না।

—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমালয় মেপেছিলেন। এখানে এসেছিলেন। বাবামশাই ডেকে আনিয়েছিলেন। তিনি খোঁড়াখুঁড়ি করে কিন্তু বলেছিলেন, এখানকার সভ্যতা অনেক পুরনো, ওই যে বললি না হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো, সেই সময়কার। লিখেওছেন বইতে। আমার কাছে আছে। কাল দেখাব।

পান সেজে মুখে দিল পিসি, পানের বোঁটায় চুন লাগিয়ে জিভের ডগায় ঠেকাল, দু'বার চিবিয়ে বলল, পান খাবি? জর্দা খয়েরটয়ের দিয়ে নয়, এমনিই, সাদা। মিঠা পান, সেজে দেব একটা?

দীপ ঘাড় নেড়ে না বলল। তারপর বলল, যাই বল, তোমাদের মাটির তলায় যা ইতিহাস, ওপরে কিন্তু তার চেয়ে কম কিছু নয়। এই বাড়িরই কত গল্প, বল?

—কথাটা মন্দ বলিস নি, কচমচ করে পান চিবোতে চিবোতে পিসি বলল, নীচের যা তা তো মাটির নীচেই চাপা পড়ে রইল, কবে খোঁড়া হবে, কবে বেরুবে, আদৌ বেরুবে কিনা...। এ বাড়ির ঘরে ঘরে কত যে ইতিহাস। অশরীরী আত্মার মতো ঘুরে বেড়ায়।

—একা একা থাক, তোমার ভয় করে না?

—ভয় করবে কেন রে বোকা? তারা সবাই তো আমার চেনা। তাদের হয়েই তো এখানে পড়ে আছি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আমিও বেঁচে আছে তো? ওদের একজন হয়ে যাই নি তো?

দীপের কেমন গা ছমছম করে, ভয়ে ভয়ে পিসির দিকে তাকায়। কথা ঘোরানোর জন্যে বলে, আচ্ছা পিসি, তখন যে বললে, আমার মাকে তুমি চেনো, ভাল করেই চেনো, কীভাবে চিনলে, কখন আলাপ একটু বল না!

পিসি পান চিবোতে চিবোতে চোখ বোঁজে। পানের বাটা সরিয়ে পিকদানি বের করে। পিক ফেলে হেঁচড়ে ঘষে খাটে ওঠে। পা ভাঁজ করে বসে পিকদানি পাশে রেখে। তারপর আড়চোখে দীপের দিকে তাকিয়ে বলে, তোর মা-বাবা কখনও বলে নি?

দীপ উত্তর দেয়, বাবাকে তো তুমি জানই। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি মাথার ঠিক নেই। অতবড় চাকরি, কথা নেই বার্তা নেই দুম করে ছেড়ে চলে এল। কী কষ্টে যে আমাদের দিন কেটেছে।

বলতে বলতে অভিমানে গলা বুঁজে এল দীপের। পরে জ্ঞান হতে যখন জেনেছে, এই সম্পত্তির কথা শুনেছে, এসেছে, পিসির ওপর প্রচণ্ড একটা আক্রোশ হয়েছে। যত দিন গেছে সেটা কমে এসেছে, কিন্তু একেবারে যায় নি। মনে হয়েছে, এত কাছে একটা ভাই, তা সে যতদূরেরই সম্পর্ক হোক, এইভাবে এত কষ্টে আছে, তার ছেলে বউ, তারা কী খাচ্ছে কী পরছে বেঁচে আছে কি না, একবার খোঁজটাও নিল না? কী স্বার্থপর রে বাবা? একা বুড়ি তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, যেকোনও দিন যমে ঠোকরাবে, সে কিনা ভোগ করে যাচ্ছে? লালসা আর কাকে বলে?

পিসি চুপ করে আছে দেখে দীপ বলল, মাকে জিজ্ঞেস করেছি। একবার নয়, অনেকবার। কোনও জবাব দেয় নি। জিজ্ঞেস করলে উঠে চলে গেছে। বেশি চাপাচাপি করলে রেগে গেছে। চড় থাপ্পড়ও কষিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ভাগ্য কেউ নিয়ে জন্মায় না, নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করতে হয়। আমি যতটা যা হয়েছি, সবই মা, মা না থাকলে...।

পিসি দুবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেয়। বলে, ঠিকই। তোর বাবাকে ফিরিয়ে এনেছিল তোর মা-ই। সাহাবাড়ির মেয়ে হলে কী হয়, তোর মার মত তেজী মেয়ে আমি কমই দেখেছি।

—সাহাবাড়ির মেয়ে? মা-রা সাহা?

—বেনেও নয়, শুঁড়ি সাহা। জলচল নয়।

হজম করতে কিছুটা সময় নেয় দীপ। বলে, তোমাদের বাড়িতে, মানে কুলীন ব্রাহ্মণ তোমরা, কুল-মান-বংশ এসব দিয়েই তো ভাত মেখে খেতে,—কোনও গোলমাল হয়নি?

—তোমাদের তোমাদের করছিস কেন রে হতভাগা? আমাদের বাড়ি বল্!

এটুকু বলেই চুপ করে যায় পিসি। দীপও আর থাকতে না পেরে বলে, কেমন করে বলি বল তো? ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, খেতের চাল, বাগানের ফল, পুকুরের মাছ। এসে নিজের চোখে দেখলাম। কিছুর অভাব নেই। তবু একটা সময় গেছে, আমাদের ভিখিরির দশা। হাঁড়ি চড়ত না এমনও হয়েছে। জমিদারি যদি আমাদেরই হবে, খালি পেটে ঢকঢক করে জল খেয়ে কাটাতে হয়েছে কেন দিনের পর দিন? ওসব ছেঁদো কথা অন্য কাউকে বোলো পিসি!

পিসি কেমন থমকে যায়। তারপর হাসে, হাসিটা অদ্ভুত। মিয়নে পাঁউরুটির মতো, তাতে বিষণ্ণতার জেলি মাখানো।

—জানতাম এই প্রশ্নটার মুখোমুখি একদিন হতে হবে। আমাকে জিজ্ঞেস করার আগে বাবাকে কখনও জিজ্ঞেস করেছিস?

—করেছি। বাবাকে, মাকে, কোনও জবাব পাই নি।

—কেন পাস নি? সন্দেহ হয় নি? যদি সব ঠিকঠাকই থাকবে, এসে দাঁড়িয়ে চাইলেই তো পারত। সুড় সুড় করে চলে যেতাম।

—ভিখিরির মতো হাত পাততে চায় নি, তাই।

—বেশ, একখানা উকিলের চিঠি ধরালেও তো পারত। জজসাহেবের এজলাশেই সব ফয়শালা হয়ে যেত।

—সকলের তো আর নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে থানা-পুলিশ-উকিল-আদালত করার ইচ্ছে থাকে না। তাছাড়া খরচও অনেক। বেশির ভাগ লোক জানে, যার টাকার জোর বেশি আইন তার হাতে।

পিসি উত্তেজিত হয়েছিল। বাটা থেকে আর একখানা পান বের করে মুখে ঢোকাল।

বলল, আর আমি যদি বলি, আসে নি, এসে দাবি করে নি, দাবি করার মুখ ছিল না তাই। দাবি করে নি, কারণ দাবি করলে একটা পয়সাও পেত না। বাবামশাই তাই উইল করে গিয়েছিলেন।

স্তব্ধ হয়ে যায় দীপ। উইল করে গিয়েছিলেন? বাবামশাই? কে তিনি? দীপের বাবার তিনি কে হন? এই বাড়ির প্রতিটি কড়ি-বরগায় রহস্য। কয়েকশ' অথবা হাজার বছর ধরে এই বাড়ির প্রতিটি প্রকোষ্ঠে কত বঞ্চনা, কত দীর্ঘশ্বাস! বাসন্তীর নিজের কথায় তার সামান্য উদ্‌ঘাটন। দীপের বাবাও কি আর এক বাসন্তী?

পিসির দিকে তাকিয়ে থাকে দীপ। কথা বলে না। দূরে তাকিয়ে পিসি বলতে শুরু করে।

—তোর বাবা, দর্প, আমার বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের মা মারা গিয়েছিলেন, আমরা তখন ছোট। ভাল মনে পড়ে না।

দীপের মনে পড়ে গেল। বাসন্তীর 'নিজের কথা'। মাকে শোয়ানো হয়েছিল পুকুরঘাটে। পুকুরে ডুবে মৃত্যু কি? আত্মহত্যা? পিসি বাসন্তীর কে?

—আচ্ছা, এক মিনিট, সরি তোমাকে ইন্টারাপ্ট করছি, তুমি তো পিসি, ঠিক আছে, কিন্তু তোমার আসল নামটা কি?

—পার্বতী।

—পারু?

চোখ ছুঁচলো করে পিসি,—তুই জানলি কী করে? উত্তরটা এড়িয়ে যায় দীপ, না, থাক, বল।

পিসি চাপাচাপি করে না।

—বাবামশাই দ্বিতীয় বিয়েতে বসলেন, আমরা তখন বড় হয়েছি। আমাদের নতুন মা, আমরা ছোট মা বলতাম, আমাদের থেকে খুব কিছু বড় নন। বিয়ের বছর দুই পরে তাঁর সন্তান হয়। পুত্রসন্তান। বাবামশাইয়ের খুব আনন্দ। আমরা আগের পক্ষের দুই বোন, কোনও ছেলে ছিল না। বংশের উত্তরাধিকার। উৎসব হল, লোক খাওয়ানো হল।

বলতে বলতে পিসি কেমন মিইয়ে যায়। যেন দম ফুরিয়ে যাওয়া পুতুল। দীপ ঠেলা মারে, —কী হল, তারপর?

—হ্যাঁ, এর মধ্যে একে একে দিদির আর আমার বিয়ে হয়ে গেল, জামাইবাবু সাধক প্রকৃতির, বাড়িতেই সাধন-ভজন নিয়ে থাকতেন। পরে অবশ্য তাঁর জন্য বাবামশাই নদীর ওপারে মন্দির বানিয়ে দেন। নদী মানে তেমন কিছু নয়, এখানে নালাকেও বলে নদী, দেখে আসিসখন।

এগুলো সবই জানা কথা দীপের। পিসি এখনও আসল জায়গায় ঢোকে নি। পিসিকে না ঘাঁটিয়ে চুপ করে বসে রইল দীপ। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে পিসি শুরু করল, —আমার কপাল পুড়ল। বিধবা হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। তোর বাবা, দর্প, আমার ছোটমার ছেলে তখন ছোট্ট। আমাকে খুব ভালবাসত। কোলে উঠলে আর নামতে চাইত না। নাকটা লম্বা ছিল আমার, নাক ধরে টানাটানি করত। একবার কামড়ে রক্তও বের করে দিয়েছিল।

সেই দিদি! চোখের দেখাও দেখতে চায় নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, সম্পর্ক আর সময় একই শব্দের দু'টো মানে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও বদলায়।

—দর্পকে নিয়ে বাবার আহ্লাদ-উৎসাহ কেটে যেতে কিন্তু বেশি দিন লাগল না। আমার ছোট মা খুব বড় ঘর থেকে আসেন নি। অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তাই জমিদারের ছেলেকে কেমন করে মানুষ করতে হয় ঠিক জানতেন না। ভেবেছিলেন, যা চায় তা-ই মুখের সামনে ধরে দিলেই ছেলে মানুষ হয়। পেতে পেতে দর্প জমিদারের বখাটে ছেলে হয়ে গেল।

দর্প দীপের বাবা। পিতৃনিন্দা শুনছে দীপ সাধ করে। পা ছড়িয়ে বসে। অথচ তেমন কিছু মনে হচ্ছে না তো! যেন অন্য কারও গল্প। রূপকথা!

—আমরা পড়াশুনোয় ভাল ছিলাম। বাবারই পিতিষ্ঠে করা ইস্কুল। দিদি তো ছিল মাস্টারমশাইদের চোখের মণি। সবাই বলেছিল, ও জলপানি পাবে। বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আর পড়াশুনা হয়নি। সেই বাড়ির ছেলে হয়ে দর্প ইস্কুল পালাত, লেখাপড়া করত না, বদ সঙ্গে মিশত। খবর পেয়ে বাবামশাই একদিন খুব শাসন করলেন। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেদিলেন। ছোট মা-ই চুপিচুপি খাইয়ে-দাইয়ে ছিটকিনি খুলে দিয়ে এলেন। দর্প কলকাতায় পালাল।

—বাবা তখন কত বড়?

—কত হবে, চোদ্দ-পনেরো। ততদিনে যথেষ্ট লায়েক হয়েছে, বন্ধুও জুটিয়েছে একগাদা। যাই হোক, ও যে কলকাতা গেছে, ছোট মা সেটা জানতেন না। শয্যা নিলেন। কেঁদেকেটে একসা। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। শেষে বাবামশাই লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর করে জানতে পারলেন দর্প কলকাতায়। তারাই ওকে ফিরিয়ে আনল। ছোট মা উঠে পড়ে লাগলেন, এবার ছেলের বিয়ে দিতে হবে। বাবামশাই রাজি হলেন। যদি ছেলের মতি ফেরে! দেখেশুনে সুন্দরী সুলক্ষণা একটি মেয়ের সঙ্গে দর্পর বিয়ে দেওয়া হল। প্রতিমা। দর্পর চেয়ে মোটে তিন বছরের ছোট। ভালই হবে। দু'জনের বন্ধুত্ব হলে, দর্পর বাইরের নেশা কেটে যাবে। একটা বছর দর্প ভাল ছেলে হয়ে বাড়িতে রইল। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতেই মাস্টার রেখে বাবামশাই ওর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করলেন। সেরেস্তাতেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন, কাজকর্ম তো ওকেই বুঝে নিতে হবে।

কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গিয়েছিল পিসি। দম নেবার জন্য থামল। ঢাকনা খুলে ঢকঢক করে জল খেল গ্লাশ থেকে। আঁচল দিয়ে ঠোঁটের কষ মুছে আবার বলতে শুরু করল।

—এক বছর কি বড় জোর দেড় বছর। সেই সময়টা খুব শান্তিতে কেটেছে আমাদের। বাবামশাইও শোকতাপের ধাক্কা সামলে মনে হচ্ছিল এবারে একটু থিতু হচ্ছেন। তখনই সব এলোমেলো হয়ে গেল। বাচ্চা হতে গিয়ে প্রতিমা মারা গেল। বাবামশাই যথেষ্ট করেছিলেন। আগেভাগেই ওকে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বড় ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। কিছুতেই কিছু হল না। বলে না কপাল! অভিশপ্ত পরিবার! দর্প পাগলের মতো হয়ে গেল। খায় না, ঘুমোয় না, খালি ছটফট করে। ছোট মা দিনরাত ওকে আগলে রাখেন। শেষ পর্যন্ত একদিন রাতের অন্ধকারে কাউকে না বলে ও পালিয়ে গেল।

—এই নিয়ে দ্বিতীয়বার?

—হ্যাঁ, আমার মতদূর জানা। বহু খোঁজাখুঁজি হল। থানা-পুলিশও করা হল। ছোট মা পাগলই হয়ে গেলেন একরকম! কুলবিগ্রহ রাধামাধব, সেখানেই পড়ে থাকতে লাগলেন। বাবামশাইও শোকে দুঃখে পাথর হয়ে গেলেন। আমরা হাঁটতাম শব্দ না করে, কথা বলতাম ফিসফিস করে।

—কতদিন অজ্ঞাতবাসে ছিল বাবা?

—মনে পড়ে না। বছরখানেক তো নিশ্চয়ই। বেশি বই কম নয়। কেউ খবর দিল কংখলে সাধুদের মধ্যে দেখে এসেছে, লোক পাঠানো হল, ক'টা দিনে বাবা-মার চেহারাই বদলে গেল। তারা ফিরে এসে খবর দিল সব মিথ্যে, আবার সেই আগের দশা। যেন ভূতের বাড়ি। এই করতে করতে শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ লালবাগ থেকে একজন এসে বলল, বাবু নাকি আলকাপের দল করছে, তাঁবু পড়েছে হাজার-দুয়ারির সামনে, কষ্টেই আছে একরকম, খেতে-পরতে ভাল পায় না, —বাবামশাই লোক পাঠালে ফিরেও আসতে পারে।

—ফিরে এল?

—এল। বাবামশাই লোক পাঠালেন, কিন্তু দর্প ফিরলে আর দেখা করলেন না। আসলে বাবামশাইয়ের বুক ভেঙে গিয়েছিল। হয়তো ভেবেছিলেন, ছেলেটা একবারও বুড়ো মা-বাবার কথা ভাবল না? এতখানি স্বার্থপর। ছোটমা আদেখলেপনার চূড়ান্ত করে ছাড়লেন। ক'টা দিন পারলে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকেন। এক হপ্তা কি দিন দশেক পরে ছেলের পেট থেকে আসল কথাটা বেরুলো।

—আসল কথা? নড়েচড়ে বসল দীপ।

—সেটাই তো চেপে রেখেছিল এতদিন। যার টানে ফিরে এসেছে মা'র কাছে তার কথা কবুল করল দর্প। তোর মা, সরমা, সরো বলে ডাকি আমরা, সাহাদের মেয়ে, গোপনে তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক করেছে দর্প। জমিদারের ছেলে, সম্পর্ক মানে বুঝতেই পারছিস। তাছাড়া, রক্তের স্বাদ পেয়েছে তো, প্রতিমার স্মৃতি তখনও টাটকা, মেয়েছলে কী জিনিস জানা হয়ে গেছে, শরীরের টান, কী আর বলব, তোর মা'র তখন পাঁচমাস। বাড়িতে যেন একটা বজ্রপাত হল। অনেক কিছু হয়েছে। আত্মহত্যা, হারিয়ে যাওয়া, খুনজখম। কিন্তু রাজবাড়িতে এই জিনিস প্রথম। একে নিচু জাত, ছোঁয়াছুঁয়ি বারণ, তায় কুমারী মা। বাবামশাই বলে পাঠালেন, ও মেয়ে এ বাড়িতে ঢুকবে না। দর্প, তা বুকের পাটা আছে ছেলের, সাফ সাফ জানিয়ে দিল, ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

—চলে গেল, আবার?

—যেতে হল। অনেক নাটকের পর। ছোটমা বাবামশাইয়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে রইলেন, ওই মেয়েকেই বউ করে ঘরে তুলতে হবে। বাবামশাই অনড়। ভয় দেখালেন, গলায় দড়ি দেবেন বললেন, কিছুতেই বাবামশাই রাজি হলেন না। অন্যদিকে দর্পও বলে চলেছে, এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও নয়। ছোটমা'র জন্যেই কষ্ট হত তখন আমাদের। আর তোর মা'র মুখুপাত করতাম। ...পরে অবশ্য ভুল ভেঙেছিল।

—কেন?

—নিচুজাতের মেয়ে, লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। কিন্তু বুদ্ধি ছিল তুখোড়। তাছাড়া দর্পকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম দর্প, জমিদারবাড়ির ছেলে, জেনেবুঝেই ও টোপ ফেলেছিল। পরে দেখেছি ও অন্য জাতের মেয়ে। আরও বেশি করে বুঝেছি, যখন অভাবে পড়ল।

একদিনের জন্যও হাত পাততে আসে নি।

রাত হয়ে যাচ্ছিল। দীপের ঘুম পাচ্ছিল না। পিসি গল্পের সুতো লম্বা করে যাচ্ছিল।

—শেষ অবধি কী হল?

—বাবামশাই ভাঙলেন না। দর্প যখন অনড় হয়েই রইল, ছোটমা ছেলের জন্য কিছু অন্তত চাইলেন। বাবামশাইয়ের পরিচিতি ছিল, অনেকেই চিনত। দেশ স্বাধীন হয়েছে, চাকরির বাজার তেমন খারাপ নয়। একটা সাহেবি কোম্পানিতে কাউকে একটা ধরে দর্পকে ঢুকিয়ে দিলেন। মাইনেপত্র খারাপ নয়। লেগে থাকলে ভবিষ্যতে উন্নতি করবে। নিজের সংসার নিয়ে আলাদা থাকুক, এ দিকে যেন না আসে।

—উইল করেছিলেন বললে?

—হ্যাঁ। সেটা তখন জানা যায় নি। দর্প বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, কলকাতায় গিয়ে বউ নিয়ে বাসা করল। বাচ্চা হল, ছেলে, নাম রাখল দীপনারায়ণ। সব খবরই আমরা পাই। এদিকে ছোটমা'র সংসারে মন টেকে না, ছুটে ছুটে যান ছেলের কাছে। এই করতে গিয়েই একদিন পড়ে গিয়ে মাথায় চোট, ডাক্তার-বদ্যি করার আগেই সব শেষ। আমাদের সঙ্গে দর্পর শেষ সুতোর টানটাও কেটে গেল।

চুপ করে গেল পিসি। দীপ মনে করিয়ে দিল, ভুলে গেলে পিসি, উইলের কথাটা।

—হ্যাঁ, বড় করে হাই তুলল পিসি, বাবামশাইও বেশিদিন বাঁচেন নি। শেষদিকটায় ফুলে গিয়েছিলেন। হাঁপাতেন। ইনজেকশন দেওয়া হত। কষ্ট পেলেও কাউকে ডাকতেন না। ভীষণ অভিমানী ছিলেন তো। আর অহঙ্কারী। বংশগৌরব। কৌলীন্য। একমাত্র ছেলেকেও দূরে সরিয়ে দিতে হাত কাঁপে নি। বাবামশাই মারা গেলে গৌর কাকা এলেন কলকাতা থেকে। আমাদের অ্যাটর্নি। শ্রাদ্ধের দিনে উইল পড়া হল। সমস্ত সম্পত্তি থেকে দর্পকে বঞ্চিত করে গেছেন বাবামশাই। যতদিন বেঁচে থাকব আমি ভোগদখল করব। দর্পর সন্তান, সে যদি কুলরক্ষা করে তাহলে আমার মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক হবে সে-ই। দর্প এসেছিল শ্রাদ্ধের দিন। মাথা নেড়া করে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করছিল। শুনে একটা কথাও বলে নি। সব চুকে যেতে উঠে চলে গিয়েছিল। আর আসে নি।

কথা শেষ করে দীপের দিকে ফিরল পিসি, বুঝেছিস হতভাগা, কেন বলি পরের ধন? গচ্ছিত ধন বাবা। যখের মতো আগলে আছি। নিয়ে আমাকে উদ্ধার করো।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দীপের। বলল, কুলরক্ষা মানে কী?

—সেটাও বিশদ করে গিয়েছিলেন বাবামশাই। বিয়ে করতে হবে স্বজাতে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হতে হবে; অন্য গোত্রে, অর্থাৎ আমরা সাবর্ণ, সেই গোত্র হলে হবে না; আর বিধবা, বেশ্যা, বা আগে বিয়ে হয়েছে এমন মেয়ে হলে চলবে না। ...অনেক রাত হয়েছে। বকে বকে ঘুম পালিয়ে গেল। কাল ভোর ভোর উঠতে হবে। শুয়ে পড়, আর রাত করিস না।

পিসির পাশে শুয়ে এ'পাশ ও'পাশ করে রাতটা জেগে কাটিয়ে দিল দীপ।

ঘুম এল ভোরবেলায়। ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখল দীপ। কাক-ডাকা দুপুর, ছমছমে রোদ্দুর, তার মধ্যে দীপ ঢুকেছে চিলেকোঠার ঘরে। অন্ধকার, চোখ সইয়ে নিতে সামান্য দাঁড়িয়ে আছে, কে যেন বলল, বড্ড আলো, দরজাটা একটু ভেজিয়ে দেবেন। দরজা বন্ধ করে সামনে ফিরতেই নিঃশ্বাসের গন্ধ। চুল এলো করে বিছানায় শুয়ে আদুরে গলায় সে বলল, কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি, এত দেরি করে আসতে হয়! দীপ বলল, বটাদার সঙ্গে তাস খেলছিলাম, দেরি হয়ে গেল। হাসিতে টুকরো হয়ে যেতে যেতে সে পাশ ফিরল। দীপ অবাক হয়ে দেখল, রঙিন শাড়ি গয়নাটয়না পরে বিছানায় শুয়ে আছে পিসি!

ধড়মড় করে উঠে দীপ দ্যাখে ঘরভর্তি আলো, বাইরে লোকজনের গলার আওয়াজ, একটু দূরে পিসি বসে তার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে।

দু'চোখ কচলে দীপ বলল, তুমি এখানে?

পিসি এক চোখ টিপে বলল, আমি তো এখানেই থাকব। এটাই আমার জায়গা। কেন, কাকে পেলে খুশি হতিস? কাকে স্বপ্ন দেখছিলি?

ততক্ষণে দীপও সামলে নিয়েছে। বলল, তোমাকে।

পিসি লাল ঠোঁট ওল্টালো, মরে যাই! কবে যে আমার সেই সৌভাগ্য হবে। শোন, তোকে একটা জিনিস দেখাব। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

শেভ-স্নান সেরে বাইরে বেরিয়ে দেখল, পিসি খাবার সাজিয়ে ফেলেছে। দীপ বসতে বসতে বলল, তোমার আজ পুজো-পাঠ নেই?

—সেসব কখন হয়ে গেছে! বেলা কি কম হল? ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ্! সুখের স্বপ্ন তো, চট করে ভাঙতে চায় না।... অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ধীরেসুস্থে খা। বাবামশাইয়ের ঘরে আমাদের পূর্বপুরুষদের ছবি আছে। তোকে আজ দেখাব বলে ঘর খুলিয়েছি। বেলা হলে রোদ ঘুরে যাবে, তখন আর ভাল করে দেখতে পাবি না।

দরজা খোলা ছিল। ভারী শালকাঠের দরজা। খুলতে বেশ গায়ের জোর লাগে। পিসি একা খুলতে পারত না। ভেতরটা অন্ধকার। এ'ঘরে বিজলি আছে মনে হয় না। হাতড়ে হাতড়ে পুব দিকে গিয়ে একটা জানলা খুলে দিল পিসি। আলো লাফিয়ে ঢুকল ঘরে।

দেওয়ালে কয়েকটা অয়েলপেন্টিং। সবচেয়ে বড় আর পুরনোটার সামনে দাঁড়িয়ে পিসি বলল, দুলেন্দ্রনারায়ণ, আমার ঠাকুর্দা, রায়সাহেব খেতাব পেয়েছিলেন। বাবামশাই ওটা ব্যবহার করতেন না।

পরের ছবিটাই দেবেন্দ্রনারায়ণের। পিসির বাবামশাই। দীপের ঠাকুর্দা। গা শিরশির করে উঠল দীপের। চৌকো মুখ, দু'পাশে পাট করা চুল, মধ্যখানে সিঁথি, চওড়া কপাল। —ছবির সময় গোঁফ ছিল বাবামশাইয়ের, পরে কেটে ফেলেন। পিসি বলল।

পরপর ছবি দেখিয়ে যাচ্ছিল পিসি। দেওয়ালের ছবি শেষ। একদিকে কয়েকটা ছবি ডাঁই করা। পিসি সামনে গিয়ে দাঁড়াল, মুখে লাজুক হাসি। এটাতে আমারও ছবি আছে, দেখবি?

একটা গোটানো ছবি খুলল পিসি। বিবর্ণ, রংজ্বলা। খুব মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বিনুনি দোলানো দুই কিশোরী হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে।

—এই আমি। আর ও হচ্ছে দিদি। আমার চেয়ে দু' বছরের বড়।

—বাসন্তী? ফিসফিস করল দীপ।

—হ্যাঁ বাসন্তী। আমরা বলতাম বাসী। বাসী আর পারু, দুই বোন। কী আনন্দে যে ছোটবেলাটা কেটেছে। বলতে বলতে চোখ বুঁজে ফেলল পিসি। যেন বন্ধ চোখের ওপাশেই পিসির ছোটবেলা, চোখ খুললেই হারিয়ে যাবে।

—বাসন্তী এখন কোথায় পিসি?

দীপের প্রশ্নে পিসির দুটো চোখই খুলে গেল। পুরো। পূর্ণদৃষ্টিতে দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন রে, সে খবরে তোর কী দরকার?

—বা রে জানতে ইচ্ছে করবে না? তোমার দিদি, তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বললে না। কেমন আছে বাসন্তী?

—বাসন্তী হারিয়ে গেছে।

বলে কিছুক্ষণ থেমে রইল পিসি। তারপর বলল, হঠাৎ একদিন বাসন্তী বাড়ি থেকে হারিয়ে যায়। কোথায় গেছে কেউ জানত না। অনেক খোঁজ করা হয়েছিল। থানা-পুলিশও হয়েছিল। কিছুই জানা যায় নি।

—বাসন্তীর ছেলেমেয়ে ছিল না?

—না। স্বামীর সঙ্গে ওর তো তেমন সম্পর্ক ছিল না। ওর স্বামীও ছিলেন সাধক প্রকৃতির। শেষ দিকে একটা বাজে ব্যাপারেও জড়িয়ে পড়েন। ছেলেমেয়ে হয় নি ওদের।

—বাসন্তীর স্বামী? তিনি বেঁচে নেই?

—ওই যে বলছিলাম। তিনি যে মন্দিরে সাধন-ভজন করতেন, সেইখানে তাঁর গুরুদেব রহস্যজনকভাবে মারা যান। জানা যায় খুন হয়েছেন তিনি। খুনের অভিযোগে বাসন্তীর স্বামী গ্রেফতার হন।

—বাবামশাই তাঁর জন্যে চেষ্টাচরিত্র করেন নি?

—করেছিলেন, শোনা যাচ্ছিল তিনি খালাসও পেয়ে যাবেন। সেইসময়ই দিদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বাবামশাই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। অসুস্থও হয়ে পড়েছিলেন। তারপরেই কেসের মোড় ঘুরে যায়। কেউ একজন রাজসাক্ষী হয়। ফাঁসি হয়ে যায় জামাইবাবুর।

ছবিটার দিকে আর একবার তাকাল দীপ। বাসন্তী, বাসী। তার দিকেই তাকিয়ে আছে। দু' চোখ উপচে কৌতুক যেন ধরে রাখতে পারছে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল দীপের। ভোরের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। আর একবার দেখল। না, পিসি নয়। মিল ভীষণ। কিন্তু তফাৎ আছে। বাসন্তীকেই দেখেছে দীপ। চিলেকোঠার ঘরে।

ঘরের বাইরে আলো। বেরিয়ে আসতে আসতে দীপ জিজ্ঞেস করল, বাবামশাইয়ের উইলে বাসন্তীর জন্য কিছু ছিল না?

পিসি বলল, সেটাই সবার অবাক লেগেছিল। বাসন্তী হারিয়ে গিয়েছিল, মারা তো যায় নি। অথচ বাবামশাই তাঁর উইলে বাসন্তীর জন্য কিছুই রেখে যান নি।

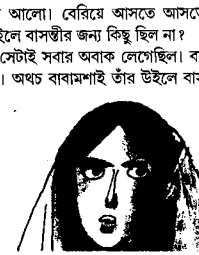

দাঁড়িয়ে পড়ল রাত্রি।

দীপও দাঁড়াল,—কী হল?

—আমার ভয় করছে। আজ থাক্।

—আশ্চর্য! ভয়ের কী আছে? আপনি যাচ্ছেন আমার বাড়ি। মানুষ মানুষের বাড়ি যায় না?

—আপনার বাড়ি যদি হত শুধু, কোনও চিন্তা ছিল না। আপনার বাবা আছেন, মা আছেন, জিজ্ঞেস করলে কী বলবেন? কী পরিচয় দেবেন আমার?

—আপনি আমার সহকর্মী, বন্ধু।

—আগে কোনও সহকর্মী আপনাদের বাড়ি এসেছিল?

—না। আপনাকে তো বলেইছি, তারা আমার বন্ধু নয়। তাদের কারও সঙ্গেই আমার রুচি মেলে না।

—আপনি ছেলে, আমি মেয়ে; আমাদের বন্ধু পরিচয় সবাই মেনে নেবে?

দীপ একবার ভাবল বলে, তাহলে যে পরিচয় দিলে লোকে মানবে সেটাই না হয় দেব। কিন্তু ওই কথা বললে, রাত্রি এখান থেকেই অ্যাবাউট টার্ন করে হাঁটা দেবে। তার চেয়ে যে অস্ত্রে এতদূর অবধি টেনে এনেছে, সেটাই প্রয়োগ করা ভাল।

বলল, ঠিক আছে। আপনাকে যেতে হবে না। ফিরে যান। ফিরে গিয়ে ঋজুকে বলুন, কাকুর যাওয়া হবে না। ব্যস, ঝামেলা খতম।

সেই পুরী। টিকিট অবধি করে ফেলেছে দীপ। লক্ষ্মীপুজোর পর যাওয়া। বারীন, ঋজু, রাত্রি এবং দীপ। দীপই দায়িত্ব নিয়ে রেলের রিজার্ভেশন, হলিডেহোম বুকিং সব করেছে। ঋজুর সঙ্গে বসে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করা হয়েছে। বারীনও পাকাচুলের মাথাটা মাঝে মাঝে গলিয়ে দিয়েছেন ওদের মধ্যে। এখন যখন সব অনেকদুর এগিয়ে গেছে, দীপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছে।

কথায় কথায় রাত্রিকে বলেছে, আমারও তো একটা বাড়ি আছে, —বাবা-মা। ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি সেটাও না হয় বললাম। কিন্তু কাদের সঙ্গে যাচ্ছি যদি জানতে চায়। তারা কারা যদি খোঁজ করে?

রাত্রি বলেছিল, বলবেন অফিস কলিগদের সঙ্গে যাচ্ছি।

—ফোন হওয়ায় বিপদ বেড়েছে। মানস যদি ফোন করে? কিংবা বটাদা? মা হয়ত ফোন ধরল। যদি সব ফাঁস করে দেয়? বলে, কোন অফিস কলিগ মাসিমা? এই তো আমি আর বটাদা ঘাটশিলা বেড়াতে যাচ্ছি। দীপ কোথায়? খোঁজ করুন ভাল করে। কী হবে ভেবে দেখেছেন?

রাত্রি ঘাবড়ে গিয়েছিল; বলেছিল, তাহলে কী হবে? দীপ অভয় দিয়েছিল, —চিন্তার কী আছে? সত্যি কথাই বলব। বলব আমার সহকর্মী রাত্রি, তাঁদের বাড়ির সকলের সঙ্গে পুরী যাচ্ছি। একটাই সমস্যা, বাবা-মা কেউই আপনাকে চেনে না। অন্য কিছু না ভেবে বসে।

—তা তো বটেই।

—সুতরাং উপায় হচ্ছে, আপনার একবার আমাদের বাড়ি যাওয়া, সকলের সঙ্গে আলাপ করে আসা। তাহলে আর কোনও অসুবিধা হবে না। সেই থেকে রাত্রি ঘামছে। ঘামতে ঘামতে রুমাল-শাড়ির আঁচল সব ভিজিয়ে ফেলেছে। এই যে এখন রাস্তায় দীপদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে, এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমেই যাচ্ছে। ঠোঁটের ওপর, নাকের ডগায়, ভুরুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

খুবই হতাশ গলায় হালছাড়া ভঙ্গিতে রাত্রি বলল, তাহলে চলুন।

কথা না বাড়িয়ে দীপ হাঁটা লাগাল। পেছন পেছন নড়বড়ে পায়ে রাত্রি। বাড়িতে ঢুকে দীপ দেখল, মা বাথরুমে, বাবা যথারীতি টিভির সামনে।

রাত্রি এগিয়ে গিয়ে বাবাকে প্রনাম করল। বাবা মাথায় হাত রেখে বলল, কল্যাণ হোক। তোমার নাম কী মা?

—রাত্রি। রাত্রি ভট্টাচার্য।

—রাত্রি? রাত্রি তো অন্ধকার! এমন জ্যোতির্ময়ী মেয়ের নাম রাত্রি কে রাখল মা?

রাত্রি মাথা নিচু করল।

যেটুকু সময় দেবার দেওয়া হয়ে গিয়েছে, বাবা এবার টিভি-তে চোখ সরিয়ে নিল। তার আগেই দীপ দরকারি কথাটা জিজ্ঞেস করে নিল, কতক্ষণ?

মা'র আজকাল ছুঁচিবাই বেড়েছে। বাথরুমে ঢুকলে দেড় ঘণ্টা। জল ঘেঁটে ঘেঁটে আঙুলগুলোর আর কিছু নেই। টিভি নয়, ওয়াশিং মেশিনটাই আগে কেনা উচিত ছিল। মুশকিল হচ্ছে, শেষ অবধি হয়ত ফেলেই রেখে দেবে। ব্যবহার না হয়ে মরচে পড়ে যাবে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, ওতে কি জামাকাপড় পরিষ্কার হয়?

বাবা বাথরুমের দিকে একবার তাকিয়ে দীপের দিকে চোখ ফেরাল, —হয়ে এসেছে। জলের শব্দ পাচ্ছিস কি? না। তার মানে স্নান শেষ। জামাকাপড় পরছে। এখুনি বেরোবে।

চোখে দ্যাখে না, কানে শোনে না। আসল জিনিসগুলো ঠিক দেখতে পায় শুনতে পায়।

ঘড়াং করে শিকল খুলে মা বেরুলো। বেরিয়েই দেখতে পেল ওদের। মাকে ছোট করে রাত্রির কথা বলেছিল একদিন। গুরুত্ব না দিয়ে। পাসিং কমেন্ট। মনে আছে সেটা বোঝা গেল।

রাত্রি মাকে দেখেই প্রনাম করার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল। মা তাড়াতাড়ি তিন হাত পিছিয়ে গেল।

—করছ কী করছ কী? সবে চান করে বেরুলাম। ছুঁয়ে দিলে আবার যে চানে ঢুকতে হবে মা! ঠাকুর পুজো করি; জল-বাতাসা দিই। তারপর পেন্নাম টেন্নাম যা হয় কোরো।

কোথা থেকে যেন মন্ত্র নিয়েছে মা। বিড় বিড় করে মন্ত্র জপতে জপতে জলের দাগ ফেলে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। ওই ঘরেই বাবা-মা। ওখানেই দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে মা'র আরাধ্য দেবতারা থরে থরে শোভা পাচ্ছেন। সকাল-সন্ধ্যা ফল-বাতাসা খেয়ে খেয়ে তাঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

রাত্রি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বারান্দায় রাখা মোড়ায় গিয়ে বসল, দীপও আর একটা মোড়ায় বসল সামান্য দূরত্বে।

—পুরী থেকে কনডাকটেড ট্যুর যায় কোনারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি। আগে থেকে বুক করার দরকার হয় না। ওখানে গিয়েই খোঁজ নেওয়া যাবে।

হুঁ বলে চুপ করে রইল রাত্রি।

দীপ দেখল লাভ হল না। ডাইভার্ট করানো যাচ্ছে না। অন্য প্রসঙ্গে গেল।

—পুজোয় ঋজু কি কলকাতায় ঠাকুর দেখতে আসবে?

চোখে আলো এল রাত্রির। দীপের দিকে ঘুরে বলল, বায়না তো ধরেছে খুব। বড় হচ্ছে যত, বায়নাও বাড়ছে, না বললে আবার মাইন্ড করে। গোঁ ধরে থাকে। খুব একটা বকাবকিও করতে সাহস পাই না। কী করি বলুন তো?

—চিন্তা নেই। অষ্টমীর দিন ওকে বলবেন রেডি হয়ে থাকতে। বিকেল বিকেল চলে যাব। ঠাকুর দেখিয়ে রাত্তির হবার আগেই বাড়ি পৌঁছে দেব।

রাত্রির চোখে কৃতজ্ঞতাটুকু বসতে পায় না। একটু আগের অস্বস্তি আবার ফিরে আসে। বাবা টিভি-তে। মা পুজোয় বসেছে। গেছে তো গেছেই। ওঠার নাম নেই।

দীপ উঠল। দু' পা এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। মা জপে বসেছে। দু' চোখ বন্ধ। দু' হাতের কড় গুনে গুনে জপ করছে। ডাকবে কিনা ভাবছে, পেছনে তাকিয়ে দেখল রাত্রি চোখ দিয়ে বারণ করছে।

ফিরে এল রাত্রির কাছে। মোড়ায় বসে বলল, আজ পুজোটা বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছে। মহালয়ার পুজো তো। তর্পণটর্পন করছে বোধহয়।

—মেয়েরাও কি তর্পণ করে?

—বলতে পারব না। তবে আজকাল সবই যখন করছে, তর্পণ করতেই বা বাধা কোথায়? চা খাবেন? আমি বানিয়ে দিতে পারি।

কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল রাত্রি।

—না, থাক, আর একদিন আসবোখন। আজ দেরি হয়ে যাবে। ফিরে গিয়ে রান্না চাপাতে হবে। আসার কথা ছিল, এসে গেলাম। দেখাও হয়ে গেল। আপনার আর অসুবিধে হবে না পরিচয় দিতে। এবারে যাবেন তো?

রাত্রি না এলেও যে দীপ যেত সেটা কি রাত্রিকে এখন বলা যায়? জোর দিয়ে দীপ বলল, অবশ্যই।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল। বাবাকে বলল দীপ, আমরা যাচ্ছি।

বাবা টিভি ছেড়ে উঠে এল, চললে? আবার এসো। ভাল লাগল তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে। রাত্রি। অদ্ভুত নাম।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে বাবা ভেতরে চলে গেল।

গলা তুলে দীপ বলল, বেরুচ্ছি! ফিরতে দেরি হতে পারে। চিন্তা কোরো না।

এবারেরগুলো মাকে উদ্দেশ করে বলা। দীপ জানে জপই হোক আর তপস্যা, এ কথাগুলোর সবকটাই মার কানে ঢুকেছে।

শরতের রোদ্দুরের ফ্যান দীপ। আলো আছে, উত্তাপ নেই। আর রংটাও সোনা-গলানো। নৈবেদ্য-আতপচাল-ধূপধুনোর গন্ধ মেশা। দেখলেই মনে হয় পুজো এসে গেছে। রোদে নেমে ছাতা খুলতে গিয়েও খুলল না রাত্রি। এক ছাতায় দু'জন আঁটবে না। আঁটলেও এইখানে নিজের ছাতায় দীপকে নেবে না রাত্রি। আর দীপ রোদের মধ্যে একা একা হাঁটবে, সেটাও খারাপ

দেখায়।

—আপনার বাবাকে বেশ লাগল।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে দীপ রাত্রির কথার ভেতরটুকু ছুঁতে পারল, —আপনার মাকে খুব একটা সুবিধার মনে হল না। দীপ বলল, হ্যাঁ, টিভি-অ্যাডিক্ট।

—বয়েস হয়েছে, কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে! কত লোকের কত রকম অ্যাডিকশন থাকে, কত সংসার তার জন্যে ছারখার হয়ে যায়। টিভি তো সামান্য জিনিস।

—টিভিকে অত সামান্য ভাববেন না ম্যাডাম। টিভি-র জন্যেও অনেক সংসারে আগুন জ্বলে। আর ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তো আজকাল টিভি ছেড়ে নড়তেই চায় না। সেদিন এক বাড়িতে গেছি। দেখি বছর চারেকের বাচ্চা, নাচ দেখাচ্ছে, সবকটা অ্যাকটর-অ্যাকট্রেস ওর চেনা। আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখাচ্ছে, শাহরুখ, অক্ষয়, রাভিনা, উর্মিলা। বাবা-মা-আত্মীয়স্বজন মুগ্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

—বেঁচে গেছি বাবা, ঝজুটার কোনও বদখেয়াল নেই! ন'মাসে ছ'মাসে দাদুর সঙ্গে বসে খেলা দ্যাখে। তাও আগে জিজ্ঞেস করে নেয়।

স্কুটার নেয়নি দীপ। বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠল দু'জনে। ছুটির দিন, বাস ফাঁকা। ছেলেদের সিটে বসেছে দীপ, উল্টোদিকে রাত্রি। হাওয়ায় চুল উড়ছে। বার বার ঠিক করছে। আবার চুল উড়ে মুখে পড়ছে, শেষ অবধি দীপের দিকে ফিরে একবার হেসে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করল। দীপের খুব ইচ্ছে করল পাশে গিয়ে বসে। চুলগুলো কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দেয়।

দুপুর করে ফিরল দীপ।

খাবার ঢেকে বসেছিল মা। মুখ গম্ভীর। দীপের খারাপ লাগল। রাত্রিদের বাড়ি ভালমন্দ খেয়েছে। আলুর পরোটা। বোঁদের পায়েস। মা দীপের জন্য না খেয়ে বসে আছে।

কথা না বলে হাত-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি এসে খেতে বসল। ক'দিন আগেও মাটিতে আসন পেতে বসত। টেবিল-চেয়ারটা ঢুকিয়েছে অনেক বলে করে। তাও ভাল করে পরিষ্কার হয় না, মা অন্তত তিনবার ভেজা কাপড় দিয়ে মোছে। কাজের লোকের পেছনে খিটখিট করে।

খেতে শুরু করে দীপ দেখল মা হাত গুটিয়ে বসে।

—কী হল, তোমারটাও বেড়ে নাও। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

—খাবোখন। তুই খা।

মা'র গলা যেন পাহাড়ের খাদ থেকে উঠে আসছে। ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। কথা না বাড়িয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে গেল দীপ।

সারা দুপুর অপেক্ষা করল দীপ। কাগজ পড়ল, ক্রশওয়ার্ড করল, বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করল। মাঝে মাঝেই কান খাড়া করে ও-ঘরে কী হচ্ছে শোনার চেষ্টা করল। টিভি-র আওয়াজ কমানো। তার মানে মা ঘুমোচ্ছে। অথবা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। বাবা নির্বাক ছবি দেখছে। দিনের একটা মিনিটও নষ্ট হতে দেয় না বাবা।

রোদ পড়তে ছাদে উঠে এল। ঘুপচি ঘুপচি ঘর, নোংরা বাথরুম, টাইমের জল। সবকিছু সত্ত্বেও বাড়িটায় যে পড়ে আছে তার একটাই কারণ, এই ছাদ। ছাদে এলে দীপের ভেতরে বন্ধ হয়ে থাকা নিঃশ্বাসটা যেন ছাড়া পেয়ে যায়।

শরতের আকাশে নীল যেন অন্য নীল। শান্ত, গভীর। রোদ্দুরের চোখ রাঙানি নেই, বরং বিকেলের রোদটা গায়ে নিতে ভালই লাগছিল। কয়েকটা ঘুড়ি উড়ছে আকাশে। এক সময় ঘুড়ির নেশা ছিল দীপের। বাবাও একফাঁকে এসে লাটাই কেড়ে নিত হাত থেকে। মাঝে মাঝেই ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো উল্টোদিকে উড়িয়ে ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে দীপের।

—কী দেখছিস হাঁ করে?

মা কখন উঠে এসেছে খেয়াল করেনি। যেন চুরি করে ধরা পড়ে গেছে, ছোটবেলার হাসিটা হাসল মুখ নিচু করে। বলল, কিছু না, এমনি।

—মেয়েটা কে রে?

এই জন্যেই মাকে এত ভাল লাগে দীপের। কোনও ভ্যানতারা নেই, এদিক ওদিক ভাঁজ নেই, যা বলার পষ্টাপষ্টি বলে। ট্যাক্‌ল্ করতে সুবিধা হয়।

—তোমাকে তো বলেছি। রাত্রি। আমাদের কলিগ, ব্রত, সেই যে অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ মারা গেল, সেরিব্রাল, ওর বউ।

—ওর বউ, তা তোর সঙ্গে কেন?

—ওরা লক্ষ্মীপুজোর পর পুরী যাচ্ছে। ও, মেসোমশাই, মানে ব্রতর বাবা, আর ঋজু, ব্রতর ছেলে। তা মেসোমশাই অনেক করে বললেন, সেইভাবে আমাদের গার্জিয়ান তো কেউ নেই। তুমি যদি একটু সঙ্গে যাও, বিশেষ উপকার হয়। আমি প্রথমে না-ই করে দিয়েছিলাম। অনেক চাপাচাপির পর বললাম ঠিক আছে মাকে গিয়ে রাজি করান। মা রাজি হলে যাওয়া যাবে।

—কোনও দরকার নেই। কোথাকার কে ব্রত; তার বউ, ছেলে, বাবা। তাদের সঙ্গে চলল ড্যাংড্যাং করে ছুটি কাটাতে! কেন অন্য কোনও কাজ নেই? ছুটির ক'টা দিন আমাদের সঙ্গে কাটালে কত ভাল লাগে! তা নয়, পরস্ব পর, চিনি না জানি না...।

দীপ চুপ করে রইল।

মা ছাদের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। পা ফেলছে জোরে জোরে। শব্দ হচ্ছে। অমতটা আওয়াজে, ভঙ্গিতে। দু'বার পায়চারি করে ফিরে এল।

—হ্যাঁরে, তিথির অনেকদিন খবর পাই না! সেই যে ফোন করেছিল। গিয়েছিলি ওদের বাড়ি?

ঘাড় নাড়ল দীপ। ঘাড় নেড়ে চুপ করে রইল।

—কী খবর? কেমন আছে ওরা? ওর নম্বরটা আমাকে দিস তো! আমিই না হয় ফোনে কথা বলব।

—পাবে না। এত দিনে বোধহয় চলেও গেছে।

—কোথায় গেছে? কিছু বলিসনি তো?

—সিঙ্গাপুর। একটা লংটার্ম অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। আপাতত ছ'মাস। বাড়তে পারে।

—ফিরবে কবে? মার গলাটা এবার ভাঙা ভাঙা শোনাল।

—বলা কঠিন। ছ'মাস, এক বছর। নাও ফিরতে পারে।

ছাদে একটা মাদুর বিছানো থাকে। গরমকালে মা এসে শুয়ে থাকে। দীপও অনেক সময় চিত হয়ে আকাশের তারা গোনে। মা গিয়ে মাদুরে বসল। বসেই রইল। দীপ আড় চোখে দেখছিল। মাকে খুবই ভেঙে পড়া দেখাচ্ছিল। আলো কমে আসছে। এর পর সিঁড়ির ধাপ দেখে নামতে কষ্ট হবে মার।

দীপ কাছে গেল।

—অন্ধকার হয়ে আসছে, নামবে না।

—এই যাই।

বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দীপের দিকে ফিরে বলল, ওই মেয়েটা, কী যেন নাম বললি, ওর সংশ্রব তুই ত্যাগ কর। এ কেমন মেয়ে? বিধবা, কদিনই বা স্বামী মারা গেছে, বলা নেই কওয়া নেই অপরিচিত একটা ছেলের বাড়ি চলে গেল? বাধল না?

দীপ হাত বাড়াল, চল, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।

দীপের হাতে ভর দিয়ে মা উঠল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দু'-পা হেঁটে কোমর সোজা করল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে বলল, আর লাগবে না, বাকিটা আমি নিজেই যেতে পারব। তবু সিঁড়ির মাথা থেকে দীপ তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না মা নীচে পৌঁছয়।

ফিরে আকাশের দিকে তাকাল। বারে! কোথায় ঘাপটি মেরে ছিল! নীল কমে গিয়ে কালোয় মাখামাখি হতেই শুকতারা থেকে সবাই টপাটপ বেরুতে শুরু করেছে! ঠাণ্ডা হাওয়া এল এক ঝলক। পাখির ডাকাডাকি স্তিমিত হয়ে আসছে।

ন্যাড়া ছাদ। বেশি ধারে যাওয়া যায় না। মাদুরে বসে হাত দিয়ে দিয়ে মাথার ওপর থেকে মশা তাড়াচ্ছিল দীপ। হঠাৎই কী একটা মাথার মধ্যে ঝলসে উঠল। তাই তো! কেন এতদিন খেয়াল করেনি?

তিথি। ওরা রায়। রায়টা উপাধি। আসল পদবি মুখার্জী। মা একদিন বলেছিল, ভরদ্বাজ গোত্র। আমাদের পালটি ঘর। শাঁখা-সিঁদুর-লোহা-পলায় সেজে তিথি এ বাড়ি এলে বেড়াচাঁপাও তার সমস্ত সৌভাগ্যশুদ্ধ এসে যাবে দীপের মুঠোয়। আর রাত্রি?

পিসির কথাগুলো মনে পড়ে গেল দীপের। অনেক কটা শর্তের মধ্যে 'বিধবা'ও ছিল। সত্যিই যদি সেই জায়গায় পৌঁছয়, ভাবতেই কান গরম হয়ে উঠছে দীপের, —যে দীপ সেই দীপই থেকে যাবে। বেড়াচাঁপার জমিদারি পিসির মৃত্যুর পরই চলে যাবে ট্রাস্টের হাতে, দীপ তার ভাগ পাবে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চুরি করে আর একবার আকাশ দেখে নিল দীপ। তারাগুলোকে এখন বেশ জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে।

বাবা-মা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোলে বাবার নিঃশ্বাসের শব্দ হয়। মা'র ঘুম এমনিতে পাতলা, কিন্তু সয়ে গেছে, বাবার আওয়াজে ঘুম ভাঙে না। ক্রমশ সমস্ত শব্দ ঝেড়ে ফেলে নিঃসঙ্গ হচ্ছে রাত্রি। কাগজ-কলম নিয়ে বসল দীপ। একটা চিঠি, যেটা মনে মনে লেখা হচ্ছিল অনেকদিন ধরে, আস্তে আস্তে, একটু একটু করে লিখে ফেলল।

প্রিয় বাসন্তী,

প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওপরের সম্বোধনের জন্যে। সম্পর্কে তুমি আমার পিসি। পিসিকে কি প্রিয় লেখা যায়? লেখা যাবে না এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তার চেয়েও বড় কথা, এ চিঠিটা তো আমার সেই আশি বছরের বৃদ্ধা পিসিকে লিখছি না। লিখছি ছবিতে দেখা ঝাঁকড়া চুল

সেই কিশোরী বাসন্তীকে, যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, চিলেকোঠায় পাশ ফিরে শুয়ে দু' চোখে উপচে পড়া কৌতুক নিয়ে যে আমাকে ডেকেছিল।

বিগত কয়েকটা মাস তুমি আমার সব সময়ের সঙ্গী। কী করে? সেই কথাটা বলার আগে তোমার কাছে আর একবার ক্ষমা চেয়ে নিই। লুকিয়ে লুকিয়ে অনুমতি না নিয়েই তোমার ডায়েরি আমি পড়ে ফেলেছি। কী করব বল, পাব কোথায় যে অনুমতি নেব? আর, একবার পড়তে শুরু করার পর, কিছুতেই রাখতে পারিনি। কী অসাধারণ তোমার ভাষা, আর লেখার বাঁধুনি। সবচেয়ে বড় কথা তোমার 'নিজের কথা'য় তুমি নিজেকে এমন করে মেলে ধরেছ! যেন তোমার কামনা-বাসনার গরম নিঃশ্বাস আমার চোখ-মুখ ঝলসে দিয়েছে এই ক'টা মাস। কী জীবন্ত! পড়তে পড়তে মনে হয়েছে তুমি বসে রয়েছ কাছেই। একটু একটু করে তোমার দুঃখের কাহিনী বলে যাচ্ছ। কতদিন তোমার কথা ভেবে আমি চোখের জল ফেলেছি তুমি জানো?

তোমার ডায়েরি আমাকেও অনেক বদলে দিয়েছে। যেন নিজের ভেতরে আলো ফেলে ফেলে নিজেকে দেখেছি। যা সত্য, যাকে অনেক সময়ই আমরা পরিবেশের চাপে স্বীকার করি না, একটা অলীক মিথ্যাকে সারাজীবন বয়ে নিয়ে যাবার সাধনা করি, তা চিনে নিতে সাহায্য করেছে তোমার 'নিজের কথা'। সেইভাবে দেখতে গেলে তোমার 'নিজের কথা' আমারও নিজের কথা।

তোমাকে চিঠি লিখতে যখন বসেছি, বন্ধুর মতো, তখন আমারও নিজের কথা তোমাকে একটু শোনাই।

তিথি বলে একটা মেয়েকে আমি ভালবাসতাম। দেখেছ, এখনই অতীতে বলতে শুরু করেছি। বাসতাম নয়, বাসি। এখনও বাসি। মেয়েটা আদুরে, অহঙ্কারী, জেদী। নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করে না। কোনও রাখ-ঢাক নেই। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে কিছুটা হলেও মিল আছে। আমার ব্যাপারে অসম্ভব অধিকারবোধ, এক ইঞ্চি ছাড়তেও ওর ভীষণ আপত্তি। ওর তীব্র ভালবাসায় আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি। চেষ্টা করলেও ছিঁড়ে চলে যাব সে সাধ্য আমার নেই।

আর একজনকে আমি হঠাৎই আবিষ্কার করলাম। ব্রত, আমাদের সহকর্মী, মারা গেলে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখতে পেলাম রাত্রিকে। যেন এক শান্ত দীঘি, শোক মেঘের মতো ছায়া ফেলে আছে। ভেতর থেকে ভীষণ ইচ্ছে হল সেই মেঘ দু'হাতে টেনে সরিয়ে দিই। রাত্রি আমার কে? সব মানুষের সব শোক আমি কি এমনি করেই সরিয়ে দিতে চাই? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার আগেই দেখলাম আমার ভেতরে বুদ্বুদের মতো অন্য একটা অনুভূতি উঠে আসছে। এমন কিছু যা একদম নতুন। অজানা।

যখন পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ে, যখন শব্দহীন হয়ে যায় চরাচর, যখন মনে হয় পৃথিবীতে জেগে থাকা মানুষ আমি একা, তখন রাত্রি যেন ভেতরে চুপি চুপি ঘুরে বেড়ায়। কোনও কথা বলে না, কোনও দাবি পেশ করে না, কখনও অধিকার কায়েম করার চেষ্টাও করে না। শুধু তার বড় বড় পাতার ঘন কালো চোখ মেলে আমার ভেতরে জেগে থাকে। রাত্রিকে ভেবে আমি উত্তেজিত হই না। আমি শান্ত হই। রাত্রি যেন আমার প্রলেপ।

এটা কি প্রেম? রাত্রিকে কি আমি ভালবাসি? এমনকী এই ভাবনাটাও আমাকে অবশ করে, যেন এক সৌগন্ধে আমি নিমগ্ন হই। রাত্রি যেন এক স্নান। ডুব দিলেই উত্তাপের নিবৃত্তি।

দেখেছ, তোমার ডায়েরি পড়ে পড়ে কেমন ভাষা শিখেছি? নিজেরই পিঠ চাপড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। ভবিষ্যতে কী ঘটবে আমি জানি না। তবু, যদি কখনও বাকি জীবনটুকুতে পাশে দাঁড়ানোর জন্যে রাত্রিকেই বেছে নিই, আমার বেছে নেওয়াতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, ও যদি রাজি হয়, তাহলে অনেককিছু আমার মুঠো গলে বেরিয়ে যাবে। এক তো বেড়াচাঁপার সম্পত্তি। তোমার বাবামশাই যা ব্যবস্থা করে রেখেছেন, ও সম্পত্তিতে আমার কোনও অধিকারই থাকবে না। তার চেয়েও বেশি, মা। সারাটা জীবন মা অপেক্ষা করে থেকেছে, একদিন সমস্ত অধিকার নিয়ে ওই বাড়িতে ফিরে যাবে; রাত্রিকে বেছে নিলে মা আমাকে ক্ষমা করবে না। তিথিকে পেলে আমার পাওয়ার ভাণ্ডার কানায় কানায় ভরে উঠবে।

জান তো, রাত্রি আমাকে আপনি বলে। আমিও ওকে তা-ই বলি। বসি দূরত্ব রেখে। একটা কথাও কোনওদিন বলিনি আমি এবং আমরা যাতে ঘনিষ্ঠতার লেশমাত্র থাকে। আমার বাড়ি আসতে গেলে ওর চোখের তারা বড় হয়ে যায়, ঠোঁট কাঁপতে থাকে তির তির করে, ভুরুতে ঘাম জমে। আমি ওর সঙ্গী হলে ভাল লাগবে সেটাও সরাসরি বলতে পারে না, বলে ঋজু অথবা ঋজুর দাদুর নাম করে। শুধু অফিস থেকে বেরিয়ে আমার স্কুটারের পেছনে উঠতে ও আর দ্বিধা করে না, ট্রেন আসার আগে বসে থাকে এক গাছের নীচে, লোকজন না দেখলে খুব রোদ উঠলে ওর ছাতার ছায়ায় আমাকে জায়গা দেয়। আমিও যখন দেখি, ওর গভীর কালো চোখ থেকে শোকের ছায়াটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, রুচিৎ কখনও খুশির হলকা লেগে গালে লালের ছোপ ফুটেছে, এক আশ্চর্য আনন্দ গোপন স্ফরণের মতো আমার ভেতরে ঝরতে থাকে।

এর নাম কি ভালবাসা?

অনেক লিখে ফেললাম। এবার কলম থামাব। চিঠিটা ভাঁজ করে তোমার ডায়েরির মধ্যে রেখে সবশুদ্ধ রেখে দিয়ে আসব সেই চিলেকোঠার ঘরে, যেখান থেকে এনেছিলাম। তুমি তো হারিয়ে গিয়েছিলে! সবাই সেইরকমই জানে। ভুল! সত্যিটা আমিই শুধু জানি, তুমি এখনও রয়ে গেছ সেই চিলেকোঠার ঘরে। আমার চিঠি তুমি কি কখনও খুলে পড়বে?

রাত নিশুতি। লেখা হয়ে গেলে ছাদে উঠব। আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাব রাত্রি যেন উপুড় হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার শরীরে চুমকির মতো অজস্র তারা, তার সমস্ত শরীরে রহস্যের মতো অন্ধকার। জ্বলতে থাকা নিভতে থাকা তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবব, হয়তো কেউ অনেক দূরে, সময়ের অন্য পাড় থেকে অমনি করেই তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ভালবাসা নিও।

—দীপ